প্রকাশিকা—
এডুকেশনাল বুক করপোরেশনের পক্ষে,
শ্রীমতি শোভারাণী চক্রবর্ত্তী
১২৭ এ, এস. পি. মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-২৬

পরিবেশক
স্বরাজ ভাণ্ডার
১২৭ এ, এস. পি. মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-২৬

সঞ্চয়
৩০/১ বি কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রকঃ
সত্য চরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাইলেন,
কলিকাতা-৭

মূল্য দশ টাকা

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়
অধ্যাপক ডক্টর দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশে

ভূমিকা

মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা খুব বেশী দিনের নয়। দৈহিক স্বাস্থ্যে ধারণা যদিও বা সাধারণ্যে কিছু বর্তমান, মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণ আমাদের দেশে এখনও কিছুটা ক্ষীণ। সন্তান প্রযত্নের সুস্থ ধারাটি কী, সন্তানে দেহ মনের সুস্থতার জন্য, তথা সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য গৃহপরিবেশে অনিবা ভাবে কি কি অবস্থার সন্নিবেশ অপরিহার্য, সন্তান সম্পর্কে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গ কি প্রকার হওয়া সমীচীন—এ সকল বিষয়ে প্রত্যেক পিতামাতার পক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যবিধি অবগতির যথেষ্ট অবকাশ আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছধারণা থাকা প্রয়োজন; শিক্ষার্থীর সুস্থব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য সুস্থ বিদ্যালয় পরিবেশ রচনার দায়িত্ব মূলতঃ তাঁহাদেরই। পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা, শিশুদের সম্পর্কে, সামগ্রিক ভাবে সমাজ সম্পর্কান্বিত মানুষ সম্পর্কে নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণের অভ্যুদয় ঘটাতে পারে। আধুনিক শিক্ষা ধারা বস্তুত মানসিক স্বাস্থ্য জ্ঞান-ভিত্তিক। এই পরি প্রেক্ষিতে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান পৌছুক—এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে অভিপ্রেত।

স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে অবশ্য মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। এ বিষয়টি পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়েছে "আপনি বাংলায় একটা বই লিখুন"—তাঁদের আন্তরিক অনুরোধ, অনুরোধ না বলে প্রায় নির্দেশ বলতে পারি, আমাকে এ বইটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ হয়েছে এই ভেবে যে, শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠকাল এত কম যে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা যখনই গভীর ও ব্যাপ্ত জ্ঞানে নিবদ্ধ হতে চেয়েছে তখনই তাঁদের পরীক্ষা পর্ব্ব সমাপনের জন্য এ বই ও বই করে সব অনুসন্ধিৎসা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। অথচ এটাও বাস্তব সত্য পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, ভালও করতে হবে। স্বল্প সময়, পরীক্ষা প্রভৃতি বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যায় নির্ভর যোগ্যগভীর ও ব্যাপ্ত জ্ঞানে যথাসম্ভব জ্ঞানান্বিত করার মানসে এ বইটি লেখার প্রয়াস করেছি। শিক্ষার্থীদের নির্দেশেই এ বই লেখা। তাঁরা যদি উপকৃত হন তাহলে আমার শ্রম সার্থক বিবেচিত হবে।

এ বইটি লিখনে আমার ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছাড়াও আমি যাঁদের অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম মনে আসে, তিনি আমার পিতৃপ্রতিম অধ্যাপক ডঃ দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়—তাঁর নিয়ত প্রেরণা ও দৃষ্টি এ বইটির পরিকল্পনা ও লিখন প্রয়াসে নীরবে কাজ করেছে। এ বইটি আমি আজ তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলাম না—এ যে কত বড় মর্মবেদনা তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। বইটি আলোর মুখ দেখার পূর্বেই তিনি স্বর্গত হলেন। আর মনে পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক মনোবিদ্যা বিভাগের প্রধান, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডক্টর সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও অমূল্য উপদেশের কথা—তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। পাণ্ডুলিপি যদিও বছর দুই আগে ছাপবার জন্যে শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু কাগজের অভাব, ছাপাখানার নানাবিধ সমস্যা এ সব পেরিয়ে এসে আজ বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আজ আরও কয়েকজনের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি—বেলুড় রামকৃষ্ণ-মিশন শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীঅধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান এ্যাকাডেমি অব সাইকোএন্যালিসিসের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ গৌর চৌধুরী, অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট্ অব হাইজিনের ডঃ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের মনস্তাত্ত্বিক ডঃ কমল মুখোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য আমাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর একজনের কথাও আজ আমার বার বার মনে পড়ছে—অতি উৎসাহী অক্লান্ত পরিশ্রমী শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথা। ওঁর একটা সবিশেষ উদ্যোগ না থাকলে এ বইটি বের হতে হয়ত আরও দেরী হত। কাগজের অভাব, ছাপাখানার নানাপ্রকার সমস্যা, প্রুফ দেখা সব সমস্যার সমাধান করেছে প্রায় একহাতে শ্রীচক্রবর্ত্তী। ওঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ-প্রমাদ কিছু কিছু থেকে গেছে—ভবিষ্যতে তা সংশোধন করার অভিপ্রায় রইল।

পরিশেষে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন তাঁরা যেন এই বইটি পড়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে আমাকে বাধিত করেন। বইটির ভবিষ্যৎ পরিমার্জনে তাঁদের মতামতকে আমি সম্মুখে রাখব।

৮ই জুন, ১৯৭১

১৩৩সি রাস বিহারী এভেন্যু

কলিকাতা-২৯

জগদিন্দ্র মণ্ডল

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

———

মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য

(Nature of Mental Health)

স্বাস্থ্যের স্বরূপ ঃ—

'স্বাস্থ্য' শব্দটি কোন জড় বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। যেখানে প্রাণের স্পন্দন অনুরণিত হয় না সেখানে স্বাস্থ্যের প্রতিভাসও মেলে না। একটি 'টেবিল' সম্বন্ধে আমরা বলি-না—ইহার স্বাস্থ্য আছে। কিন্তু একটি ছোট্ট অঙ্কুর ও বৃক্ষ সম্বন্ধে বলতে পারি—এর স্বাস্থ্য আছে বা এর স্বাস্থ্য হানি হয়েছে।

ক্রমবিবর্ত্তনে জীব যত উন্নত, 'স্বাস্থ্য' শব্দটি তত বেশী ব্যবহৃত। এই স্বাস্থ্য আবার দৈহিক ও মানসিক উভয় পটভূমি সম্পর্কেই ব্যবহৃত। একটি গাছ যখন পত্রে পুষ্পে শোভিত জীবন স্পন্দনে আবর্ত্তিত তখন বলতে পারি গাছটি সুস্থ —আবার একটি গাছ যখন বিশুষ্ক বিশীর্ণ তখন বলতে পারি গাছটি পীড়িত। তেমনি একটি প্রাণীর মধ্যে যখন দেখি যথার্থ প্রাণস্পন্দন রয়েছে—সমস্ত কর্ম্ম প্রয়াসের মধ্যে তার দেহ গঠনের পটভূমিতে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে তখন বলি তার স্বাস্থ্য আছে। মোটের উপর যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দন ও সক্রিয়তা আছে, যেখানে বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও একটি লক্ষ্যে বিধৃতি আছে সেখানেই স্বাস্থ্য আছে।

একটা উপমা দিয়ে ধারণাটাকে আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে। যেমন একটা অর্কেষ্ট্রা দলে অনেক বাদক আছে—বিভিন্ন সুর যন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন বাদক বসেছে। যিনি যে যন্ত্রই বাজান, সে যন্ত্রটি কর্মক্ষম হতে হবে এবং তার লক্ষ্য একমুখী হওয়া চাই অর্থাৎ অর্কেষ্ট্রার যে মূল সুর সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে— এই দিক থেকে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে কর্মের স্বাধীনতা থাকলেও সবগুলিই একই সুরে বাঁধা। কোন একটি বাদ্যযন্ত্র যদি অকেজো হয়ে যায় বা ভিন্নমুখী হয়, মূল সুর থেকে বিচ্যুতি ঘটে অর্থাৎ কোন বাদক যদি খেয়াল খুশী মত তার যন্ত্র বাজাতে থাকে তাহলে সমস্ত সুরটা-ই কেটে যায়—মূল সুর

ব্যাহত হয়। সেই রকম দেহের বিভিন্ন অংশ যদিও বিভিন্ন কাজ করছে, তবু তাদের কাজের মধ্যে একটা একমুখীনতা থাকা চাই। সামগ্রিক ভাবে দেহের যে কর্মক্ষমতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতা তা পরিস্ফুট হওয়া চাই—তবেই বলবো দেহের স্বাস্থ্য আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি **দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন পাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, হৃদযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি যখন সম্যকভাবে সক্রিয় থাকবে এবং এদের পরস্পরের কাজ মোটামুটি এক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় (System) হলেও, এরা কেউই ভিন্নগামী হবে না, এদের কাজের মধ্যে একটা পারস্পারিক সহযোগিতা ও পরিপূরকতা থাকবে তখনই দেহের স্বাস্থ্য উদ্ভাসিত হবে। মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সুষম ক্রিয়াকলাপ প্রসূত পরিবেশের সাথে ও নিজের সাথে যথাযথ ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ক্ষমতা ;** নূতন নূতন পরিস্থিতি ও বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, সর্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পদ্ধতিতে ও সমাজ অনুমোদিত পথে তার সমাধান করে সন্তোষজনক ও আনন্দকর অগ্রগতি জীবনে নিয়ে আসার ক্ষমতা-ই মানসিক স্বাস্থ্য।[1]

সঙ্গতি সাধনের পটভূমিতে ঃ—

মানসিক স্বাস্থ্য সামগ্রিক ভাবে স্বাস্থ্যের একটি দিক—দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য বিচ্ছিন্ন কোন অবস্থা নয়। কোন ব্যক্তি তার পরিপার্শ্ব অবস্থার সাথে সঙ্গতি সাধনে কতটা সফলকাম হচ্ছে সেইটিই তার স্বাস্থ্যের নির্ণায়ক। **দৈহিক স্বাস্থ্যই হোক আর মানসিক স্বাস্থ্যই হোক উভয় ক্ষেত্রেই এই সঙ্গতি সাধন ক্ষমতাই যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়।**

ব্যক্তি একদিকে যেমন তার বাহ্যিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করে চলে (উষ্ণতা, শীত, আবহাওয়ার অন্যান্য পরিবর্ত্তন, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব, বাইরের জীবাণুর আক্রমণ প্রভৃতি) অন্যদিকে শরীর-অভ্যন্তরের পরিবর্ত্তনের সাথেও (ক্ষুধা, শরীরের আবর্জ্জনা ত্যাগ, বিশ্রাম ইত্যাদি) সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। দেহ ও তার পরিপার্শ্ব জড় পরিবেশের (Material environment) সাথে যে সঙ্গতি সাধন (adjustment) তা প্রায় সর্বদা আপনা-আপনি হয়ে থাকে, বস্তুতঃ এই সঙ্গতি সাধনে ব্যক্তি তার

1. Mental health is "The full and free expression of all our native and acquired potentialities in harmony with one another by being directed towards a common end or aim of the personality as a whole."
—Hadfield. J. A. : Psychology & Mental Health.

পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সজাগ থাকে না। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, শরীরস্থান (Anatomy), শারীরবৃত্ত (Physiology), এইসকল বিজ্ঞান দ্বারা আমরা এই সঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করতে পারি। জড় জগতের (physical world) সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার জন্য ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন অংশের সংহত (integrated) কার্য্যকলাপ—দৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়বস্তু। দেহের বিভিন্ন অংশের কার্য্যকারিতার মধ্যে আছে পুষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, দেহের দূষিত পদার্থের নিঃসরণ, স্নায়বিক সাড়া ইত্যাদি। এই সকল শারীরিক কার্য্যাদির মধ্যে সংহতি আনয়ন করে (যে সংহতি মোটামুটি ভাবে জীবনধারণের জন্য উপযোগী) দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং স্নায়বিক ক্রিয়া।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটা বর্ত্তমান যে সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। শরীরের কতকগুলি পরিবর্ত্তন যেমন ব্যথা, ক্ষুধা, ক্লান্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যক্তি স্বভাবতঃই অনুভব করতে পারে। ব্যক্তির আবার নানা-প্রকার অনুভূতি ও আবেগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতা আছে। এই অনুভূতিগুলি কখনও সুখদায়ক কখনও দুঃখদায়করূপে প্রতিভাত হয়। আবেগাভিজ্ঞতা অনেক প্রকারের হতে পারে—যেমন রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, ভালবাসা, ঘৃণা, অস্থিরতা ইত্যাদি। মোটের উপর মানুষ একটা সীমা পর্য্যন্ত জড় জগৎ সম্বন্ধে ও আপন প্রয়োজন সম্বন্ধে অবিহিত হতে পারে। ঘটনার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং অর্থ সঙ্গতি আবিষ্কার করার ক্ষমতাও (intelligence) ব্যক্তির মধ্যে বর্ত্তমান। এই অর্থ সঙ্গতি নির্ণয় ব্যক্তির জীবন উদ্দেশ্য দ্বারা নিরূপিত হয়। এই উদ্দেশ্যগুলি তার আবেগ ও উন্নাস (Attitude) বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দেশ্য পরিচালিত হয়েই মানুষ কাজ করে। এই কাজে যে সকল মানস কার্য্য (mental activities) অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাদের মধ্যে আছে **প্রত্যক্ষণ, স্মরণ, যুক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার আবেগের ক্রিয়া।** 'মন' বলতে আমরা সংক্ষেপে বুঝি তিনটি মানস ক্রিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ক্ষমতা—এর সম্বন্ধে অনুভব করা এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার প্রচেষ্টা।

মানুষের পরিপার্শ্বে কেবলমাত্র জড়জগৎ নেই—মানবিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও তার চারিদিকে বিদ্যমান—**মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা খুবই সহজ হত যদি মানুষ কিভাবে জড় পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে এই আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।**

পরীক্ষার জন্য আনীত একটি প্রাণীর জৈবিক ও স্নায়বিক ক্রিয়া-কর্ম অনুশীলন করলে, 'অভ্যাস'-এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রাণীর আচার-আচরণকে বিশ্লেষণ করলে প্রাণীটি সম্বন্ধে প্রায় সবকিছু জানা যায়। **কিন্তু সভ্য সংস্থা ও পরিবেশে, বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড় পরিবেশের প্রভাব ক্রমশই ক্ষীয়মাণ হয়ে আসছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন অনায়াসেই মিটে যাচ্ছে। সভ্যতা ক্রমশঃ মানবিক সম্পর্ক জটিল করে তুলছে; এই জটিল মানবিক সম্পর্ক নিচয়ের সাথে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার জন্য ব্যক্তির মানসিক শক্তিগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় হয়ে উঠতে হচ্ছে** ও মাঝে মাঝে পরিবেশের জটিলতা হেতু সঙ্গতি সাধনের এই শক্তিগুলির উপর যথেষ্ট চাপও পড়ছে। **এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের** (Psychological environment) **সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি ও প্রক্রিয়াই মানসিক স্বাস্থ্য।**

বিকাশ পথে প্রভাব :—

শৈশব থেকে বয়ঃ প্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত, বিকাশপথে শিশু নানাবিধ পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনগত প্রভাবের মধ্য দিয়ে যায়। এইসব **পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতার (Personality)-র মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়।** শৈশব অবস্থায় সে পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনগুলিকে প্রায় সর্বাংশেই গ্রহণ করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর যখন সে নিজে জীবনাভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে ও এইসব বিষয় সম্পর্কে যুক্তি-সহযোগে চিন্তা করতে পারে তখন সে এই অনুশাসনগুলি গ্রহণ বর্জন দুই-ই করতে পারে। এ সত্ত্বেও তার মধ্যে এই সব পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন তার মানসিকতার মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে যেতে পারে যে ইচ্ছা করলেও সে এগুলোকে আর বর্জন করতে পারে না ; এর বিপরীতও আবার ঘটতে পারে ; সে পরিবারে ও সমাজে নিজেকে হয়ত খাপ খাওয়াতে পারছে না। কেননা পরিবারে ও সমাজে যে সব অনুশাসন ও সাংস্কৃতিক অনুজ্ঞা আছে তার অনেকটাই সে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেনি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে উন্নত মানসিক কার্যকারিতায় ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তিগুলির মধ্যে (যেমন প্রতিন্যাস, মতামত, প্রেষণা, আশানিরাশা, স্থায়ী অনুভূতি, দ্বন্দ্ব, বিবেক, সংশয়) একটা পারস্পরিক ক্রিয়া কর্ম চলছে—এই

মানসিক কার্য্যাবলীই 'আমার' আমিত্বের মূলকেন্দ্র। এই 'আমি'কে সর্বদাই সামাজিক অনুশাসন, যা সমাজের আইন, বিবেকাদর্শ, অর্থ নৈতিক প্রয়োজন ইত্যাদি পারিবেশিক প্রভাবের সাথে সন্তোষজনক সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হবে। পারিবেশিক এই অভিযোজন (adjustment) প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির যে ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয় তাকে আবার সমাজের ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি, যারা স্বভাবতঃই কিছু পরিমাণে ভিন্ন প্রকার পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তাদের সাথেও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। **মানসিক স্বাস্থ্য এই সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি ও ক্ষমতা যা সুস্থ ব্যক্তিত্বেরই ফলশ্রুতি।**

দেহ-মন ঃ—

জটিল মানসিক ক্রিয়া-কর্ম্ম যাকে আমরা 'মন' বলে অভিহিত করতে পারি তার ক্রিয়া-কলাপ নির্ভর করে 'মস্তিষ্কের' (Brain) সংহতি, স্নায়ুতন্ত্র এবং নালীশূন্য গ্রন্থির (Endocrine glands) উপর—এই স্নায়ুতন্ত্র, নালীশূন্য গ্রন্থি ও মস্তিষ্কের কার্য্যাদি ও সংহতি আবার নির্ভর করে—খাদ্যগ্রহণ, পুষ্টি, রক্ত-সঞ্চালন ও অন্যান্য আরও জৈবিক (Physiological) কার্য্যাদির উপর। মন ও দেহ শুদ্ধভাবে ও সংক্ষেপে বল্লে, **মানসিক ও দৈহিক কার্য্যাদি পরিণামে অবিচ্ছেদ্য।** আমরা যখন দেহ-মন শব্দ দুটি ব্যবহার করি তখন সমগ্র ব্যক্তির সমন্বিত কার্য্যের পর্য্যায়ক্রম বুঝি। এর যে কোন পর্য্যায়ে বিচ্যুতি বা বিনষ্টি অন্য কোন কর্মসোপানকে নিষ্ক্রিয় না করেও ঘটতে পারে, কিন্তু প্রায়শঃই আমরা দেখি, শারীরিক ক্রিয়া কলাপের কোন প্রকার বিচ্যুতি মনকে, আবার মনের অসুস্থতা কম বেশী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহের অসুস্থতা ঘটিয়ে থাকে। অতএব মানসিক স্বাস্থ্য দৈহিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে কিছু নয়, বরং দেহ-মনের অঙ্গাঙ্গী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সক্রিয়তা ব্যক্তিকে ভৌতিক ও মানসিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি সাধনে সক্ষম রাখে।

ব্যক্তিত্ব ঃ—

দু'টি ব্যক্তি-মানস সর্ব্বদিকে একপ্রকার হয় না, যদিও সকল ব্যক্তির মানসিকতার মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেক মানুষের মুখমণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—যেমন প্রত্যেকেরই চোখ, নাক, কান ইত্যাদি আছে, তাদের অবস্থিতিরও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এ সত্বেও

কিন্তু দু'টি মানুষের মুখমণ্ডল একপ্রকার হয় না। একজনের মুখাবয়বের বিশেষত্ব থেকে আমরা যেমন চিনতে পারি, মানসিক বৈশিষ্ট্য থেকেও ব্যক্তিটিকে আমরা চিনতে পারি। কোন ব্যক্তির কাজ, তার বাচনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মপদ্ধতি থেকে যে মানস বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্বিত হয় তা থেকে ব্যক্তিটিকে চিনতে পারি। **কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারে এমন যে অদ্বিতীয় মানস বৈশিষ্ট্য—সেইটিই তার ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতা (Personality)।** এই মানস-বৈশিষ্ট্য সকল ব্যক্তির মধ্যেই (যেমন মুখাবয়বের দিক থেকে চোখ নাক কান) বিদ্যমান, এই সকল বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ ও একের সহিত অপরের সম্মিলনের প্রকার-ভেদের মধ্য দিয়ে যে অদ্বিতীয়তা প্রকাশমান সেইটিই তার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের সুস্থতাই মানসিক স্বাস্থ্য।

স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য ঃ—

দেহের স্বাস্থ্য যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য বিদ্যার বিষয়বস্তু, **ব্যক্তিত্বের স্বাস্থ্যই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিষয়বস্তু।** ব্যক্তি যেহেতু তার পরিবেশের সাথে অভিযোজনের জন্য সর্বদা প্রয়াস-রত, ব্যক্তিত্ব সেইহেতু সর্বদা ক্রিয়াশীল। এই অভিযোজন প্রয়াস কখনও বেশী কখনও কম পরিমাণে সাফল্য লাভ করছে। অভিযোজন প্রক্রিয়া কঠিন **কোন একটি আচরণাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়** —যা থেকে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকৃতিকে ছকে ফেলে বিশ্লিষ্ট করতে পারি। কিন্তু **সামাজিক অভিযোজন যখন একাদিক্রমে বারবার সুস্পষ্টভাবে ব্যাহত হয়, তখনই বলা যায় কোন প্রকার মানসিক অসুস্থতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিয়েছে।**

সামাজিক অভিযোজন বিঘ্নিত হলে মানসিক অসুস্থতা আছে এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, কিন্তু, মানসিক অসুস্থতা ভিতরে ভিতরে থাকলেও অনেক সময় সামাজিক অভিযোজন ব্যর্থ নাও হতে পারে। ধরা যাক, কোন ব্যক্তির মধ্যে শারীরিক কোন প্রকার অসুস্থতা রয়েছে; যেমন, মূত্র-রোগ বা হৃদ-যন্ত্রের কোন রোগ। তার শারীরিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়েছে—হৃদযন্ত্র গঠনগত ভাবেও কিছুটা বিপর্য্যস্ত হয়েছে, কিন্তু এহেন ব্যক্তিরও সর্ব্বদা রোগ সংলক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে; খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলে হয়ত, তার এই অসুস্থতা ও দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা ধরা পড়তে পারে। এরূপ ব্যক্তির একটা বিষয়ে কিছু কমতি থাকবে ভবিষ্যতে সার্থক অভিযোজনের জন্য

যে শক্তি প্রয়োজন তা হ্রাস পাবে। ফলে মূত্র-রোগীটি যদি কখনও অধিক আহার করে কিংবা খুব বেশী দৈহিক কাজে নিজেকে নিয়োগ করে, তার সুপ্ত রোগ লক্ষণটি হঠাৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। ঠিক সেরূপভাবে, **কোন অসুস্থ বা জীর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যখনই কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় (যে অবস্থার সঙ্গে সার্থক অভিযোজনের জন্য সুদৃঢ় ও সুস্থ মানব-কাঠামোর প্রয়োজন) তখনই তার মধ্যে নানাপ্রকার মানসিক বিকৃতির সংরক্ষণ স্পষ্টতর হয়ে উঠে।**

কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা :—

যখন কোন ব্যক্তিত্বের শক্তি-সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লিষ্ট হয় ও তা পরিমাপিত হয় এবং তার আন্তর মানস অভিজ্ঞতা ও সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সামাজিক আচার-আচরণের পর্য্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক অনুলিপি গ্রহণ করা হয় তখনই একমাত্র কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদান :—

ক) অটুট্ দৈহিক স্বাস্থ্য।

খ) যথাযথ বুদ্ধি।

গ) যথাযথ সংযমের মধ্যে প্রবৃত্তিনিচয়ে ক্রিয়াশীলতা : বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী।

ঘ) পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সহৃদয়তার সঙ্গে পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ।

ঙ) আত্মকল্যাণ, পারিবারিক কল্যাণ, গোষ্ঠী ও জাতীয়। কল্যাণের দিকে দৃষ্টি।

চ) আত্ম-নির্ভরশীলতা।

অনুশীলনী

1. Bring out the significance of Mental Health.

"Perfect Mental Health is a goal for living rather a progressive goal"—Discuss.

2. What is Personality ? How is it related to Mental Health ?

3. "Mental Health is the full and free expressions of all our native and acquired potentialities in harmony with one another by living.

directed towards a common end or aim of the personality as a whole." Elucidate the nature of Mental Health with particular reference to the above statement.

4. Discuss the modern concept of Mental Health. How is it related to adjustment ?

5. "Mental Health is dynamic not static, it is functioning of the whole organism towards an end, not the attainment of a certain state : it is not stagnation but a harmony of movement, living and active". Justify the statement and describe the salient features of Mental Health.

6. What methods would you adopt in ascertaining the Mental Health of an individual ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার স্বরূপ

(Nature of Mental Hygiene)

স্বাস্থ্যবিদ্যা ঃ—

'Hygiea' একটি গ্রীক শব্দ। এই শব্দটির দ্বারা স্বাস্থ্যের দেবীকে অভিহিত করা হয়। 'Hygiene' শব্দটি এই 'Hygiea' শব্দ থেকেই উৎসারিত। Hygiene বলতে আমরা বুঝি স্বাস্থ্যবিদ্যা। পদার্থবিদ্যা যেমন পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান অর্থাৎ পদার্থ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ ধারাবাহিক নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান, জীববিদ্যা যেরূপ জীব ও প্রাণী সম্বন্ধে ধারাবাহিক বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যাও সেইরূপ স্বাস্থ্যবিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক জ্ঞান। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় **স্বাস্থ্যবিদ্যা হল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সত্য ও সূত্র, যে সূত্রগুলি বৈজ্ঞানিক ধারায় পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে আবিষ্কৃত এবং যে সূত্রগুলি প্রতিপালনে স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, রোগাক্রান্ত হলে রোগমুক্তি ঘটে ও রোগাগম প্রতিরোধ করা যায়।**

স্বাস্থ্যের স্বরূপ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ঃ—

সক্রিয়তা ও সামঞ্জস্যই স্বাস্থ্যের মর্মস্থল। ভিতরে ও বাইরে সামঞ্জস্য বিধানই স্বাস্থ্যের লক্ষ্য ও ধর্ম। দৈহিক স্বাস্থ্যের বেলায় দেহের বিভিন্ন অংশের সজীব সক্রিয়তা, বিভিন্ন অংশের সক্রিয়তার মধ্যে সুস্বনতা (Harmony), সমস্ত ক্রিয়াকর্মের একটা লক্ষ্যে বিধৃতি এবং পরিণামে দেহের কর্মক্ষমতা ও বাইরের ভৌত (Physical) পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা (যেমন শীত, উষ্ণতা, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি) দৈহিক স্বাস্থ্যের সূচক। **মানসিক স্বাস্থ্যের বেলায়ও মনের বিভিন্ন শক্তি ও সম্ভাবনাগুলি, যেমন আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, বুদ্ধি, কল্পনা ইত্যাদি সক্রিয় ও কর্মক্ষম থাকবে, এদের ক্রিয়াকর্ম ভিন্নমুখী না হয়ে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হবে এবং কয়েকটি কল্যাণ চিন্তার দ্বারা সমগ্র মানসিক কার্য্যগুলি একমুখী হবে। ফল স্বরূপ যথার্থ কর্মক্ষমতা ও সমাজ সঙ্গতি ব্যক্তির**

মধ্যে পরিস্ফুট হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিষয়বস্তু বিস্তৃত, কেননা মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্ব (যাতে দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাও থাকে) ও ব্যক্তির সমাজ ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে একসংগে বিচার বিশ্লেষণ করে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার সংজ্ঞা :—

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক জ্ঞান যে জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ কোন ব্যক্তিকে তার সমগ্র মানসশক্তির পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশে সহায়তা করে, যা সঠিক প্রয়োগ দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিচয়ের সম্যক ব্যবহার করে সমাজে ও কর্মস্থলে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে যথাবিহিত কর্মসম্পাদনে সক্ষম করে এবং পারিবারিক ও সমাজ জীবনে সকল ব্যক্তির সাথে যথাযথ ও সন্তোষজনক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে সাহায্য করে। সংক্ষেপে বলা যায়, যে জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে, মানসিক বিকৃতি প্রতিরোধে ও রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। এই দিক থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা একটি প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞান (Applied Science)। ইহা একটি সদর্থক (Positive) বিজ্ঞানও বটে কেননা এর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুস্থ মানসিকতার অভ্যুদয় ঘটানো। এ পটভূমিতে বলা যায় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যার কাজ মানবিক কল্যাণকর্মের সাথে জড়িত এবং যার বিচরণ মানবিক সম্পর্কের সকল পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত।

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু :—

দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দৈহিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ এবং ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে তার রোগ নিরক্ষণ করা। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বিভিন্ন সমভাবী শাখা বিজ্ঞান, যেমন শরীরস্থান (Anatomy), শরীর বৃত্ত (Physiology), রোগবিদ্যা (Pathology), ঔষধবিদ্যা (Medicine), জীব রসায়ন বিদ্যা (Bio-chemistry), থেকে তথ্যনিচয় সংগ্রহ করে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যাও তার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে (মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মানসিক বিকৃতি ও রোগ প্রতিরোধ মানসিক রোগ নিরাময়) সফলকাম করার জন্য বিভিন্ন সমভাবী জ্ঞানশাখা যেমন শিশু মনোবিদ্যা, শিক্ষা সম্পর্কিত, অস্বভাবী মানস বিষয়ক

মনোবিদ্যা, শরীরবৃত্ত, ঔষধবিদ্যা এবং সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় সত্যাদি সংগ্রহ করেছে।

করণীয় ঃ—

(১) সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বয়ঃক্রম অনুসারে কি ধরনের জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকাশোন্মুখ শিশুর যাওয়া সমীচীন—অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে কি কি মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত ও পরিবেশে কি ধরনের মানবিক সম্পর্ক সন্নিবেশিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার অবশ্য করণীয়। মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধের প্রধান উপায় সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন।

(২) ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে সুস্থ জীবন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটানোর জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন। এরদ্বারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়।

(৩) মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্য বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন প্রকার মনশ্চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন ও তাদের যথার্থ প্রয়োগ।

(৪) মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যায় ব্যক্তির সার্থক সঙ্গতি সাধন প্রক্রিয়া বিশ্লেষিত হয়। এই সঙ্গতি সাধন প্রক্রিয়া (সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে) প্রক্ষোভের কার্য্যকারিতা ও তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।—এই পটভূমিতে মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ে ও সুষম ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য প্রক্ষোভের ধর্ম, তার বয়ঃক্রমানুসারী বিকাশ বৈশিষ্ট্য ও প্রক্ষোভ-প্রবুদ্ধ ক্রিয়াকে সামাজিক আচরণাদর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংযত করার উপায় প্রভৃতি বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার আরও একটি অপরিহার্য্য কাজ।

অনুশীলনী

1. Discuss the nature of Mental Hygiene.
2. What are the sources of knowledge of Mental Hygiene? How can you justify the scientific status of Mental Hygiene?
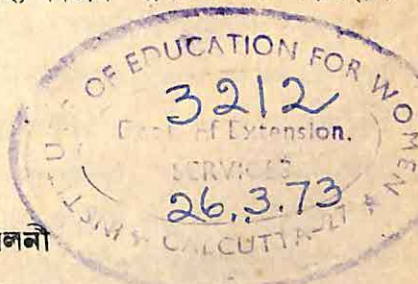
3. Elucidate the modern concipt of Mental Health. How is it related to Mental Hygiene ?

4. What constitutes the subject matter of Mental Hygiene ?

5. "Mental Hygiene is a positive science in that it sets out to establish a condition of healthy-mindedness, it is a normative and not a pure science, because it has a norm or standard at which it aims, namely that of mental health ; it is an applied science in that it seeks to discover and apply the principles for the establishment of mental health and happiness in the individual and in the community."—Discuss.

তৃতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও বিশদ উদ্দেশ্য

(Uses and the Aims of Mental Hygiene)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ-জীবন যাপন ব্যক্তি জীবন যাপনের মতই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। সমাজ বলতে আমরা কেবল বাইরের সমাজকে বুঝি না—পরিবার ও বিদ্যালয়ও ছোটখাট সমাজ ; কেননা সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ও বিদ্যালয় জীবনের মধ্যেও বহুলাংশে বর্তমান।

ব্যক্তি জীবনে :—

শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে—তার দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে পর্য্যায়ক্রমে মানসিক বিকাশও ঘটতে থাকে, শিশুর পরিচয় পরিক্রমার পরিসর ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে—মাতাপিতা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে ধীরে ধীরে সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে ও শিশুটিও ক্রমে এই সকল সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকে। এই সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার উপর অনেকাংশে শিশুর ব্যক্তিত্ব কোন্ ধারায় হবে তা নিরূপিত হয়। **সুসম স্নেহ-প্রীতি-প্রযত্ন পরিবৃত উদ্দীপনাময় স্বতঃস্ফূর্ত যে পারিবারিক পরিবেশ তার মধ্যেই শিশুর যথার্থ মানসিক বিকাশ ঘটে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়।** পরবর্তী জীবনে বৃহত্তর সমাজের সাথে সে স্বার্থক অভিযোজন করতে পারে। **সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশ থেকেই সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে উঠে এবং ব্যক্তি সার্থক সঙ্গতি সাধনের (Adjustment) মধ্য দিয়ে সমাজে আত্মশক্তির সম্পূর্ণ ও সম্যক নিয়োগ করতে পারে যার দ্বারা সার্থক ও সৃষ্টিশীল কর্মসম্পাদন সম্ভব হয়।** যথাবিহিত প্রতিযোজন ও যথাযথ কর্মসম্পাদনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন উভয়েই সুন্দর, আনন্দময় ও স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে। **অপর দিকে সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে না উঠলে পরিণামে নানাপ্রকার অপসঙ্গতিমূলক (Maladjusted) আচার-আচরণ প্রকাশ পায়।** চিন্তায়, কর্মে, মানবিক সম্পর্ক রক্ষায়, সকল বিষয়েই অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতি ঘটে—এই বিকৃতি কখনও খুব স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়, কখনও অত্যন্তক্ষীণ ভাবে

মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এই অপসঙ্গতি পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবন, কর্ম-জীবন, জীবনের সকল অধ্যায়কেই কোন-না-কোন ভাবে আঘাত করে, ফলে ব্যক্তি জীবনের সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ এক কথায় স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়।

সমাজ জীবনে ঃ—

মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি যেহেতু সামাজিক প্রকল্পগুলোকে ভেঙ্গে ফেলছে, সামাজিক অনুশাসন বহির্ভূত চিন্তা ও কর্মের দ্বারা সমাজ জীবনের বিশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিঘ্নিত করছে সেইজন্যে **ব্যক্তির অসুস্থ মানসিকতা সমাজ মানসিকতাকেও আক্রমণ করে। পরিণামে সমাজ জীবনও আক্রান্ত হয়।** অন্যদিকে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হলে তার কর্ম-ক্ষমতা হ্রাস পায়। পরিবারকে ও বৃহত্তর পটভূমিতে সমাজকে ব্যক্তি তার কর্ম উৎপাদন দিয়ে যে পরিমাণ সাহায্য করতে পারে, তা আর করতে পারে না, ফলে পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনের সমৃদ্ধি ও শান্তি বিঘ্নিত হয়।

বিশদ উদ্দেশ্য ঃ—

অতএব দেখা যাচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার উদ্দেশ্য মূলতঃ দ্বিবিধ। (ক) ব্যক্তি-মানসের সুস্থতা রক্ষণ (খ) সমাজ জীবনের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বা সমাজ মানসের সুস্থতা রক্ষণ। এই দিক থেকে দেখলে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সুদূর প্রসারী। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা, বিদ্যালয়ে শান্তি শৃঙ্খলা, আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করা, সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা, সমাজ কল্যাণ ও দেশ সমৃদ্ধির জন্য মানবিক শক্তির (man power) যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ প্রভৃতির জন্য অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্যদিকে পরিবারে ও বিদ্যালয়ে বিপথগামী (Problem children) শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য, কিশোর অপরাধীদের ও বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ও তাদের অসুস্থ জীবন ধারা সুস্থ করার জন্য, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময়ের জন্য অর্থাৎ মানসিক বিকৃতি ও রোগ নিরাময়ের জন্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সমভাবে বর্তমান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা একটি সামাজিক ও বৃহত্তর ভাবে একটি রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা অধীত না হলে তার জ্ঞানালোকে পারিবারিক জীবন, বিদ্যালয়ের জীবন ও সমাজ সম্পর্ক পরিশীলিত হয় না; অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জীবন যাপন প্রণালীকে নানাভাবে বিকৃত ও পঙ্গু করেও সুষম ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিশদ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে নিম্নরূপে বিবৃত করা যায়ঃ

ক) পারিবারিক জীবনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তন ও যথাযথ সম্পর্ক রচনা—এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনে আনন্দ ও শান্তি আনা যাতে সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে।

খ) বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করা—এর জন্য বিদ্যালয়ে যথাযথ পরিবেশ রচনা যাতে শিক্ষার্থীর সুপ্ত-শক্তি পূর্ণরূপে বিকাশ লাভের সুযোগ পায় এবং পরবর্তীকালে সে একজন কর্মক্ষম সংহতিপূর্ণ নাগরিক হতে পারে।

গ) ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ জীবন থেকে বিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলা দূরীকরণ—অর্থাৎ (১) বিপথগামী শিশুদের পুনর্বাসন (২) অসামাজিক ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন (৩) মানসিক বিকৃতি ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময়।
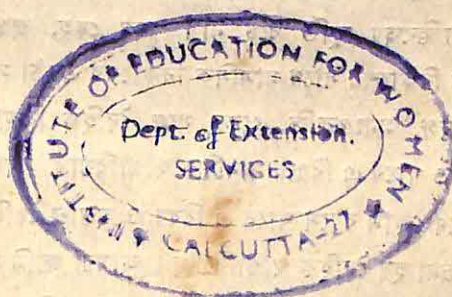
চতুর্থ অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসর

(Scope of Mental Hygiene)

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উদ্দেশ্য তিনটি—প্রথমতঃ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন, দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিত্বের সুস্থতা বা প্রকারান্তরে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ। তৃতীয়তঃ ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা অসুস্থতা দেখা দিলে অর্থাৎ মানসিক বিকৃতি বা রোগ দেখা দিলে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সফল করতে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার যে কর্ম-পরিসর পরিলক্ষিত হয় তা বহুমুখী ও বহুবিস্তৃত। বস্তুতঃ মানব জীবনের প্রায় সকল পর্য্যায় ও সকল প্রকার মানবিক সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক পর্য্যবেক্ষণই মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসরের অন্তর্গত।

দৈহিক স্বাস্থ্য :—

সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য সুস্থ দৈহিক স্বাস্থ্যের গঠন ও তার সংরক্ষণ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। শিশু যদি যথাযথ খাদ্য না পায়, কিংবা অখাদ্য-কুখাদ্য খায় ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অন্যান্য দিকের প্রযত্ন যথাযথ না হয়—তা'হলে তার দেহ অপুষ্ট ও রুগ্ন হয়ে উঠবে। অপুষ্ট ও রুগ্ন দেহে কখনই সুস্থ ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি ঘটে না। সুস্থ দেহ, সুস্থ মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দৈহিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশের একটা সম্পর্ক আছে। বুদ্ধি, স্মৃতি, মনোযোগ, মনঃপ্রকৃতি এদের সঙ্গে দৈহিক বিকাশের সম্বন্ধ বর্তমান। এখন প্রশ্ন হতে পারে এ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কাজ কি? কোন খাদ্য কি পরিমাণে কোন বয়সে খাবে এ বিষয় ও অন্যান্য দৈহিক প্রযত্ন প্রথার বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয় দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্যায়। আমরা জানি অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ বা শিশুর একান্ত নির্ভরশীল আশ্রয় মাতাপিতার আচার, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী যদি সুস্থ না হয় তা'হলে পিতামাতার বিকৃত আচরণ ও প্রতিন্যাস (Attitude), শিশুর মনোরাজ্যে নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর ভাবের উদ্রেক করে, যা পরোক্ষভাবে তার দৈহিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, অত্যন্ত পুষ্টিকর

খাদ্যও যদি প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে না খাওয়া যায়,—তা'হলে অজীর্ণতা দেখা দেয়—গৃহ পরিবেশে যদি কোনপ্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকে, তা যদি অস্থির কোলাহলপূর্ণ হয় তা হ'লে সেই পরিবেশে যথাযথ নিদ্রার বিঘ্ন ঘটে, ফলে দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। **কাজেই দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য বস্তুগত চাহিদা যেমন যথার্থভাবে মেটানো প্রয়োজন, মানসিক পরিবেশও (Psychological environment) সুস্থ ও যথার্থ হওয়া প্রয়োজন। এই মানসিক পরিবেশের গঠন সম্পর্কে তথ্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা দিয়ে থাকে।** তাছাড়া দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গৃহের অভিভাবক ও পিতামাতার ধারণা ও আচরণ যদি সুস্থ না হয় তা হলেও শিশুর মধ্যে অহেতুক স্বাস্থ্য-চর্চা বা অনাচর্চার ভাব নিয়ে আসতে পারে—যাতে করে দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিশুর মধ্যে সুস্থ মনোভঙ্গী সৃষ্ট হয় না। পরোক্ষভাবে ইহা দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। এ দিক থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসর দৈহিক স্বাস্থ্যের গঠন ও রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত।

পারিবারিক পরিবেশে সুস্থতা অসুস্থতা :—

সুস্থ মানসিক পরিবেশ বলতে আমরা মোটামুটি বুঝি পরিবেশে শিশুর মানসিক মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা (যেমন শিশুর জন্য সুষম স্নেহ-প্রীতি, যত্ন, উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্তভাব) ও পরস্পরের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক। পারিবারিক পরিবেশে পিতামাতার সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক, ভ্রাতা ভগ্নীর সম্পর্ক, গৃহ পরিবেশে নিয়মশৃঙ্খলা—এসব বিষয় মানসিক পরিবেশ রচনায় কাজ করে। পিতামাতার সম্পর্ক যদি স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত না হয়, পিতামাতা যদি প্রায়শঃই কলহ ও মনোমালিন্যের মধ্যে থাকে তাহলে শিশু নিজেকে অত্যন্ত নিঃসহায় বোধ করে। শিশুর মধ্যে একটা অস্থির উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় কেননা পিতামাতাই শিশুর একমাত্র আশ্রয় স্থল। এই অস্থির দুশ্চিন্তা তার সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনকে বিঘ্নিত করে। পিতামাতার বিবাহিত জীবনের সঙ্গতি যদি নিশ্ছিদ্র না হয়—তাহলে পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যে অদৃশ্য উত্তেজনা বর্তমান থাকে তা মানসিক পরিবেশকে অস্থির ও দূষিত করে। গৃহে জীবন-যাপন প্রণালীতে, সন্তান প্রতিপালনে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব হলে, শিশু কি ভাবে চলবে, কোন আচরণাদর্শ গ্রহণ করা সমীচীন হবে সে সম্পর্কে একেবারে হতচকিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে ও এর ফলে তার সংহতিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠিত হতে পারে না।

অতএব ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে গৃহ পরিবেশের কার্য্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও গৃহ পরিবেশকে কি ভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দকর করে তোলা যায়, সন্তান প্রতিপালনের সঠিক পদ্ধতি কি হওয়া উচিত এসব বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার পরীক্ষা নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

মানসিক বিকাশধারা পর্য্যবেক্ষণ ঃ—

মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিকের ও বিভিন্ন পর্য্যায়ের বিকাশধারার পর্য্যবেক্ষণ ও তাদের বিকাশ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ সত্য উদ্ঘাটনও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্মসূচীর অন্তর্গত। প্রক্ষোভের বিকাশ-ধারা ও বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধির বিকাশ-পর্য্যায়, সমাজ-চেতনার পর্য্যায়-পর্ব—এ সকলের বিজ্ঞান-ভিত্তিক পর্য্যবেক্ষণ একান্তভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গড়ে ওঠে না। বিভিন্ন দিকের মানসিক বিকাশের সামঞ্জস্যের উপরই ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নির্ভর করে। মানসিক মৌলিক চাহিদা (Mental Basic needs) সম্বন্ধে গবেষণা ও এ বিষয়ে যথার্থ তথ্যাদি সংগ্রহ করাও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসরের অন্তর্ভুক্ত, কেননা সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে মৌলিক চাহিদা পূরণের একটা গভীর যোগসূত্র আছে।

বিদ্যালয় ঃ—

বিদ্যালয়ের কর্মধারার মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রসারিত। কেবল পুঁথিগত জ্ঞানার্জ্জনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে, পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাকে জানা, এইসকল শক্তির পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ এবং তার মধ্য দিয়ে সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য। বিদ্যালয়ে শিশুর ব্যবহার, শিক্ষা-বিষয়ে উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সাথে তার আচরণ ও বিদ্যালয়ের নানাবিধ গঠনাত্মক ক্রিয়া-কর্মের সাথে তার সম্বন্ধ ও অংশগ্রহণ এ সকল বিষয়ই মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য্য।

পারিবারিক জীবনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার জন্য যেমন মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার কার্য্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন—বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশোপযোগী করে তোলার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের জীবন বলতে বুঝায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন। এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য

রক্ষার দু'টি দিক আছে—একদিকে সংরক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক ও অপরদিকে নিরাময়মূলক দিক।

পাঠক্রম ঃ সহ পাঠক্রম ঃ—

বিদ্যালয়ে বয়ঃক্রমানুসারী ও মনঃবিকাশানুযায়ী পাঠক্রম সহপাঠক্রমিক কার্য্যক্রম (যেমন খেলা-ধুলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বিদ্যালয়ের প্রাচীর পত্র, শিক্ষা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, বিতর্ক সভা) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দ্ধারিত হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয় ও মানসিক বৈকল্যকে প্রতিরোধ করা যায়।

শিক্ষা-নির্দ্দেশনা ঃ—

বর্তমানে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা-নির্দ্দেশনা (Educational Guidance) দেওয়া হয় তার মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটা লক্ষ্য থাকে। যার যে বিষয়ে শক্তি ও রুচি তাকে যদি সেই বিষয় পাঠে পরিচালিত ও উৎসাহিত না করা হয়, বিশেষ বুদ্ধি সম্পন্ন ও ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যদি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে তাদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রম, ভিন্ন শিক্ষাধারা ও তাদের উপযোগী অন্যান্য ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে তাদের মধ্যে একটা হতাশা আসে। এর ফলে তারা অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে যথার্থভাবে মানিয়ে চলতে পারে না। নানাপ্রকার অপসঙ্গতিমূলক আচরণ এসব ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে যা সামগ্রিক ভাবে বিদ্যালয়ের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে।

এ ছাড়া বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয় ; যেমন বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বিপর্য্যস্ত করা, জিনিষ পত্র ভাঙ্গা, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া, শিক্ষককে অপমান করা, সহপাঠীদের মারধর করা, মিথ্যাকথা বলা, চুরি করা, কিংবা পড়াশুনায় অমনোযোগিতা ও অনগ্রসরতা এইসব সমস্যা মানসিক স্বাস্থ্যহানিরই প্রকাশ ও প্রতিফলন। এদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য অর্থাৎ এদের মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য ও মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্যও মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার কর্ম কাণ্ড ব্যপ্ত হতে পারে।

শিক্ষকদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব ও সুস্থ মানসিকতা বিদ্যালয়ে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এ বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা অনেক পরিমাণে আলোকপাত করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদান করতে পারে যার দ্বারা বিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা শিক্ষক যথার্থ ভাবে বুঝতে সক্ষম হতে পারেন।

কিশোর অপরাধী ও দুষ্ক্রিয়তা ঃ—

আইনের দৃষ্টিতে যারা দণ্ড পাওয়ার যোগ্য সেই সব তরুণ অপরাধী মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাময় ও পুনর্বাসনের জন্য উদ্দিষ্ট। ১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই সব কিশোর অপরাধীরা বড়দের মতই আইনানুগ শাস্তি পেত। ন্যুইয়র্কের ব্রুকলিনে প্রথম এই সব তরুণ অপরাধীদের (যাদের বয়স ১৬ থেকে ২১-র মধ্যে) জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় স্থাপিত হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিধিনিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এদের গোড়া থেকে দেখা না হয় তাহলে এরাই পরবর্তীকালে সমাজে চিহ্নিত দুষ্কৃতকারী রূপে দেখা দেয় ও সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত করে। একদিকে এইসব কিশোর অপরাধীদের অন্যদিকে বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের আচার আচরণকে সামাজানুগ করার জন্য, তাদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার অনেক কিছু করণীয় আছে। বর্তমানে কারাগার কেবল অপরাধীদের বন্দীশালাই নয় তাদের মানসিক জীবনকে উন্নত করার নানাবিধ স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপঞ্জী প্রণয়ন ও রূপায়ণেও প্রয়াসী।

মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ঃ—

মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, যাদের আচার আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা ও অসামাজিক ভাব প্রকট—তাদের চিকিৎসার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও তাদের যথার্থ প্রয়োগের জন্যও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার গবেষণা-লব্ধ সূত্রাদি কাজ করে। তাদের জীবন বিন্যাসে ও সুস্থতা আনয়নেও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উল্লেখযোগ্য কর্মধারা বর্তমান।

কর্মক্ষেত্র ঃ—

বিভিন্ন কর্ম সংস্থায়ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্মসীমা বর্তমানে প্রসারিত। যে কোন শিল্প উৎপাদনই সাবলীল ও সচল যন্ত্র এবং সুস্থ যন্ত্র চালকের সমন্বিত কর্মফল। পূর্বে যন্ত্র ঠিক থাকলেই উৎপাদন ঠিক থাকে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে শিল্প কর্মীদের দৈহিক সুস্থতার সঙ্গে মানসিক সুস্থতা যদি অটুট না থাকে, তাদের কারও মানসিক বৈকল্য দেখা দিলে তার নিরাময় না ঘটালে, শিল্পক্ষেত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও উৎপাদন হ্রাস পায়। কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাকে সে কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় ; এর

ফলে তার মধ্যে কোন প্রকার ধূমায়িত অসন্তোষ থাকে না, সে সকল শক্তি দিয়ে তার কর্ম সম্পাদনে প্রয়াসী হতে পারে। যথোপযুক্ত বিশ্রাম, যথোপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য উপকরণাদির অবতারণা করার বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অনেক কিছু করণীয় আছে। এ ছাড়া শিল্প ক্ষেত্র ও অন্যান্য কর্ম সংস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে মানবিক সম্পর্ক উন্নত ও সহৃদয় করার বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা কাজ করতে পারে।

অনুশীলনী

1. Define the scope of Mental Hygiene.
2. Discuss the problems of Mental Hygiene.
3. Elucidate the aims and the uses of Mental Hygiene.
4. "In its broadest sense, the aim of Mental Hygiene is to help all persons achieve fuller, happier, more harmonious, and more effective lives"—Discuss.
5. Describe the nature and scope of Mental Hygiene.

পঞ্চম অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ঐতিহাসিক পটভূমি ও আন্দোলন

(Concept and the Movement of Mental Hygiene)

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনোপলব্ধি কিন্তু হঠাৎ একদিনে হয় নাই, বস্তুতঃ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ধারণা (concept) ও তার প্রয়োগ-প্রসার চিন্তাজগতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল।

ফরাসী বিপ্লব :—

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ক্ষীণভাবে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ধারণার অভ্যুদয় ঘটে। ডঃ ফিলিপ পিনেল এই সময় মানসিক বিকারগ্রস্ত ও উন্মাদ ব্যক্তিদের সম্পর্কে যথাযথ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ ও তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি এ বিষয়ে একদিকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে অন্য দিকে তাঁর চিকিৎসক সহকর্মীদের তরফ থেকে যুগপৎ বাধা পেয়েছিলেন। সংস্কারের প্রথম পর্য্যায় হিসাবে তিনি উন্মাদ ও মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের শৃঙ্খল-বন্ধন থেকে মুক্ত করে চিকিৎসাগারে রাখেন। এই সময় মানবিক সভ্যতার প্রগতিশীল ভাবধারা, যে ভাবধারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মূল্যায়ণের উর্ধে রেখেছিল, তারই সময়। এই ভাবাদর্শই মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের সহৃদয় মানবিক প্রযত্নে প্রবুদ্ধ করেছিল। এই দৃষ্টিকোণ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উদ্ভব ও বিকাশে অনেকাংশে দায়ী।

ইংল্যাণ্ডে টিউকের আন্দোলন :—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইয়র্কে টিউক আন্দোলন আরম্ভ করেন। জনসাধারণকে তিনি বুঝাতে চেষ্টা করেন যে উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরা অসুস্থ; তারা শয়তান শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বা অপরাধী নয়। তারা যাতে চিকিৎসার সুযোগ ও মানবিক আচরণ পায় সেদিকে সমাজের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা :—

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ভাবধারা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়েও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ভাবধারা সংহত হয়েছে। আধুনিক

শিক্ষাধারায় শিশুর সার্বিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়—তার সমগ্র মানস বৈশিষ্ট্যকে গোচরে রেখে, তার সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা-রীতি, পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রম প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারী স্কুলে ক্রীড়া-ভিত্তিক সৃষ্টিধর্মী, কখনো কখনো যৌথ যে ক্রিয়া কর্মের অবতারণা করা হয় তার মূল উদ্দেশ্য হল শিশুর মধ্য থেকে আত্মকেন্দ্রিক ভাব বিদূরিত করা ও সামাজিক ভাবে চলার শিক্ষা দেওয়া। এর আরও একটা উদ্দেশ্য হল, আত্মপ্রত্যয়, উৎসাহ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে নূতন নূতন তথ্যসারে পরিক্রমা ও তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া। 'নার্সারী বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কার্যক্রমই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সুদৃঢ় ও সুস্থ রাখার জন্য সৃষ্ট। মোটের উপর শিশুকেন্দ্রিক মনোবিদ্যা ভিত্তিক শিক্ষা-আন্দোলন মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যাকে একটি প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেকখানি কাজ করেছে।

ফ্রএড-এর চিন্তাধারা ঃ—

মানসিক রোগের কারণ অনুসন্ধান ও নির্ণয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন সিগমুণ্ড ফ্রএড্। নির্জ্ঞান মনের (Unconscious Mind) শক্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে এবং মানবিক চিন্তা ও আচরণে এর অদৃশ্য প্রভাব বিষয়ে আবিষ্কার করে ফ্রএড্ মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নূতন ফলবতী অধ্যায় যোজনা করেন। তাঁর মনঃসমীক্ষণের ভাবধারা, তাঁর অনুগামী ও পরবর্তীকালে বিরোধী এড্লার ও ইয়ুং এর মতাদর্শ মনোরাজ্যের অনেক অজ্ঞাত গভীর রহস্যের সন্ধান দেয়। মনঃসমীক্ষণের মননে মানসিক রোগ নিরাময়, মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধ, মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার এই ত্রিবিধ কার্য্যাবলী বিজ্ঞান সম্মত ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে মনঃসমীক্ষণ মতবাদের প্রসার ঘটে। পরে আমেরিকাতেও এ মতবাদের বিস্তার ঘটে। ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে উদ্বায়ুরোগ (Neurosis) সম্পর্কে কার্মিক (Functional) মতবাদ (অর্থাৎ উদ্বায়ুরোগ মনের ক্রিয়া-কর্মের বিকৃতি হেতু সৃষ্ট, দেহজ কোন কারণে নয়) বিশেষ করে মনঃসমীক্ষণমূলক মতবাদ সমধিক প্রচলিত হয়। ফ্রএড্-এর মতে, মনের কার্য্যকারিতা অনুসারে মনকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়—'ইড্, ইগো' ও 'সুপার ইগো।' ইড্ হচ্ছে মনের অন্ধ কামনা বাসনার আবাস স্থল বা একে বলা যায় প্রাবৃত্তিক সত্তা ; এই প্রাবৃত্তিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে নির্জ্ঞান

মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত। মনের এই অংশটি সুখান্বেষণে (Pleasure Principle) নিরত কর্মমুখর। 'ইগো' বা বাস্তব সত্তা মনের এই অংশটির কিছুটা অবচেতন মনের মধ্যে থাকে, বেশীর ভাগই থাকে চেতন মনে, এর কাজ হল প্রাবৃত্তিক সত্তার কার্য্যাবলীকে বাস্তবানুগ করা—'সুপার ইগো' বা বিবেক সত্তা, যার অবিস্থিতি বেশীর ভাগই নির্জ্জন মনে, কিয়দংশ চেতন মনে ; এর কাজ হল বিবেকাদর্শে প্রাবৃত্তিক সত্তার ক্রিয়া কর্ম নিয়ন্ত্রিত করা। প্রাবৃত্তিক মন, বাস্তব মন ও বিবেক মন এদের সকলেরই অধিষ্ঠান কম বেশী অবচেতন মনের মধ্যে, অর্থাৎ মনের সেই অংশে, যে অংশের কার্য্যকলাপ ব্যক্তির চেতন অবগতির মধ্যে নেই। ফ্রএড্-এর মতে এই তিনের সুসমঞ্জস ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্য নিহত। এদের ক্রিয়াকলাপের অসংগতিই মানসিক রোগের কারণ।

১৯১৮ সালে একদিকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে ক্লিফোর্ড বীয়ার্স-এর সমর্থ নেতৃত্বে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলনের সংহতি ঘটে এবং আমেরিকায় মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের বিশেষ প্রভাব ঘটে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলন (১৯০৮) :—

১৯০০ সালে, চব্বিশ বৎসরের যুবক ক্লিফোর্ড বীয়ার্স পাঁচতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার নিষ্ফল প্রয়াস করে। বিচারক তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক মানসিকতা ও আচরণের জন্য মানসিক রোগীদের আবাসস্থলে প্রেরণ করেন। নির্মম ব্যবহার ও উদাসীনতার মধ্য দিয়ে তিন বৎসর তিনি বিভিন্ন উন্মাদাবাসে কাটান। ১৯০৮ সালে বীয়ার্স নিজ চেষ্টায় সুস্থ হয়ে তার আত্ম-চরিত লেখেন। এতে তিনি এইসব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। এর পর থেকেই এ ধারণা আসে যে, শিশুর পরিণতিকালীন পর্য্যায়ে (Maturation time) যদি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহ'লে পরবর্তীকালে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর তার একটা প্রভাব থাকে—এ থেকেই Child guidance বা শিশু-নির্দেশনার ধারণা আসে। এ্যাডলফ্ মেয়ার নামে একজন বিখ্যাত মনশ্চিকিৎসক বীয়ার্সকে এ বিষয় নিয়ে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন ও তিনি মনে করেন যে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা করা প্রয়োজন এবং এর জন্য একটি নূতন বিজ্ঞান বিষয়ের সৃষ্টি সমীচীন। তিনি এই বিজ্ঞানের নামকরণ করেন মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বা

Mental Hygiene এবং এই আন্দোলনকে বলা হয় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলন বা Mental Hygiene Movement.

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক প্রথম সংস্থা (১৯০৯) :—

এই আন্দোলনের ফলে আমেরিকার কনেকৃটিকাট্ শহরে প্রথম মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা সংক্রান্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ১৯০৯ সালে এ বিষয়ে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National Committee for Mental Hygiene) স্থাপিত হয়। মানসিক রোগ যে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা এ বিষয়ে আমেরিকার জনসাধারণকে সজাগ করার জন্য এ সংস্থা কাজ করে। মানসিক রোগীদের জন্য আরও চিকিৎসাগার স্থাপন ও এর কার্যব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য সংস্থার কার্যনির্ব্বাহক সমিতি উদ্যোগী হন। ক্রমে এই সমিতি মানসিক বৈকল্য ও বিকৃতি প্রতিরোধ ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে অধিক জোর দেন। সমিতির সভ্যগণ উপলব্ধি করেন যে বিংশ শতাব্দীর জীবন ধারার মধ্যে এমন অনেক অস্থিরতা ও নিরাশ্রয়তা আছে যা আবেগ জীবনের (Emotional life) প্রশান্তিকে ব্যাহত করে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক প্রথম আইন (১৯৪৬) :—

১৯৪৬ সালে আমেরিকায় প্রথম জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য-আইন প্রণীত হয়। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা বলে এই আইনে মেনে নেওয়া হয়। ইহাতে উল্লিখিত হয় যে, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি ও যত্ন নেওয়াই মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার একমাত্র কাজ নয়—মানসিক ব্যাধির প্রতিরোধ এবং নিরাময়ও এর কাজ। মানসিক রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় যে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব—এ সত্যকে যথার্থভাবে গ্রহণ করা হয়। আরও একটি আইনের দ্বারা মানসিক রোগ বিষয়ে সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা কার্য্য এবং এই গবেষণা উৎসারিত যে সত্য তা যথাযথরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্য আর্থিক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক সংস্থা (১৯৪৯) :—

মানসিক স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রণালীর অবগতি ও তাদের প্রতিপালনে জনসাধারণকে সহায়তা করার জন্য ১৯৪৯ সালে দুটি কর্মবিভাগ

স্থাপিত হয়। প্রথমটি শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্র ও স্থানীয় বিষয়ক বিভাগ। এ দু'টি বিভাগেরই কাজ হল জনসাধারণের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার মূল নীতির প্রচার ও প্রসার করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থার সুপ্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমানে এই সমিতির প্রধান প্রধান কার্য্যক্রমের কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল :

(ক) মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা ও তার জন্য অর্থ সংস্থান।

(খ) মনশ্চিকিৎসার সুবিধার্থে রোগ সংলক্ষণগুলি (symptoms) প্রথম পর্য্যায়ে চেনার জন্য গবেষণা কার্য্যে সহায়তা করা।

(গ) সমাজ স্বার্থ রক্ষাকারী সংস্থার সাথে বিপথগামী শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন ও তার পরিচালনা বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করা।

(ঘ) মানসিক চিকিৎসাগারকে সাহায্য দান ও এগুলিকে যথার্থ মানে উন্নীত করতে সাহায্য করা।

(ঙ) বিদ্যালয়ে, শিল্পাগারে, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিতে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে তার যথাযথ ব্যবহারে প্রেরণা দেওয়া।

(চ) মানসিক বিকাশ রুদ্ধ ব্যক্তিদের পরিচর্য্যা ও তাদের কর্মে পুনর্বাসন।

অনুশীলনী

1. Trace the developmental history of the Mental Hygiene Movement.

2. How did the modern trends in Education help the emergence of the concept of Mental Hygiene ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা
(Basic needs of Children, Mental Health & Education)

চাহিদাজাত প্রেষণা :—

বাঁচার জন্য আমাদের কতকগুলি প্রয়োজন মেটাতে হয়—প্রয়োজন ঠিকভাবে না মিটিলে অস্তিত্ব বিষণ্ণ, বিশীর্ণ ও বিপন্ন হয়। বেঁচে থাকার জন্যই সতত কর্ম প্রয়াস এবং বেঁচে থাকার জন্য যে প্রয়োজন, তা মেটাবার জন্যই প্রাণীর কর্ম প্রচেষ্টা। কাজ করার ইচ্ছা উদ্গত হয় অভাব বোধ থেকে—শূন্যতাই সর্বদা আমাদিগকে পূর্ণতার অভিমুখী করে তোলে। আমাদের অস্তিত্বের জন্য যা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, এমন সব প্রয়োজনকে মেটাবার জন্য যে তাড়না অনুভব করা যায়—এই তাড়নাই পরিণামে প্রাণীকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। অনেকক্ষণ খাবার না পেলে, আমরা একটা অস্বস্তি অনুভব করি। এই অস্বস্তি ধীরে ধীরে এমন তীক্ষ্ণ হয় ও এমন একটা পর্য্যায়ে পৌঁছে যখন আমরা খাদ্যের সন্ধান না করে পারি না। তাহলে দেখা যাচ্ছে খাদ্যের অভাববোধ থেকে, অস্বস্তি ও উত্তেজনা, যাকে আমরা এক্ষেত্রে বলব ক্ষুধা, এবং এই অস্বস্তিই আমাদিগকে খাদ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। চাহিদাকে (Need) বলা যায় কোন বস্তু বা ক্রিয়ার অভাব বা কমতি, যে বস্তু বা ক্রিয়া সুস্থ জীবনের জন্য অপরিহার্য্য। প্রেষণা (Motivation) কি প্রকারের হবে সেটা নির্ভর করবে চাহিদার প্রকৃতির উপর। প্রেষণা কতটা তীক্ষ্ণ হবে সেটা নির্ভর করবে অভাববোধের তীক্ষ্ণতার উপর।

সমালোচনা—এ সত্য সর্বদা ঠিক নয়। যদিও চাহিদাই প্রেষণার উৎস, তবু এ সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ আছে। কেবল চাহিদাই প্রেষণার উৎস কিনা এ বিষয়ে প্রথম অভিযোগ যে, কর্মপ্রেষণার প্রবলতা চাহিদার প্রবলতার সমানুপাতিক নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটি ইঁদুরকে চারদিন যদি খেতে না দেওয়া হয় তাহলে খাদ্যের জন্য তার যে কর্মতৎপরতা, পাঁচদিনে, ছ'দিনে

বা আরও বেশী দিন না খাইয়ে রাখলে কর্মতৎপরতা সমানে বেড়ে না গিয়ে তা কমতে থাকে। নীতিগতভাবে আরও একটি অভিযোগ আছে। অভাব সর্বদাই একটা নঞর্থক ঘটনা। সব প্রচেষ্টার মধ্যে যে বেগ ও শক্তির প্রয়োজন সেটা কেবলমাত্র কোন কিছুর অভাববোধ থেকেই উৎসারিত হতে পারে না।

প্রেষণা ও উদ্দীপক :—

উদ্দীপক (Stimulus) একটি এমন শক্তি যা দেহের বিভিন্ন অংশকে বা সামগ্রিকভাবে দেহকে উদ্দীপ্ত করে এবং এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে কর্মস্পৃহা দেখা দেয়। উদ্দীপকই সাড়ার উদ্রেক ঘটায় এবং সেইজন্য প্রেষণার সাথে উদ্দীপকের একটা সম্বন্ধ আছে। একটি শিশুকে যদি পিন্ দিয়ে জোড়ে খোঁচা দেওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির মধ্যে কতকগুলি আচরণ দেখা দেয়। শিশুটি হাত পা ছুঁড়বে, চীৎকার করবে, এই উদ্দীপক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য শিশুটি প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এই বিপদ থেকে যতক্ষণ পর্যান্ত না শিশুটিকে কেউ রক্ষা করছে ততক্ষণ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে উদ্দীপকই শিশুটির মধ্যে কর্মে-প্রেরণার সৃষ্টি করছে। কেননা এ উদ্দীপক শিশুটিকে কর্মে উদ্দীপ্ত করছে ও কর্মে অনেকটা সময় নিরত রাখছে। এই ধরণের প্রেষণাকে বহির্জাত প্রেষণা বলা যেতে পারে। কেননা, এদের বেলায় বাইরের উদ্দীপক কাজ করে। অন্তর্জাত প্রেষণা যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা আরও জটিল প্রকৃতির। এসব ক্ষেত্রে উদ্দীপক অন্তর্জাত—এবং প্রকৃতিতে রাসায়নিক যা স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীল কোষের উপর কাজ করে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। মোটের উপর চাহিদা ও উদ্দীপক উভয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রেষণা বা কর্মপ্রেরণার উদ্গতি ঘটে।

উদ্দেশ্য (motive) বলতে আমরা কি বুঝি ? বস্তুতঃ উদ্দেশ্য বা motive এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা সহজ নয়। উদাহরণ দিয়ে উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। খাওয়া, সামাজিক স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছার দু'টি উদ্দেশ্য। যে কোন উদ্দেশ্যের পিছনেই একটা চাহিদা (need) বা অবস্থা (situation) কাজ করে, এ থেকে একটা অস্বস্তির (tention) উদ্ভব হয়। এই অস্বস্তি থেকেই আচরণ আসে এবং সঙ্গতি সাধনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এর পরিণতি

ঘটে। যে কোন উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যেই এ চারটি ধারণা বর্তমান থাকে। একটা ছকে আমরা সকল ঘটনাকে দেখাতে পারি—

চাহিদা
অন্তর্জাত ↓ ↑ বহির্জাত
উদ্দীপক
↓
অস্বস্তি
↓
কর্মপ্রেষণা
↓
দেহ-মনে ভারসাম্য আনয়নের জন্য আচরণ
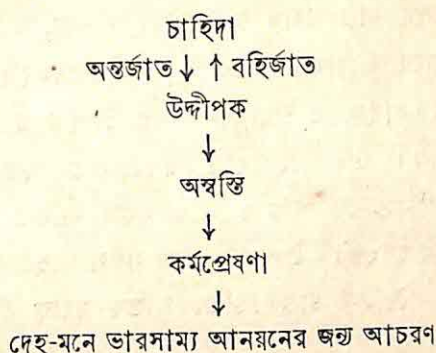
চাহিদা, অস্বস্তি, কর্মপ্রেষণা—এ সমস্ত পর্য্যায়গুলিই একের সাথে অপরে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। চাহিদা হল একটা স্থাণু অবস্থা, কিন্তু কর্মপ্রেষণা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, অস্বস্তি (tension) হল একটা অনুভূতি। সার্বিক ঘটনার কোন্‌টির উপর জোর দেওয়া হবে তার উপর নির্ভর করে এই ঘটনার কোন্ পর্য্যায়টির নাম করা হবে। যেমন, যখনই বলব ব্যক্তির মধ্যে কোন কিছুর চাহিদা আছে তখনই বুঝতে হবে চাহিদা জনিত একটা অস্বস্তি আছে এবং অস্বস্তি থেকে দেহ-মনকে সাম্য ভাবে (Homeostasis) ফিরিয়ে আনার জন্য একটা কর্মপ্রেষণা আছে। আবার কর্মপ্রেষণা শব্দটি ব্যবহার করলেও বুঝতে হবে চাহিদা বা উদ্দীপকের কথা, অস্বস্তির কথা। কাজেই চাহিদা—অস্বস্তি—কর্মপ্রেষণা এরা একক বা বিচ্ছিন্ন কোন কিছু নয়—একই ঘটনার বিভিন্ন পর্য্যায় মাত্র।

চাহিদার প্রকার ঃ—

দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দৈহিক কতকগুলি মৌলিক চাহিদা আছে। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক কতকগুলি চাহিদা আছে। বিভিন্ন মনোবিদ এই মৌলিক চাহিদার বিভিন্ন প্রকারের কথা বলেছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য যেহেতু সার্বিক, সেইহেতু মৌলিক চাহিদার দৈহিক, মানসিক, এরূপ ভাগ বৈজ্ঞানিক নয়। বুঝার সুবিধার জন্য এরূপ ভাগ করা হয়েছে।

দৈহিক চাহিদা :—

দৈহিক চাহিদা দেহের অস্তিত্ব ও সুস্থতা রক্ষার জন্য অনিবার্য্য। শিশুর জন্মক্ষণ থেকেই তার খাদ্য যথার্থ আশ্রয়, উন্মুক্ত বায়ু, ও যথাযথ তাপমাত্রা প্রভৃতি অনিবার্য্যভাবে প্রয়োজন। ভৌতিক পরিবেশের (physical environment) সাথে সার্থক প্রতিযোজনের জন্য দৈহিক চাহিদার পরিপূরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। এই চাহিদাগুলি জন্মগত, ও মৌলিক প্রায় সর্বজনীন। এইসকল চাহিদা জনিত যে আচরণ তাও সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রায় একই রকম ভাবে পরিলক্ষিত হয়। শৈশবের প্রায় সকল আচরণের উৎস বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত দৈহিক চাহিদাগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় :

(ক) খাদ্যের চাহিদা (ঙ) নিদ্রার ও বিশ্রামের চাহিদা
(খ) আশ্রয়ের চাহিদা (চ) উপযুক্ত আলো ও নির্মল বায়ুর চাহিদা
(গ) যথাযথ পোষাক পরিচ্ছদের চাহিদা (ছ) যথাযথ তাপমাত্রার চাহিদা
(ঘ) অস্তিত্ব বিপন্নকারী কোন অবস্থা থেকে মুক্তির চাহিদা

মনের চাহিদা :—

দৈহিক অস্তিত্বই মানুষের সবটা নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মূলতঃ সমাজ জীবন যাপনের জন্য মানুষের মধ্যে একটা মৌল চাহিদা রয়েছে। নিঃসঙ্গ ও সম্পূর্ণ একাকী জীবন যাপন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল জৈবিক জীবন যাপনেই মানুষের জীবন-সীমা সীমিত থাকে না, পরিব্যপ্তি (expansion) মানব জীবনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজজীবনের জন্য কতকগুলি মৌল চাহিদা রয়েছে— এ চাহিদাগুলিকে মানসিক চাহিদাও বলা যেতে পারে। অহংবোধকে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করার জন্য যে চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় মানসিক চাহিদা—যেমন আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা, আত্ম-বিকাশের চাহিদা, ভালবাসা পাওয়ার চাহিদা, অপরকে ভালবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেইজন্য প্রত্যেক মানুষকেই প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। মানুষ বন্ধু চায়, প্রশংসা পেতে চায়, বিশ্বস্ততা, সম্মান, নেতৃত্ব পেতে চায়, এদিক থেকে তার কতকগুলো সামাজিক চাহিদাও রয়েছে।

মানুষের কতকগুলো বুদ্ধিগত চাহিদাও রয়েছে, যেমন মানুষ নূতন কিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়, সংগঠন করতে ও বিচার করতে চায়, সর্বোপরি মানুষ মননশীল হতে চায়।

বয়স ও চাহিদা :—

সকল চাহিদা ও চাহিদাজনিত কর্মপ্রেষণা সব বয়সে একপ্রকার থাকে না। কোন্ চাহিদা কোন্ বয়সে কতটা তীক্ষ্ণ ও কার্য্যকরী থাকে, তা দেখার জন্যে স্ট্যান্‌ফোর্ড প্রমুখ মনোবিদ্‌দের বিশেষ গবেষণা এ বিষয়ে নূতন দিকের সন্ধান দিয়েছে।

যত্নলাভ ও রক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা পাঁচ ছয় বৎসরে যেরূপ প্রবল থাকে, তেরো চৌদ্দ বৎসরে এ চাহিদা ততটা প্রবল থাকে না, এ সময়ে এ চাহিদা অনেক পরিমাণে কমে যায়। নূতন কিছু জানার ইচ্ছা এ সময়ে অপেক্ষাকৃত কমে গেলেও, কোন ঘটনা কেন হয়, এর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের ইচ্ছা বেড়ে যায়। বন্ধু লাভের ইচ্ছা সব বয়সেই কম বেশী সমান থাকে। স্বাধীনতার চাহিদা, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার চাহিদা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে।

চাহিদা ও কর্মপ্রেষণা :—

এই প্রেষণাগুলো যত শক্তিশালী হতে থাকে, তত ব্যক্তির ভিতরে ভিতরে উত্তেজনার (tension) সৃষ্টি করে এবং এই উত্তেজনা যখন এমন একটা অস্বস্তিকর পর্য্যায়ে পৌছে যে এ প্রেষণা শক্তিকে কার্য্যের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত না করলে, দেহে ও মনে সাম্যভাব ফিরে আসে না। কোন শিশু পিতামাতার একান্ত মনোযোগ ও ভালবাসার পাত্র হয়ে যদি দেখে যে, তার নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্নীর দিকে বাবা মা'র মনোযোগ ও ভালবাসা সরে গেছে, তা'হলে সে একটা অস্বস্তি বোধ করে—তার মানসিক এই চাহিদাটি নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে, সে তার হৃত ভালবাসাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ও পিতামাতার মনোযোগকে আকৃষ্ট করার জন্য নানারূপ প্রয়াস করতে থাকে। যদি তার প্রয়াস তাকে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দেয়, তা'হলে তার অস্বস্তি ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

জীবনে সব ইচ্ছা পূরণ হয় না। সব চাহিদা সমানভাবে মেটে না, চাওয়ার সাথে সাথেই সব কিছু পাওয়া যায় না। কাজেই অস্বস্তি ও উত্তেজনা প্রশমিত

হওয়ার চেয়ে ক্রমে তা বেড়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অস্বস্তি থাকে ব্যক্তি আবেগ প্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে। তার অহংসত্তা সন্তুষ্টি চায়, কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতা এই সন্তুষ্টি প্রাপণে বাধা দেয়। যেমন, বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র তার সহপাঠীদের কাছ থেকে সামাজিক স্বীকৃতি পেতে চায়—কিন্তু এ চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব হচ্ছে না, তার পিতামাতার দারিদ্র্য ও সামাজিক স্থান, তার বড় ভাইয়ের বিদ্যালয়ে পরীক্ষার খারাপ ফল এবং নিজের অপুষ্ট দুর্বল দেহ তার সামাজিক স্বীকৃতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার এই চাহিদা দিনের পর দিন যতই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ততই তার ব্যর্থতা বোধ বেড়ে যাচ্ছে। অবশেষে সে অপরাধ প্রবণ ছেলেদের দলভুক্ত হয়ে নানাপ্রকারের দুষ্ক্রিয়া ও অপকর্মের মধ্যে সন্তুষ্টির ও আত্ম-স্বীকৃতির উপায় খুঁজে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন চাহিদা যদি স্বাভাবিক ও সুস্থ পথে পরিতৃপ্ত না হয় তা'হলে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক আচরণ ও বিকৃতি দেখা দেয়—মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। এমনি ভাবে দেখা যাবে যে, সে সময়ের যে চাহিদা তা যদি যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত না হয় তা'হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ধারায় ঘটে না, বিকৃতি ও বিচ্যুতি নানাভাবে দেখা দেয়।

মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য :—

চাহিদা
↓
অস্বস্তি
↓
কর্মপ্রেষণা
(**অনুকূল পরিবেশ**)
↓
পরিমিত পরিতৃপ্তি
↓
মানসিক স্বাস্থ্য
↓
সার্থক সঙ্গতি (Adjustment)

চাহিদা
↓
অস্বস্তি
↓
কর্মপ্রেষণা
(**প্রতিকূল পরিবেশ**)
↓
চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা
↓
দ্বন্দ্ব
↓
দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা
↓
মানসিক স্বাস্থ্যহানি
↓
অপসঙ্গতি (Maladjustment)
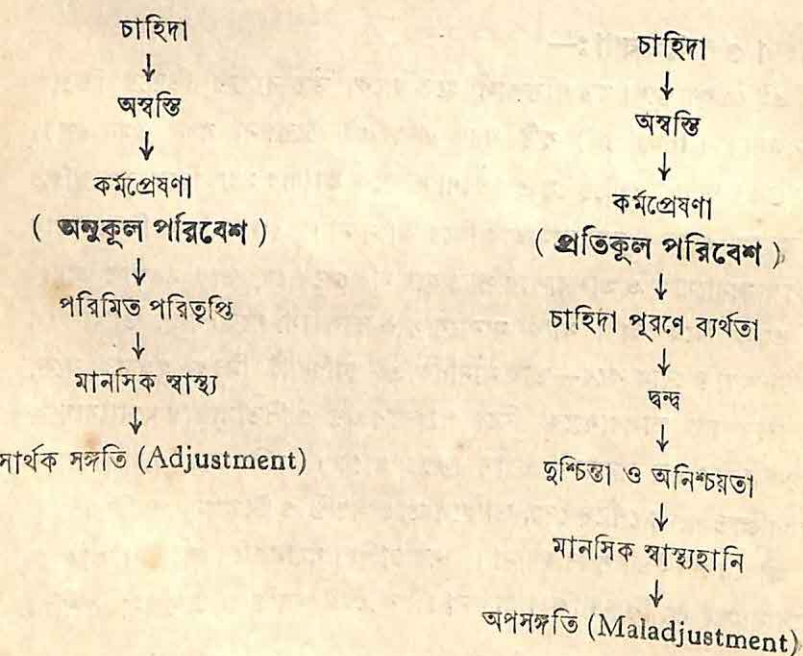
প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় এবং প্রত্যেকের মধ্যে আগে হোক পরে হোক, কোন না কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটে, যা এই ব্যর্থতাকে সহ্য করার ক্ষমতা দেয়। প্রতিযোজন বা সঙ্গতিসাধন বলতে যা বোঝায় তা মূলতঃ ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে গিয়ে প্রতিক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে এই ব্যর্থতাবশতঃ অস্বস্তিকর অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে বা সেই অবস্থার অস্বস্তিকে ছাপিয়ে যেতে চায়। সকল ব্যর্থতার মধ্যে যে অপ্রীতিকর মানসিকতা দেখা দেয়, তাকে দূর করার জন্য ব্যক্তি নানাভাবে সচেষ্ট হয়।

ব্যর্থতার মধ্যে একটা অসহায়ভাব, হতাশা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ভাব থাকে। কোন কর্মপ্রেষণা বাধাপ্রাপ্ত হলে মনের মধ্যে এই অপ্রীতিকর ভাব আসে। এইসব জটিল অনুভূতির সঙ্গে থাকে একটা অনিশ্চয়তা, যে অনিশ্চয়তা পরবর্তী পর্য্যায়ে কি করবে সে সম্পর্কে ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তোলে। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব সৃষ্টি হয়। তা'হলে দেখা যাচ্ছে কোন কর্মপ্রেষণায় প্রতিবন্ধ ব্যর্থতার সৃষ্টি করে, এই ব্যর্থতা নিয়ে আসে একটা উত্তেজনা বা অস্বস্তি—অস্বস্তি থেকে আসে অভিযোজন প্রয়াসী প্রতিক্রিয়া।

প্রায় সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উৎস মানবিক মৌলিক চাহিদা। ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা ও তার পরিতৃপ্তির মধ্যে সর্বদাই একটা ফাঁক থাকে। চাহিদা ও তার পরিতৃপ্তি অচ্ছেদ্য নয়। এই চাহিদার পরিতৃপ্তি যদি যথার্থ কর্মপ্রেষণার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘটে তাহলেই সার্থক সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয়। যদি এই চাহিদার পরিতৃপ্তির পথে বহির্জাত বা অন্তর্জাত কোন বাধা আসে তা'হলে ব্যক্তির স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধান বিঘ্নিত হয়—বিকৃতভাবে সঙ্গতিবিধানের একটা অপচেষ্টা (pseudo adjustive behaviour) শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রের মধ্যে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা দেখা যাচ্ছে। এই চাহিদা বিদ্যালয়ের পরিবেশের জন্য, যেমন কোন ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা এত বেশী যে শিক্ষকদের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না—পরীক্ষা প্রথা এত বিশৃঙ্খল যে, কোন ছাত্র যদি যথাসাধ্য পরিশ্রম ক'রে অধীত বিষয়ে ভাল পরীক্ষাও দেয়—পরীক্ষকের ক্রটির জন্য শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য বিচার হয় না, বা তার আত্ম-শক্তির স্বীকৃতির কোন সুযোগই ঘটে না; এমনও হতে পারে পারিবারিক আর্থিক অনটনের জন্য শিক্ষার্থীকে পড়া ছেড়ে দিতে হল—এই ভাবে বহির্জাত কারণের জন্য চাহিদার অতৃপ্তি ঘটতে পারে—আবার অন্তর্জাত কারণের যেমন শিক্ষার্থীর অসুস্থতা, যা তাকে অকেজো করে ফেলল, যার ফলে

পরিপূর্ণ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সে সাফল্য লাভ ও আত্মস্বীকৃতির চাহিদা পূরণ করতে পারল না। বহির্জাত কারণেই হোক বা অন্তর্জাত কারণেই হোক, মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি ঘটলে ব্যক্তি সঙ্গতিবিধানের জন্য নানারূপ অপচেষ্টা করবে। এই ভাবেই ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। যেমন শিক্ষার্থীটির ক্ষেত্রে, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা পরিতৃপ্ত না হলে, সে এমন সব অস্বাভাবিক আচরণ করবে যার দ্বারা অতৃপ্তিজনিত যে ক্ষোভ, তা প্রকাশ করবে সামাজিক প্রকল্পগুলো ভেঙ্গে ফেলে, সেগুলোকে অমান্য করে। এই অস্বাভাবিক উপায়ে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তোলার অপপ্রয়াস করবে। বিদ্যালয়ে মারধর করা, সহপাঠীদের বইপত্র চুরি করা, শিক্ষককে অপমানিত করা, গৃহ বা বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দেবে।

গৃহপরিবেশ, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য ঃ—

জন্মাবার পর শিশু তার মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য তার পিতামাতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে। খাদ্য, পরিধান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তার পিতামাতাই সংগ্রহ করে থাকে। এইসব দৈহিক চাহিদার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, এই সময়ে মানসিক চাহিদারও পরিপূরণ ঘটাতে হয়। খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুসম্ভার পরিবেশন করলেই শিশুর সব চাহিদা মেটানো হয় না—শিশুর প্রতি পিতামাতার আচরণ, প্রতিন্যাস, প্রযত্ন-পদ্ধতি ও শিশুর মানস-চাহিদা মিটিয়ে থাকে। মাতৃস্তন্য পান করে শিশু তার দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করে—কিন্তু মাতৃস্তন্য পানের সময় শিশু যদি মা'র ভালবাসাভরা উজ্জ্বল মুখখানি দেখতে না পায় তা'হলে শিশুর মন ভরে না। মা যদি খাদ্যদানে ও অন্যবিধ আচার-আচরণে শিশুকে সর্বদা প্রত্যাখানের ভাব দেখায়—যদি মাতাপিতা শিশুর মৌলিক চাহিদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে বা অস্বাভাবিক রূপে যত্ন পরায়ন হন, তা'হলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ ধারায় হয় না। মোটের উপর শৈশবকালে দৈহিক চাহিদার পরিপূরণের সাথে সাথে মানসিক চাহিদা যেমন নিরাপত্তাবোধ, পিতামাতার সুষম ভালবাসা, আত্মস্বীকৃতি প্রভৃতি মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য পিতামাতার ব্যক্তিত্ব, তাদের প্রযত্ন-প্রয়াস, আচার আচরণ বহুল পরিমাণে দায়ী।

এ ছাড়া মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি সমাজ স্বীকৃত পথে হওয়া সমীচীন।

সমাজ স্বীকৃত পথে মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিশুর শিক্ষা প্রয়োজন —এই শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পিতামাতার। শিশুর মৌলিক চাহিদাজনিত যে কর্মপ্রেষণা তাকে আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক পথে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব গৃহে পিতামাতার, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের। এদিক থেকে সামগ্রিকভাবে গৃহ ও বিদ্যালয়ের পারিবেশিক প্রভাব বহুল পরিমাণে কাজ করে।

ক্ষুধা পেলে কোন নির্দিষ্ট উপায়ে নবজাত শিশু খাদ্যের সন্ধান করে না। ক্ষুধারূপ অন্তর্জাত উদ্দীপকের জন্য কোন নির্দিষ্ট ধারায় সাড়া দেয় না। ক্ষুধার্ত শিশু সর্বতোভাবে কর্মপ্রবণ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তখনও সে বিশেষ কোন ধারায় সঙ্গতি বিধান করতে শেখে নি। অর্থাৎ ক্ষুধা পেলে শিশু কাঁদে, হাতপা ছোড়ে, কোন অবস্থায় শিশু যদি নিজেকে নিরাপদবোধ না করে তাহলেও এ রকম করে থাকে অর্থাৎ কাঁদে, হাত-পা ছোড়ে ইত্যাদি। মোটের উপর শৈশবে মৌলিক চাহিদাজনিত যে কর্মপ্রয়াস তার সবগুলির প্রকৃতিই প্রায় একপ্রকার। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উপায় সুশৃঙ্খল ও সামাজিক হয়। মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি শিশু কি ভাবে করবে তার শিক্ষা পিতামাতা দেবে। খাদ্যের চাহিদাকে সামাজিক অনুশাসনের পটভূমিতে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শিশু কি খাবে, কতটুকু খাবে, কখন খাবে এইসব বিষয়ে শিশু ধীরে ধীরে শিখবে ও পিতামাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে অভ্যস্ত হবে। এ ছাড়া শিশুটিরও যে গৃহে ও পরিবারে একটা যথাযোগ্য স্থান আছে, এই বোধ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য পিতামাতার আচার-আচরণ এমন হবে যাতে শিশু সর্বদা অনুভব করে যে, এ গৃহ তার ও এ গৃহের কল্যাণ তার কল্যাণ— এই বোধকে তীক্ষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর করার জন্য পিতামাতা শিশুকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গৃহ-কাজ করতে দিতে পারেন, যা সম্পাদন করে শিশু গৃহের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করতে পারে। এর দ্বারা আত্মস্বীকৃতি, নিরাপত্তাবোধ ও পিতামাতার নিকট থেকে স্নেহ ভালবাসা পাওয়ার চাহিদা পরিতৃপ্ত হতে পারে।

বিদ্যালয়, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য :—

সকল চাহিদার পরিতৃপ্তি গৃহ-পরিবেশে হওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয় পরিবেশে অনেক মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে, বস্তুতঃ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ও যথার্থ সমাজীকরণের জন্য বিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম।

দৈহিক চাহিদা প্রসূত যে সব প্রেষণা তাই কেবল শিশুকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে না। আপন অস্তিত্বকে সুস্থভাবে বজায় রাখার জন্য যে সব কর্মপ্রেষণা তা ছাড়াও সামাজিক কর্মপ্রেষণা আছে। বিদ্যালয়ে এই সব সামাজিক কর্ম-প্রেষণাকে যথার্থভাবে পরিতৃপ্ত করতে হয় এবং এইসব সামাজিক কর্মপ্রেষণাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষার্থীদের সুস্থ সমাজ-জীবনযাপনে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশ ও কর্মধারা এমনভাবে রচনা করতে হবে যে, শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদাগুলির সম্যক পরিতৃপ্তিতে কোন বাধা না আসে। শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে সচেতন হতে হবে—

(ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একদিকে এককভাবে ও অন্যদিকে গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশেষ স্থান পর্যাবেক্ষণ করে, তার মৌলিক চাহিদা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং তার চাহিদাজনিত কর্মপ্রেষণাগুলিকে সুস্থ ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(খ) এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপিত হবে যাতে, প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারবে যে, বিদ্যালয়ে তার একটি যথার্থ স্থান রয়েছে—মোটের উপর শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা ও আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথার্থভাবে পূরিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

(গ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহৃদয় হতে হবে—শিক্ষার্থী যেন এর মধ্য দিয়ে তার ভালবাসার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে। শিক্ষার্থী শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে, শিক্ষকও শিক্ষার্থীকে যথাযথ মর্য্যাদা দিয়ে চলবে—যাতে শিক্ষার্থীর আত্মসম্মানবোধের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়।

(ঘ) শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্বন্ধও যাতে বন্ধুত্বপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরস্পর মিলেমিশে বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর ও সুখী সমাজ সৃষ্টি করতে পারে, যার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের চাহিদা তৃপ্ত হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

(ঙ) খেলাধুলা, শিক্ষা-ভ্রমণ, শিক্ষা-প্রদর্শনী ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্য্যক্রমের প্রবর্তন করতে হবে—এর মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব লাভের চাহিদা, কোন নেতৃত্বকে মেনে চলার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত হতে পারে। এছাড়া খেলাধুলা, সংগঠনমূলক কাজ, সঙ্গীত, সাহিত্য-চর্চা, অভিনয়, অঙ্কন, বক্তৃতা প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমিক কাজে উৎকর্ষ দেখিয়ে

শিক্ষার্থী আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা, আত্ম-প্রকাশের চাহিদা, নূতনকে জানার চাহিদাও পরিতৃপ্ত করতে পারে।

(চ) বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার চাহিদা যেন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখাত না হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের কল্যাণকর ছোট ছোট কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলে শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দিলে, শিক্ষার্থী সে স্বাধীনতার অপচয় করে না ; কঠোর শাসন, নিরত আরোপিত নির্দেশদান,—শিক্ষার্থীর প্রতি কার্য্যে ও চিন্তা প্রবাহে বাধাদান শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার চাহিদাকে অপরিতৃপ্ত রাখে—ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়, সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(ছ) পাঠক্রম হবে বয়স উপযোগী, প্রত্যেক বয়সের যে চাহিদা তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন পাঠক্রম নির্দ্ধারণ করতে হবে। মৌলিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং বয়ঃক্রম অনুসারে চাহিদার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম ও সহপাঠক্রম নির্দ্ধারিত হতে হবে।

(জ) শিক্ষণ পদ্ধতি বয়ঃক্রমানুসারী হবে—বিদ্যালয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হবে যাতে শিক্ষক উপর থেকে তথ্যভার চাপিয়ে না দেন—শিক্ষার্থী যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় হবার সুযোগ পাবে—আপন চিন্তা শক্তিকে ব্যবহার করার, নিজে নিজে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করবে। সমস্ত পাঠন পদ্ধতি একটা লক্ষ্যে বিধৃত থাকবে। মোটের উপর, বিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হবে, যাতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করা ও নূতনকে জানার চাহিদা, একটা বিশেষ লক্ষ্য সম্মুখে রেখে কাজ করার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে।

(ঝ) শিশুর মধ্যে সাফল্য লাভের চাহিদা, কর্তৃত্ব করার চাহিদা জনিত যে কর্ম্মপ্রেষণা তাকে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব, পাঠবিষয়ে অধিকতর সাফল্যের প্রয়াস, সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমে যোগদানের ঐকান্তিক আগ্রহ, সদভ্যাস অর্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বলাভের চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সাফল্যলাভের চাহিদাজনিত যে কর্মপ্রেষণা—তাকে শিক্ষক শিক্ষা কাজে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে পারেন।

(ঞ) নবযুবকালে স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মসম্মানের চাহিদা, আত্ম-

স্বীকৃতির চাহিদা, সমাজ জীবনের চাহিদা, যৌন তৃপ্তির চাহিদা তীক্ষ্ণভাবে দেখা দেয়। শিক্ষকদিগকে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আচরণ করতে হয়—তাদের উপর কিছু জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে তাদের স্বাধীন যুক্তিধর্ম্মী চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের স্বেচ্ছায় কোন কিছু গ্রহণ বর্জন করায় শিক্ষকগণ সাহায্য করবেন; সমাজ জীবনে চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য এই সময়ে বিদ্যালয়ে দলগত ও সংগঠনমূলক নানারূপ কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন করবেন। শিক্ষা-ভ্রমণ, সমাজসেবামূলক কর্মানুষ্ঠান, বিদ্যালয়ে শিল্প প্রদর্শনী, শিক্ষা মূলক বিভিন্ন যৌথ আলোচনা-চক্র, প্রাচীর পত্র পরিচালনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের চাহিদা অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হতে পারে। যৌন-চাহিদাকে এইসময়ে শিক্ষিত ও মার্জিত করে তুলতে হয়। শিল্প-চর্চ্চা, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত, বিভিন্ন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, উপন্যাস পাঠ, ভাল গল্প ও কবিতা পাঠ ও সমাজ উন্নয়ন-মূলক ছোট ছোট কাজ যৌন-শক্তির উদ্‌গতিতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

1. Write an essay on the basic needs of Children .

2. How does the fulfilment of the basic needs bring in mental health in the school-going children ?

3. Explain the phenomenon of motivation in the context of human basic needs .

4. Discuss the role of the home & the school in the fulfilment of the basic needs of the children for their healthy personality development.

5. How can you ensure true education making provisions for fulfilment of the basic needs of the children ?

6. What is a basic need ? Why is it called 'basic' need ? How does it influence human behaviour ? How is it related to the Mental health of an individual ?

7. Delineate the causes of maladjustment with special reference to the concept of 'Basic need'.

সপ্তম অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা ও শিক্ষা

(Mental Hygiene and Education)

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও সঙ্গতি সাধন :—

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার তিনটি উদ্দেশ্য—মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মানসিক বৈকল্য প্রতিরোধ এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময় ও তাদের পুনর্বাসন। এই তিনটি উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে হলে মানব প্রকৃতি, বিশেষ করে তার সহজাত চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। কেবল মাতাপিতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারণের ধারণা ও সচেতনতা থাকলেই চলবে না—তরুণদের জীবনধারণ ও জীবনে সংগতি সাধন কিভাবে সুষ্ঠু ও যথার্থ করা যায় সেদিকেও এঁদের মনোযোগ দিতে হবে।

একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচার-আচরণ, তার বংশানুধারায় প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও শক্তি নিচয়ের উপর বিভিন্ন পারিবেশিক প্রভাবের ফল। একটি শিশুর জীবন ও সমাজে সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতা তার জন্মগত শক্তি ও প্রবণতা এবং এই সব শক্তির বিকাশকালে শিশুটি কি প্রকার পারিবেশিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে যাবে তার উপর নির্ভর করবে। এই পারিবেশিক প্রভাব সুস্থ ধারায় হবে কি অসুস্থ ধারায় হবে তা নির্ভর করে পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উপর। বয়স্ক ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে, শিশুর ব্যক্তিত্বের যে ক্রমবিকাশ, সেইটিই হল তার শিক্ষাগত পরিবর্তন।

শিক্ষা ও সঙ্গতিসাধন :—

শিক্ষণ (learning) ও শিক্ষা (Education) পূর্বে একই অর্থে ব্যবহার করা হত। শিক্ষণ বলতে বুঝায় একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা আরও ব্যপক। সমস্ত জীবন ধরেই শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন আর তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হওয়া নয়। সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমস্ত দৈহিক ও মানস শক্তির সম্পূর্ণ ও সুষম বিকাশ অর্থাৎ সুষম ব্যক্তিত্ববিকাশ ও তার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের সঙ্গে

স্বীকৃতির চাহিদা, সমাজ জীবনের চাহিদা, যৌন তৃপ্তির চাহিদা তীক্ষ্ণভাবে দেখা দেয়। শিক্ষকদিগকে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আচরণ করতে হয়—তাদের উপর কিছু জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে তাদের স্বাধীন যুক্তিধর্মী চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের স্বেচ্ছায় কোন কিছু গ্রহণ বর্জন করায় শিক্ষকগণ সাহায্য করবেন; সমাজ জীবনে চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য এই সময়ে বিদ্যালয়ে দলগত ও সংগঠনমূলক নানারূপ কর্ম-কাণ্ডের প্রবর্তন করবেন। শিক্ষা-ভ্রমণ, সমাজসেবামূলক কর্মানুষ্ঠান, বিদ্যালয়ে শিল্প প্রদর্শনী, শিক্ষা মূলক বিভিন্ন যৌথ আলোচনা-চক্র, প্রাচীর পত্র পরিচালনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের চাহিদা অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হতে পারে। যৌন-চাহিদাকে এইসময়ে শিক্ষিত ও মার্জিত করে তুলতে হয়। শিল্প-চর্চ্চা, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত, বিভিন্ন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, উপন্যাস পাঠ, ভাল গল্প ও কবিতা পাঠ ও সমাজ উন্নয়ন-মূলক ছোট ছোট কাজ যৌন-শক্তির উদ্গতিতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

1. Write an essay on the basic needs of Children .

2. How does the fulfilment of the basic needs bring in mental health in the school-going children ?

3. Explain the phenomenon of motivation in the context of human basic needs .

4. Discuss the role of the home & the school in the fulfilment of the basic needs of the children for their healthy personality development.

5. How can you ensure true education making provisions for fulfilment of the basic needs of the children ?

6. What is a basic need ? Why is it called 'basic' need ? How does it influence human behaviour ? How is it related to the Mental health of an individual ?

7. Delineate the causes of maladjustment with special reference to the concept of 'Basic need'.

সপ্তম অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা ও শিক্ষা

(Mental Hygiene and Education)

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও সঙ্গতি সাধন :—

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার তিনটি উদ্দেশ্য—মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মানসিক বৈকল্য প্রতিরোধ এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময় ও তাদের পুনর্বাসন। এই তিনটি উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে হলে মানব প্রকৃতি, বিশেষ করে তার সহজাত চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। কেবল মাতাপিতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারণের ধারণা ও সচেতনতা থাকলেই চলবে না—তরুণদের জীবনধারণ ও জীবনে সংগতি সাধন কিভাবে সুষ্ঠু ও যথার্থ করা যায় সেদিকেও এঁদের মনোযোগ দিতে হবে।

একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচার-আচরণ, তার বংশানুধারায় প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও শক্তি নিচয়ের উপর বিভিন্ন পারিবেশিক প্রভাবের ফল। একটি শিশুর জীবন ও সমাজে সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতা তার জন্মগত শক্তি ও প্রবণতা এবং এই সব শক্তির বিকাশকালে শিশুটি কি প্রকার পারিবেশিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে যাবে তার উপর নির্ভর করবে। এই পারিবেশিক প্রভাব সুস্থ ধারায় হবে কি অসুস্থ ধারায় হবে তা নির্ভর করে পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উপর। বয়স্ক ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে, শিশুর ব্যক্তিত্বের যে ক্রমবিকাশ, সেইটিই হল তার শিক্ষাগত পরিবর্তন।

শিক্ষা ও সঙ্গতিসাধন :—

শিক্ষণ (learning) ও শিক্ষা (Education) পূর্বে একই অর্থে ব্যবহার করা হত। শিক্ষণ বলতে বুঝায় একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা আরও ব্যপক। সমস্ত জীবন ধরেই শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন আর তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হওয়া নয়। সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমস্ত দৈহিক ও মানস শক্তির সম্পূর্ণ ও সুষম বিকাশ অর্থাৎ সুষম ব্যক্তিত্ববিকাশ ও তার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের সঙ্গে

সার্থক সঙ্গতি সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। 'শিক্ষা জিনিসটা জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে।' তথ্যকে জীবনে অঙ্গীকৃত না করলে শিক্ষা হয় না। শিক্ষণের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ হয় কিন্তু শিক্ষা হয় না। তথ্যকে অঙ্গীকৃত করার জন্য স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে যেমন পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করা ও তাকে দেহের সঙ্গে অঙ্গীকৃত করা সুকঠিন, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির পক্ষেও তথ্যকে জীবনে অঙ্গীকৃত করা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ শিক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। আবার মানসিক স্বাস্থ্য যা সুষম ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস, তার জন্যেও শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা ভিন্ন সুষম ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। সার্থক সঙ্গতি সাধনের মধ্য দিয়ে সুষম ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দেখা যায় পরিবারে ও সমাজে। মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিফলনও দেখা যায় সার্থক সমাজ সঙ্গতির মধ্যে। অতএব শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। এদিক থেকে শিক্ষাকে অর্থাৎ সমগ্র শিক্ষাধারাকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বর্তমানে শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্গতি সাধনের একটি অবিরাম প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বেশীর ভাগই পরোক্ষভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিপাক (maturation) ও পারিবেশিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত ও উদ্দীপ্ত হওয়ার ফল। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই একটা বিশেষ সময় আসে যখন শিক্ষাকে কেবলমাত্র এইসব পরোক্ষ পারিবেশিক প্রভাব ও উদ্দীপকের উপর ফেলে রাখা চলে না। একটা সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ধারার প্রয়োজনীয়তা থাকে যা শিশু বিদ্যালয় জীবনে পায়। এই প্রত্যক্ষ শিক্ষাধারা যত সুনিয়ন্ত্রিত হবে, যত একদিকে ব্যক্তির প্রকৃতি ও শক্তির ও অন্যদিকে সামাজিক চাহিদার পটভূমিতে প্রণীত ও প্রযোজিত হবে ততই স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষা হবে। এই সঙ্গে ব্যক্তির উপর পরোক্ষ যেসব পারিবেশিক প্রভাব (গৃহ-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ) সেগুলোও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা না হলে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন সম্ভব নয়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ সুস্থব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য যে শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হবে তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া সমীচীন।

শিক্ষার্থীকে সম্যকরূপে প্রণিধান করা :—

শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে, তার চাহিদা (needs), প্রকৃতি, সামর্থ্য, প্রেষণা, প্রতিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক প্রণিধান প্রয়োজন। এর ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষাগত কার্যক্রম রচিত ও রূপায়িত হওয়া সমীচীন। প্রত্যেক শিক্ষকের এটা একটা অবশ্য কর্ত্তব্য যে তিনি শিক্ষার্থীর মানস প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের সব দিকের সাথে পরিচিত হবেন এবং তার শিক্ষাধারাকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন।

শিক্ষার্থীকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্যকরূপে প্রণিধান করতে হলে মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি সম্বন্ধে জানতে হবে।

মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি :—

(ক) **ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য**—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য সুনিশ্চিত রূপে বর্তমান। দু'জন ব্যক্তি কখনই সম্পূর্ণরূপে এক প্রকারের হয় না। দৈহিক দিক থেকে যেমন এই পার্থক্য দেখা যায়, মানসিক দিক থেকেও (যেমন বুদ্ধি, সামর্থ্য, আবেগকে সংযত করার ক্ষমতা, রুচি, প্রতিন্যাস প্রভৃতি দিক থেকে) এই পার্থক্য রয়েছে।

এ সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। তার বিশেষ প্রকৃতির একটা শারীরিক গঠন আছে, তার শৈশবকালীন ব্যবহারের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ধীরে ধীরে পরিপক্বতার (maturation) সঙ্গে সঙ্গে, তার মধ্যে কতকগুলি শক্তি ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে এবং গোষ্ঠীজীবন যাপনে সহায়তা করে। **শিশুর পরবর্তীকালের বিকাশধারা নির্ধারিত হয় তার (ক) সহজাতশক্তি ; (খ) পরিপক্কতার ধারা ও (গ) পারিবেশিক প্রভাবের দ্বারা।**

পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রবেশ বয়স ছয় ধরা হয়েছিল এবং এও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ছয় বৎসরের সব ছেলেই বিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভের জন্য সমানভাবে প্রস্তুত। সময়গত বয়সকেই তখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভের মাপকাঠি মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ধারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং শিক্ষার্থীর গুন-বৈশিষ্ট্যগুলির উৎকর্ষ

সাধন ও ব্যক্তিত্বের অনভিপ্রেত সংলক্ষণগুলির দূরীকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে যথার্থরূপে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে।

প্রত্যেকটি শিক্ষকের কর্ত্তব্য (ক) সেইসব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা যা সকল ব্যক্তির মধ্যেই বর্ত্তমান, (খ) বিশেষ বিশেষ গুণাগুণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কতটা পার্থক্য বর্তমান তার সম্বন্ধে ধারণা করা, (গ) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ নির্ণয়।

এইসব বিষয়ের সম্যক বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করে যদি শিক্ষা-সূচী রচিত হয় এবং যথাযথভাবে তার প্রয়োগ করা যায় তা হলেই সে শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তি ভবিষ্যতে নিজ অনুশীলনে আরও শিক্ষিত হতে পারে ও আত্মকল্যাণকারী ও সমাজকল্যাণকারী লক্ষ্যে পৌছতে পারে।

(খ) **পরিপাকের (maturation) প্রভাব**—বংশগত গুণাগুণ পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকাশলাভ করতে থাকে। এর ফলে ব্যক্তিকে কতকগুলি বিকাশ-পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় যেমন প্রথম শৈশবকাল, ধীরে ধীরে বাল্যাবস্থা, প্রাক বয়ঃসন্ধিকাল, বয়ঃসন্ধিকাল, যুবাবস্থা প্রভৃতি। প্রত্যেকটি পর্য্যায়েই দৈহিক, শরীরবৃত্তগত এবং আচরণগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—এই বিকাশ-পর্য্যায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম ও পাঠপদ্ধতির পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য্য।

প্রত্যেকটি শিশুই, পরিমাণে যাই হোক, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি সাধনের সুপ্ত শক্তি নিয়ে জন্মায়। এই শক্তি নবজাত শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের মধ্যে নিহিত থাকে। তার স্নায়ুতন্ত্রের নমনীয়তা ও তীক্ষ্ণ সংবেদন-শক্তি তাকে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষালাভের ক্ষমতা দিয়ে থাকে। পরিপাক ক্রিয়ার ফলে এই স্নায়ুতন্ত্রের যত বিকাশ ঘটতে থাকে—শিক্ষালাভের ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পায়। এই পরিপাক ক্রিয়া আবার দৈহিক স্বাস্থ্য ও পারিবেশিক প্রভাবের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই শিক্ষাধারাকে স্বাস্থ্যকর করতে হলে ব্যক্তির দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্নবান হতে হবে ও পরিবেশ যাতে সুস্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(গ) **পারিবেশিক প্রভাব**—যে পরিবেশে ব্যক্তি বাস করে ও বড় হয় সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিবেশ। দুজন ব্যক্তি আপাত দৃষ্টিতে একই পরিবেশের মধ্যে থাকলেও—মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দুজনের পরিবেশ ভিন্ন।

ভৌতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ এক নয়। ভৌগোলিক, জলবায়ুগত, খাদ্য, পোষাক এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুর সান্নিধ্য কোন গোষ্ঠীতে প্রায় একই প্রকার থাকে। কিন্তু এই আপাত একই প্রকারের পরিবেশ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটায় ও প্রতিভাত হয়। একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র পড়তে আসে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সকলের নিকট একই প্রকারের। কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই পরিবেশে কোন ছেলের মধ্যে সার্থক বিকাশ হচ্ছে, পাঠ বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে ও বিদ্যালয়ে যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা করে চলছে আবার অনেক ছেলের মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। এই অপসঙ্গতির কারণ গৃহপরিবেশের মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে—গৃহপরিবেশ যদি ভৌতিক (physically) দিক থেকে একই প্রকারের হয় বিদ্যালয় পরিবেশও যদি এক প্রকারের হয় তা হলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিদ্যালয়ে পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত শক্তি ও পারিবেশিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশ একজন ব্যক্তিকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করবে ও যেভাবে ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হবে, অপর ব্যক্তির বেলায় ঠিক সেরূপটি হবে না। এই দিক থেকে পরিবেশটি একান্তভাবে ব্যক্তির নিজস্ব ও তার সাথে সার্থক সঙ্গতি কিংবা অপসঙ্গতি সেটাও সম্পূর্ণ তার নিজস্ব।

ব্যক্তি যদি অনেক উন্নতমানের গুণাগুণ নিয়ে জন্মায় এবং উন্নত পরিবেশের প্রভাবের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটে, তা হলে তার জীবনও তত উন্নত ও পূর্ণ হবে। কোন ব্যক্তির বংশগত গুণাগুণ যদি উন্নতমানের থাকে তাহলে অনুন্নত পরিবেশের মধ্যে থেকেও বংশগত গুণাগুণ যার মধ্যে কম অথচ উন্নত পরিবেশের মধ্যে মানুষ, তার থেকে অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে শিক্ষিত হতে ও সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে। এ দুটি অবস্থার (বংশগত গুণাগুণ ও পারিবেশিক অবস্থা) যে কোন একটি যদি অধিক উন্নত ও শক্তিশালী থাকে, তাহলে সঙ্গতি রক্ষা কিছুটা সার্থক ও কার্যকরী হবে, কিন্তু যদি বংশগত গুণাগুণ ও পরিবেশ উভয়ই অনুন্নত ও দুর্বল হয় তাহলে শিক্ষা ও সঙ্গতি অত্যন্ত দোষদুষ্ট ও দুর্বল থেকে যাবে।

বংশগত গুণাগুণকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমাদের সীমিত। সমাজের সকলেই সুজাত হবে এ বিষয়ে সামাজিক প্রয়াস অত্যন্ত ক্ষীণ। গত পঞ্চাশ বৎসরে, যদিও যৌন-শিক্ষা, সমাজ স্বাস্থ্য, ঔষধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের

মাধ্যমে এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রগতি করার চেষ্টা চলছে, তবু বংশগতিকে নিয়ন্ত্রণ এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। পারিবেশিক প্রভাবকে উন্নত ও স্বাস্থ্যকর করার দায়িত্ব আমাদের এবং এ বিষয়ে তৎপর হলে আমরা যথেষ্ট ফলপ্রসূ উপায় অবলম্বন করতে পারি। শিশুদের জন্য উন্নত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার দায়িত্ব যদিও বিভিন্ন সংস্থা, যেমন গৃহ, বিদ্যালয়, সমাজ-সংস্থা প্রভৃতির আছে, তবু বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে দায়িত্ব সমধিক। বংশগত গুণাগুণ যেরূপ নিয়েই একজন জন্মাক, তার জন্য এমন সুপরিকল্পিত শিক্ষাধারার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহের সম্পূর্ণ ও সুষম বিকাশ ঘটে এবং তার সম্ভাব্য সমাজীকরণ হয়।

মৌলিক চাহিদা ঃ—

(ক) **দৈহিক চাহিদা**—খাদ্য, আশ্রয়, বস্ত্র ও আচ্ছাদন (দৈহিক চাহিদা) দেহ রক্ষা ও পুষ্টির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। যতদিন পর্য্যন্ত শিশু এইসব চাহিদা পরিপূরণের জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকে ততদিন তাদের একটা প্রধান কর্তব্য শিশুদের চাহিদা পূরণ করা, সঙ্গে সঙ্গে এইসব শিশুরা বড় হয়ে যাতে নিজেরাই আপন প্রচেষ্টায় এইসব চাহিদা মেটাতে পারে তার জন্য এদের আত্ম-নির্ভরশীল ও শিক্ষিত করে তোলা।

শিশুর খাদ্য তালিকা এবং তার খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যকর হতে হবে। তার পোষাক পরিচ্ছদও যথাযথ হতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তার খাদ্যাভ্যাস কি প্রকার হবে, কি কি ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ পরবে, তার গৃহব্যবস্থা কি প্রকারের হবে সবই অনেকাংশে তার শৈশবাস্থায় জীবন-ধারণের ধরনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কাজেই এই সময় পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।

(খ) **সামাজিক চাহিদা**—দৈহিক চাহিদার পূরণের সাথে সাথে সামাজিক চাহিদাগুলির সম্যক পরিতৃপ্তি বাঞ্ছনীয়। জন্ম-ক্ষণ থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্যক্তি নিয়ত তার চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করছে—এই চাহিদা সম্পূর্ণ আত্মগত ও দৈহিক চাহিদা থেকে সামাজিক ও আত্মিক পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। দৈহিক চাহিদার যদি যথাযথ পূরণ না ঘটে তা হলে শিশুর মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এর প্রকাশ রাগ ও ভয়ের

আকারে দেখা দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দৈহিক চাহিদার পূরণের সাথে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যই নয়, মানসিক ভারসাম্যও নির্ভর করে অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যও নির্ভর করে।

ব্যক্তির কর্মপ্রেষণার (motivation) পিছনে ব্যথা বেদনা, ক্ষুধা ও অন্যান্য দৈহিক অসমতা ও অসুবিধা দূরীকরণের প্রয়াস থাকে। হতাশা, ব্যর্থতা, দুশ্চিন্তা, একঘেয়েমি এসব থেকে ব্যক্তি সর্বদা দূরে থাকতে চায়। ফলে মানবিক আচরণ ও কর্ম প্রয়াস সর্বদাই কোন কিছু অর্জন করা, নূতন কিছুকে জানা, সাফল্য লাভ, নিরাপত্তা, স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়।

শিক্ষকদের একটা প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য যে তাঁরা মানবিক মৌলিক কর্মপ্রেষণা সম্বন্ধে জানবেন এবং এইসব কর্মপ্রেষণা আত্ম ও সমাজকল্যাণকারী কর্মে নিয়ন্ত্রিত করবেন। যেমন প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোন-না-কোন দিকে সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা কাজ করে। এই ইচ্ছাকে শিশুর সামর্থ্যানুযায়ী বিদ্যালয়ের পড়শুনায় সাফল্য অর্জন, খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে স্বীকৃতি ও সাফল্যলাভের ইচ্ছায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। শিক্ষককে এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। শিশু যে পরিবারে, গৃহে ও সমাজ-গোষ্ঠীতে গৃহীত ও স্বীকৃত, এটা জানার জন্য সে অধীর ভাবে উৎসুক থাকে। এই পারিবারিক ও সমাজ স্বীকৃতি সুস্থব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। পিতা-মাতা এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাঁদের যত্নাধীনে যেসব শিশু আছে তাদের যেন দৈহিক, সামাজিক ও আর্থিক চাহিদার পূরণ ঘটে ও এ সব বিষয়ে তারা নিরাপদ বোধ করে। শিক্ষার্থীর পাঠক্রম ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম তার মৌলিক চাহিদা ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী করতে হবে। এ ছাড়া সর্বাপেক্ষা উপযোগী কর্ম-সংস্থান শিক্ষার্থীর জন্য করতে হবে (vocational guidance) এবং সেই কর্মে যথাযথ যোগ্যতা লাভের জন্য তাকে শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে।

শিশুর মধ্যে নূতনকে জানার যে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা আছে তাকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে। নূতন দৃশ্য, নূতন শব্দ, বিদ্যালয় কর্মসূচীতে মাঝে মাঝে হৃদয়-গ্রাহী-পরিবর্তন শিশুর কর্মোৎসাহকে বৃদ্ধি করে ও পাঠ বিষয় ও শিক্ষা-পর্বকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ও শিক্ষাকে যথার্থ করার জন্য শিশুর মধ্যে গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ সম্পর্কে একটা নিরাপত্তা বোধের সৃষ্টি করতে হবে।

এই সব মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তির উপর শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ নানাভাবে বিঘ্নিত হয় যদি এইসব মৌলিক চাহিদার পূরণ না ঘটে। এদের অভাবে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুর মানস-শক্তির অপচয় ঘটায় ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে।

পরিবার ও সমাজ-পরিবেশের প্রভাব ঃ—

ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই সমাজ পরিবেশের প্রভাব মুক্ত হতে পারে না ও কোন ব্যক্তি সমাজে সার্থক ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারবে কিনা তা অনেকাংশে এই সমাজ-প্রভাব নির্ধারণ করে। সমাজ পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূলও হতে পারে, আবার প্রতিকূলও হতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে নানারূপ প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে।

শৈশবকালে গৃহ-পরিবেশে যে দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-ধারণ প্রথা ও অভ্যাস বর্তমান থাকে তার দ্বারা শিশু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। শিশু যত বড় হতে থাকে, গৃহপরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, গোষ্ঠী, বিভিন্ন সমাজ সংস্থা, পত্রিকা, বেতার, চলচ্চিত্র, প্রভৃতির দ্বারাও প্রভাবিত হতে থাকে। শিশুর ব্যক্তিত্বগঠন ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা অসুস্থতা এই সকল পারিবেশিক শক্তির দ্বারা বহুল পরিমাণে স্থিরীকৃত হয়। বয়ঃ-সন্ধিকালে ও বয়ঃ প্রাপ্তিকালে পরিচয়-পরিসর আরও বৃহত্তর পটভূমিকায় বিস্তৃত হয়—বয়ঃসন্ধিকালে যৌনচেতনার উন্মেষ হয়, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ভাবাদর্শ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। কোন বিকাশ পর্যায়ে যদি এই সব পারিবেশিক প্রভাবের মধ্যে কোন বিচ্যুতি বা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তা হলে তার পরবর্তী বিকাশ পর্যায়েও এর প্রতিক্রিয়া ঘটে ও ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুষমতা ও সুস্থতা বিপর্য্যস্ত হয়। কাজেই যথার্থ শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কেবল বিদ্যালয় নয় গৃহ ও সমাজ পারিবেশিক প্রভাবকে যথাসম্ভব সুস্থ ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

পারিবারিক পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা :—

মানবিক শিক্ষণের (learning) মধ্যে বুদ্ধির দিক ছাড়াও পরিপাকের ও প্রক্ষোভের দিক আছে। এ তিনটি দিক কিভাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে ও কাজ করবে সেটা নির্ভর করে কি বয়স ও কি পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা কার্য সমাধা হচ্ছে। একটি শিশু তখনই হাঁটতে শেখে যখন তার মধ্যে শরীর বৃত্তগত পরিপাক হয়েছে। শৈশবকালীন প্রতিটি প্রয়াসের সাথে পিতামাতার উৎসাহ ও প্রশংসা, তাদের নিন্দা বা ভীতি প্রদর্শন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিন্যাস (attitude) কোন-না-কোন ভাবে শিশুর আবেগগত (emotional) জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল অভিজ্ঞতা যে কেবল শিশুর বর্তমান প্রয়াস কর্মকেই প্রভাবিত করে তা নয়, পরবর্তী জীবনের প্রয়াস ও সাফল্য সম্বন্ধেও মনোভাব সৃষ্টি করে। বয়ঃসন্ধিকালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষায় বুদ্ধি ও প্রক্ষোভের পরিপাকের ক্রিয়া কাজ করে—সে শিক্ষা পুঁথিগত জ্ঞানার্জনই হউক বা সামাজিক শিক্ষাই হউক, কৃত্যই (formal) হউক আর অকৃত্যই (informal) হউক। প্রতিটি শিক্ষণ (learning) কার্য্যের মধ্যেই বুদ্ধির দিক যতই থাক, তার মধ্যে প্রক্ষোভের একটা ক্রিয়া ও তাৎপর্য্য থাকবেই এবং প্রক্ষোভের দিকটাই শৈশবকালীন শিক্ষায় বেশী কাজ করে।

তিন বৎসরের কম বয়সের শিশুদের শিক্ষণ-ক্রিয়ায় বুদ্ধির দিক বড়দের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার তুলনায় অনেক কম থাকে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বুদ্ধি কার্যকরী হয় ও অভিজ্ঞতা অর্জনে ও সমস্যার সমাধানে বুদ্ধি অধিক পরিমাণে কাজ করে। বয়ঃপ্রাপ্তিকালে বুদ্ধির ও বিমূর্ত যুক্তি ক্রিয়া অধিক পরিমাণে আরম্ভ হয়। এই সময়েও প্রক্ষোভ ও অনুভূতি সঞ্জাত পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ (যা ব্যক্তিত্বের মধ্যে গভীরভাবে নিহিত থাকে) বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

মনস্তাত্ত্বিক এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় পরিবারিক পরিবেশের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষারম্ভের পূর্বেই পাবিবারিক শিক্ষা যে কত গভীরভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে কাজ করে তা যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

(ক) মাতার প্রভাব :—

শিশু মা'র উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, জন্মক্ষণ থেকেই তার দৈহিক ও

মানসিক চাহিদাগুলি মা ভিন্ন সে সংগ্রহ করিতে পারে না এবং শিশুর শিক্ষণ কার্য্য প্রথম মাকে কেন্দ্র করেই আরম্ভ হয়। খাদ্য, উষ্ণতা, আশ্রয়, সবই সে মার কাছ থেকে পায় এবং এ থেকেই তার মধ্যে নিরাপত্তা বোধ আসে। এ মৌলিক চাহিদার যে কোন একটির অভাব শিশুর মধ্যে নিরাশ্রয়তা, ভয় ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। জীবনের প্রত্যন্ত প্রভাতে শিশু জৈবিক উদ্দীপক ভিন্নও অন্যান্য উদ্দীপকে সাড়া দিতে আরম্ভ করে, দিনের অত্যন্ত নিয়মিত ঘটনাসমূহে, মা'র যাওয়া আসা, মা'র তার সম্পর্কে আচার-আচরণ, বাচনভঙ্গী, আদর করার ভঙ্গী, শিশুর মনোরাজ্যে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং মা'র আচরণ ধারা শিশুর মধ্যে হয় নিরাপত্তা বোধ, নয় নিরাশ্রয়তা ও হতাশার ভাব নিয়ে আসে। খুব অস্পষ্টভাবে হলেও মা'র ব্যক্তিত্বের একটা ছায়া শিশুর মানস ভূমিতে আনাগোনা করতে থাকে। মা'র সাথে শিশুর সম্পর্কধারা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সুস্থ, অসুস্থধারা নির্ণয় করে।

(খ) পিতার প্রভাব :—

এক বৎসর পর থেকেই, শিশু ধীরে ধীরে মা'র সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল হতে থাকে এবং এই সময় থেকে পিতার সংসর্গ ক্রমে প্রত্যক্ষ হতে থাকে। কোন কোন পরিবারে পিতা সর্বময় কর্তা। পিতার ব্যক্তিত্বও শিশুর মানস-লোকে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

সার্বিক গৃহ-পরিবেশের প্রভাব :—

মানসিক স্বাস্থ্যবিদদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা, কু-শিক্ষা ও অপসঙ্গতির (maladjustment) কারণ অসুস্থ গৃহ পরিবেশ। পিতামাতার উদাসীন নির্দয় আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিঘ্নিত করে। যেসব পিতামাতা অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রতি কঠোর আচরণ করে, সন্তান সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করে এবং সর্বদা তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, তারা শিশুর মধ্যে গভীর হতাশা ও দ্বন্দ্বের উদ্রেক করে ও ফলে নানারূপ অপসঙ্গতি মূলক আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায়। দুর্বল ও অতিপ্রশ্রয়কারী পিতামাতাও সন্তানকে তার খেয়ালখুশীমত চলতে দেয়, সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে রাখে, সকল কল্পিত কষ্ট থেকে তাকে দূরে রাখতে চায় এবং এইভাবে সন্তানকে পর-নির্ভরশীল করে তুলে। স্বভাবতই সে পিতামাতার নির্দেশ মত চলে না এবং সে যখন শৈশবাবস্থা থেকে বয়ঃসন্ধিকালে

পৌঁছায় তখন তার অপসঙ্গতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে, কেননা তখন তার পক্ষে আর আত্ম-নির্ভরশীল, আত্ম-বিশ্বাসী ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয় না। অপরদিকে যেসব পিতামাতা অত্যন্ত কর্তৃত্বাভিলাষী, তাদের সন্তানদের মধ্যে অধিক লজ্জা ও ভীরুতা দেখা দেয় এবং তারাও পরনির্ভরশীল ও আত্ম-বিশ্বাসহীন হয়ে ওঠে।

যথাযথ গৃহ পরিবেশ শিশুকে সস্নেহ শাসনের মধ্যে রেখেও স্বাধীনতা দেয়, যে স্বাধীনতা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়। গৃহ-পরিবেশে খেলাধুলা ও অন্যান্য নির্মল আনন্দময় কর্ম-কাণ্ডের অবতারনা হলে শিশু এতে যোগ দিয়ে আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরে ওঠে— সমবয়সী ছেলেদের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে শেখে। যে গৃহে পিতা-মাতার মধ্যে অহরহ কলহ, অস্থিরতা বর্তমান, সেই সব দীর্ণ গৃহপরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশকে দীর্ণ করে। এই পরিবেশে শিশু শান্ত ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোন প্রকার সুযোগই পায় না।

পিতা-মাতাই শিশুর একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ এবং ব্যাপক অর্থে প্রথম শিক্ষা-দাতা। তাঁদের শিক্ষাদান সোচ্চার না হলেও অলক্ষ্যে শিশুকে নানাভাবে শিক্ষিত করে তুলে। পিতামাতার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ, সন্তান প্রতিপালনে যত্ন সব কিছুই শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ ও সঙ্গতি রক্ষার ধারা নিরূপণ করে। কাজেই শিক্ষার প্রথম যে আবাসস্থল গৃহ তাকে সুস্থ আবহাওয়ায় সর্বদা কুসুমিত রাখতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা সুস্থ গৃহ পরিবেশ রচনার বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায় প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে সাহায্য করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে যাতে পিতামাতা শিশুকে বুঝতে শেখে, তার সমস্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে পারে ও শিশুর বিকাশোপযোগী-পরিবেশ রচনা করতে পারে তার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রচার ও প্রসার হওয়া সমীচীন।

বিদ্যালয়, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা :—

বর্তমানে বিদ্যালয়গুলি কেবল পুঁথিগত বিদ্যাদানের যান্ত্রিক কেন্দ্র নয়। আধুনিক বিদ্যালয় ছোট খাট সমাজ বিশেষ, যেখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমাজীকরণ হয়ে থাকে। একটি শিশুর সুস্থ বিকাশ কল্পে যে সব মৌলিক

চাহিদার পরিতৃপ্তি প্রয়োজন তার সবটা গৃহ-পরিবেশে পাওয়া যায় না—বিদ্যালয়ে এই সব চাহিদার অনেক পরিতৃপ্তি ঘটে—এই কারণে আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে কেবলমাত্র নির্দেশ দান (instruction) পর্যায়ে ফেলতে পারি না। তদুপরি বিদ্যালয়ের কাজ কখনই কেবলমাত্র পরিশুদ্ধ বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা নয়—প্রত্যেকটি শিক্ষণ-শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রক্ষোভ-ঘটিত একটা দিক থাকে। পাঠক্রম, সহপাঠক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্বন্ধ, সৎকাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য শাস্তি-এ সবই শিক্ষার্থীর মনে প্রতিক্রিয়া ঘটায়—মনোরাজ্যে পরিবর্তন আনে এবং পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভাবধারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়। কাজেই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, বৈকল্য (অপসঙ্গতি) প্রতিরোধ ও অপসঙ্গতিমূলক আচরণ প্রকাশ পেলে অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হলে তার নিরাময়ের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা সমীচীন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রত্যেক গবেষকই এ বিষয়ে একমত যে শিক্ষা হচ্ছে একটি প্রগতিশীল শক্তি যা ব্যক্তিকে অভিপ্রেত অর্থাৎ আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণকারী জীবন যাপনে প্রস্তুত করে। মোটামুটিভাবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চারটি (ক) আত্মশক্তির সম্যক ও সুষম বিকাশ (খ) সুস্থ মানবিক সম্পর্ক (গ) আর্থিক স্বাবলম্বন (ঘ) নাগরিক হিসাবে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সামর্থ্য।

শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারাকে রচিত ও রূপায়িত করতে হবে।

(১) পাঠক্রম ঃ—

পাঠক্রম যদি মনগড়া ও শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে করা হয় তাহলে শিক্ষার্থী পাঠে কোন প্রকার উৎসাহ বোধ করে না—পাঠবিষয়ের সাথে একাত্মীকরণ হয় না, ফলে তার সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম ও শক্তি পাঠ্য বিষয় ছেড়ে অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে—ধীরে ধীরে বিদ্যালয় সম্পর্কে তার একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়, পরোক্ষভাবে মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্মত পাঠক্রম প্রনয়ণে নিম্নলিখিত সূত্রগুলির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে—

(ক) শিক্ষা সম্পর্কে একটি ব্যবহারিক দর্শন

(খ) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা

(গ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান

(ঘ) সমকালীন জীবনের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা

(ঙ) প্রচলিত পাঠক্রমের বিচার বিশ্লেষণ ও তা থেকে নূতন সৃষ্টিধর্মী পাঠচয়ন ও উদ্ভাবন।

এ ছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সাথে মাধ্যমিক স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের সাথে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একটা সপ্রাণ যোগাযোগ থাকে। সর্বস্তরের পাঠক্রম যেন পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হয়, যাতে পরিণামে শিক্ষার্থীর মধ্যে সার্বিক বিকাশ ঘটে ও শিক্ষার্থী ব্যবহারিকজীবনে সেই জ্ঞান যথাযথ রূপে কাজে লাগাতে পারে। পাঠক্রম যেন কঠিন কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকে—বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতা সর্বস্তরের পাঠক্রমে থাকা সমীচীন যাতে বিভিন্ন শিক্ষার্থী তার বিশেষ বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ বিষয় গ্রহণ করতে পারে।

নার্সারী-বিদ্যালয় :—

নার্সারী বিদ্যালয়ে সব শিশুই পড়ার সুযোগ পায় না। কিন্তু নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই স্তরের পাঠক্রম বা শিক্ষাধারায় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অনেক প্রয়োজনীয় সূত্রাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। যথাযথ সস্নেহ পরিদর্শন ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে খেলাধুলা ও সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস শিশুকে উদ্দীপ্ত করে—এর মধ্য দিয়ে সে যে স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির স্বাদ পায় ও গোষ্ঠী-জীবনের পরিচিতি লাভ করে তাতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থধারায় হয়। এ থেকে আত্ম-কেন্দ্রিকতা বিদূরিত হয় ও সমাজ-জীবন যাপনের হাতে খড়িও হয়ে যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠক্রম :—

এই স্তরে শিশু সেইসব মূল ক্রিয়ার অনুশীলন করবে যা ভবিষ্যতে তার শিক্ষাগত পাঠক্রম আয়ত্ত করতে সহায়তা করবে। গোষ্ঠী জীবন যাপনের মূল সূত্রগুলির সাথেও সে পরিচিত হতে থাকবে, দৈহিক চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হতে এবং পরিশেষে সে এমন কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করতে শিখবে যা তার বর্তমান ও ভবিষ্যত সমাজ জীবন যাপনে সহায়তা করে।

এই সময়ে শিশু অত্যন্ত সক্রিয় থাকে এই সক্রিয়তাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছানো দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এমন সব বিষয় থাকবে যা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শেখা যায়—যেমন লিখন, পঠন ও গণন। পাঠ বিষয় যতটা সম্ভব সহজ সরল ও বস্তুগত করতে হবে।

যেহেতু শিক্ষণের উপাদানের আয়ত্তীকরণ পরবর্তী শিক্ষণ-পর্য্যায়ের জন্য প্রয়োজন, পঠন, লিখন ও গণনা শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৌলিক দায়িত্ব। বিষয় পাঠে যদি শিক্ষার্থীর অধিক সময় লাগে, গণনায় যদি ক্রমাগত ভুল হতে থাকে, লেখা যদি অস্পষ্ট ও অগোছালো হয়, তাহলে পরবর্তীকালের শিক্ষণ নানাভাবে ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থী পরবর্তী কালের পাঠক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না, পরিণামে নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ও পরবর্তীকালের শিক্ষা জীবনে অসঙ্গতি দেখা যায়।

সহজ সরল গল্পবহুল পাঠ বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা, কর্ম-কেন্দ্রিক সৃষ্টিধর্মী পাঠক্রম, খেলাধুলার প্রবর্তন করা এই পর্য্যায়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম :—

শৈশবকালে পারিবারিক প্রভাব যেমন গভীর ও ব্যপক, বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্যালয়ের প্রভাবও তেমনি গভীর। শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তার শরীরবৃত্ত ও পরিপাক ক্রিয়ার দিক থেকে অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং তার সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার পরিসর বিস্তৃত হয়—শিক্ষার্থীর এইসব পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম নির্ধারিত করতে হবে। এই ভাবে শিক্ষার্থীর সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সে নিজেকে সমাজের একজন অংশীদার ও কর্মী হিসাবে ভাবতে শেখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের মধ্যে ভবিষ্যত জীবিকার প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠক্রমও সন্নিবেশিত হবে। এ ছাড়া পাঠক্রম নমনীয় ও বহুমুখী হবে। অনুবন্ধ প্রণালীও গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্নিহিত মৌলিক সম্পর্ক শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। এ ছাড়া সমাজ সম্পর্কযুক্ত, স্বাস্থ্য ও অবসর যাপনের বিভিন্ন শিক্ষা-মূলক কার্য্যক্রম পাঠক্রমের মধ্যে সন্নিবেশিত হবে।

শিক্ষণ-পদ্ধতি ঃ—

শিক্ষার্থীর মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রমিক বিকাশধারানুযায়ী যে মানস বৈশিষ্ট্য তার সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠক্রম নির্দ্ধারিত হবে, শিক্ষণ-পদ্ধতিও এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরূপিত হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে, বিষয় বস্তুর সার্বিক উপস্থাপন ও পরে বিষয়বস্তুর বিশদ বিশ্লেষণ সমীচীন। মূর্ত জ্ঞান থেকে ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণায় যেতে হবে। সরল থেকে ধীরে ধীরে জটিল ভাব উপস্থাপন, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ক্রমে অজানা জ্ঞান-বলয়ে গমন, সহজ উদাহরণ থেকে সাধারণ সত্যে উপস্থিতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এ ছাড়া শিক্ষা দান একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষকের আন্তরিকতা, বিষয় জ্ঞান, শিক্ষার্থীদের রুচি ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা-দানকে প্রাণবন্ত করে। বস্তুতঃ শিক্ষক প্রাণবান না হলে শিক্ষণ-পদ্ধতি কখনই প্রাণবন্ত হয় না। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার সম্যক জ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে এমন একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটাতে পারে যা শিক্ষককে শ্রেণীতে প্রশ্নকরা, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আহরণ, তাদের পাঠ-বিষয়ে ও শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য কাজে আকৃষ্ট করা ও অনভিযোজিত শিশুকে পুনর্বাসন করা এসব বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায় গ্রহণে সমর্থ করতে পারে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ঃ—

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেবল দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক নয়। জ্ঞানদাতা হিসাবে শিক্ষক ও জ্ঞান গ্রহীতা হিসাবে শিক্ষার্থী এ সম্পর্ক পূর্বে প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্ক বিজ্ঞান সম্মত নয়। জীবনাভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থী শিক্ষকের মাধ্যমে গ্রহণ করে না—শিক্ষার্থী জীবন ও জনতাকে নিজে দেখে ও অনুধাবন করার প্রয়াস করে—সেই প্রয়াসকে শিক্ষক বন্ধুর মত পাশে থেকে সার্থক করতে সহায়তা করেন মাত্র। শিক্ষক হবেন বন্ধু—শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময়। শিক্ষক হল শিক্ষার্থীর সহযোগী-জীবন পথের পথিকৃত। শিক্ষকের স্নেহ প্রীতি শিশুর মধ্যে নিরাপত্তা বোধ নিয়ে আসে—ভালবাসার দ্বারা তার মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এ দু'টিই একান্তভাবে অপরিহার্য। বিদ্যালয়,

ও পাঠ বিষয় সম্বন্ধেও শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়। সমস্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একাত্মকরণ ঘটে, যার ফলে বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারা ফলপ্রসূ হয়।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে যদি ফাটল থেকে যায়, তাহলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি সামর্থ্য থাকে তা অনাবিষ্কৃত থেকে যেতে পারে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথাযথভাবে হতে পারেনা, ফলে সমস্ত শিক্ষা-পর্বই প্রাণহীন তথ্য সামগ্রী জর্জর নিষ্ফল প্রয়াসে পরিসমাপ্ত হয়। শুধু তাই নয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক প্রগাঢ় না হলে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যা, কোনপ্রকার অবদমিত অপসঙ্গতি অনাবিষ্কৃত থেকে যায়, ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয় ও পরিণামে শিক্ষাগত যোগ্যতা হ্রাস পায় এবং কখনও কখনও বিদ্যালয়ের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

চেতনভাবেই হোক আর অবচেতন ভাবেই হোক, শিক্ষার্থী বড়দের অনুকরণ করে থাকে। শিক্ষার্থীর সাথে যাঁদের প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে ও যাঁদের উপর শিক্ষার্থী তার মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য নির্ভরশীল থাকে, তাঁদেরকেই শিক্ষার্থী অধিকভাবে অনুকরণ করার প্রয়াস করে। শিক্ষকের আচরণ, বচনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আবার শিক্ষার্থী গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়। কাজেই জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাভাবনা, কর্মপ্রয়াস সব বিষয় সম্পর্কে একটা অনুকরণযোগ্য জীবনাদর্শ গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। শিশু-শিক্ষার্থীর বিকাশে তার পারিবারিক প্রভাব অত্যন্ত বেশী কাজ করে, বিশেষ করে নিরাপত্তা বোধের দিক থেকে। বয়ঃসন্ধিকালে পিতামাতার প্রভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং নবযুবা পারিবারিক নির্ভরশীলতা থেকে ক্রমে মুক্তি প্রয়াসী হয়। অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক পূর্বে তত প্রগাঢ় ছিল না, তাদের সম্বন্ধে নবযুবকযুবতী (adolescent) অনুরাগ অনুভব করতে থাকে—বিদ্যালয়ের প্রভাব এই সময়ে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপায় —এই সময়ে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহার্দ্র আচরণ, বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা :—

শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্তর্জাত। শাস্তি, ভয়, নিন্দা, স্তুতি এইসব কৃত্রিম পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়াস অস্বাস্থ্যকর। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা

শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের অবতারণা করেছে এবং পূর্বের ধারণাকে পরিবর্তিত করেছে ; আমরা এখন আর বিশ্বাস করি না যে শিশু খারাপ হয়েই জন্মায়—খারাপ নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা সে চালিত হয়—শাসন ও তথা-কথিত কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে শিশুকে ভাল করতে হয়। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও তার ক্রিয়া কর্ম সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক সত্যাদি, বর্তমানে শৃঙ্খলা, শাস্তি এবং বিপথগামী শিশুকে নিয়মানুবর্তী করার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তন করেছে।

প্রতিটি শিশু স্বভাবতঃ কর্মচঞ্চল ও গতিশীল। অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা এবং এতে সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে—এর সমাধান অবশ্য সে নিজেই করার চেষ্টা করে। সে কোন না কোন দিকে নিজেকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করতে চায়, এতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশও ঘটে। অনেক সময় নিজেকে কোন বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত করার ইচ্ছা এত অস্বাভাবিকরূপে প্রবল হয় যে, অন্যের রুচি, ইচ্ছা এবং অধিকার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন হয়ে পড়ে। নিজেকে সার্থক করার ইচ্ছা যদি অপরের স্বীকৃতির অপেক্ষা না রাখে তা হলে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা দেয়। দলীয় স্বীকৃতি অপেক্ষা শিক্ষকের স্বীকৃতি এ বিষয়ে অনেক বেশী কার্যকরী।

অন্তর্জাত প্রেষণা শক্তিগুলি শিশুর ব্যবহারের উৎস—কাজেই এই প্রেষণা শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষায় কতগুলি প্রেষণাশক্তির উদ্গতি সাধন করা সমীচীন। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সুচিন্তা, সুদৃষ্টি ও সদাচরণ আসে।

শিশুর মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিপূরণ না হলে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে নানারূপ অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয় ও এর দ্বারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের ধৈর্য্য, সহৃদয় ভাব ও তাঁদের সুষম ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ আনয়নে অনেক পরিমাণে সহায়তা করে।

সহপাঠক্রমিক কার্য্যক্রম ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে যথেষ্ট কাজ করে।

মোটের উপর, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার অর্থই হল শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ।

বিদ্যালয়ে পরিমাপণ ঃ—

মানসিক স্বাস্থ্য সম্মত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল সুস্থ ও সার্থক জীবন যাপনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি নিচয় আছে তার সম্যক্ বিকাশ সাধনে সাহায্য করা এবং অপসঙ্গতির কোন সম্ভাবনা থাকলে তাকে গোড়া থেকেই দূর করা। এই উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য শিক্ষকও বিদ্যালয়ে নিযুক্ত মনোবিদের প্রধান কাজ হল একদিকে শিক্ষার্থীদের মানস সম্পদ সম্পর্কে ও অন্যদিকে ক্ষতিকারী মানসশক্তি সম্বন্ধে জানা।

শিক্ষার্থীর পাঠ বিষয়ে ও অন্যান্য দিকে উন্নতি অবনতির একটা সঠিক চিত্র মাঝে মাঝে গ্রহণ করতে হবে—শিক্ষার্থীর বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্বের উপর চারি-দিকের পারিবেশিক প্রভাব কতটুকু ও কিভাবে কাজ করছে সে সম্বন্ধেও যাচাই করে দেখতে হবে।

মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধ, শিক্ষার্থীর শক্তির যথার্থ বিকাশ ও প্রয়োগের জন্য বিদ্যালয়ে এই পরিমাপন অপরিহার্য্য।

নির্দেশনা ঃ—

শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হয় এবং শিক্ষার্থীর শক্তি সামর্থ্য, রুচি অনুযায়ী তাকে উপযোগী শিক্ষাধারা ও পাঠ বিষয়ে পরিচালিত করতে হয়। যে কোন নির্দেশনা কার্য্যেরই দুটি পর্যায় আছে (ক) ভবিষ্যকথন (Prediction) (খ) নিয়ন্ত্রণ (control)। ভবিষ্যকথনের জন্য শিক্ষার্থীকে সম্যকভাবে জানতে হয়—মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা, জীবন পঞ্জী প্রভৃতি থেকে শিক্ষার্থীকে জানা হয়—তার ভিত্তিতে সে কি হবে, তার শক্তি কোন দিকে বা দুর্বলতা কোন দিকে এ সব জেনে তার মানস সম্পদ ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় (control)।

বিদ্যালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারূপ অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়। এই আচরণ কখনো আক্রমণধর্মী (যেমন মারধর করা, ঝগড়া বিবাদ করা, স্কুল পালানো, চুরি করা, শিক্ষককে অপমানিত করা, অবাধ্য হওয়া) কখনো অবদমিত (যেমন অত্যধিক ভয়, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, নিদ্রাহীনতা) অবস্থায় থাকে। এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষকও মনশ্চিকিৎসক, মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গোড়া থেকেই এই সব সংলেক্ষণ (symptom) আবিষ্কার করবে, বংশগত ও পারিবেশিক প্রভাব সমূহ বিচার

বিশ্লেষণ করে পারিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গতি ও পুনর্ব্বাসনে সাহায্য করতে পারে।

বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও শিক্ষা পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। প্রকৃত শিক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত শিক্ষাধারা রচিত ও প্রযোজিত হওয়া অপরিহার্য্য।

অনুশীলনী

1. Define the scope of Mental Hygiene. "The problems of Hygiene are allied closely with those of Education". Discuss.

2. What is Mental Hygiene? Discuss its importance and usefulness in the field of Education.

3. Delineate the importance of Mental Hygiene in the field of education.

4. Develop the idea that an acquaintance with the basic principles of Mental Hygiene is indispensable for the teacher.

5. Indicate the responsibility of school in preserving the Mental Health of the children.

6. Discuss the importace of the home in preserving the Mental health of the children.

7. "Education is a continious process of individual adjustment from birth to death"—Discuss the scope of Mental Hygiene with particular reference to the above statemant.

8. What suggestions from the Mental Hygiene point of view do you have to offer for motivating learning?

9. Formulate an educational programme for your school taking in consideration the basic principles of Mental Hygiene.

10. Discuss procedures you would use to increase efficiency-adjustment of the children in your school.

11. How is Mental Hygiene related to Education?

অষ্টম অধ্যায়

নবযুবকাল ও তার সমস্যা

(Adolescence and its Problems)

'Adolescence' শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ 'বৃদ্ধি-পাওয়া'। মানবজীবনের বিকাশ-পর্য্যায়ের এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিকাশ পর্য্যায়টি একটি অন্তবর্তীকাল—বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ বয়ঃপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয় নি এমন সময়। প্রভাত কালের সমাপন হয়েছে কিন্তু দ্বিপ্রহর হয় নি। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নূতনকে আলিঙ্গন করার যে প্রাণচঞ্চল অনিশ্চিত প্রয়াস—এইটিই যেন আমরা নবযুবকালে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সময়ে নবযুবক "শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে, মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে। এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে।"

এ সময়ে দেহ-মনে একটা আলোড়ন ঘটে। অনিশ্চয়তা স্পর্শকাতরতায় ভরা এ সময়টা বিভিন্ন সমস্যার দ্বারা পরিকীর্ণ জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় কাল। মানসিক ভারসাম্য এ সময়ে ভেঙ্গে গিয়ে নূতনভাবে নূতন পরিমণ্ডলে পুনরায় সৃষ্টি হয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কবি Keats এক জায়গায় বলেছেন "The imagination of a young boy is healthy and the mature imagination of a man is healthy, but there is a space of life in between, in which the soul is in a ferment, the character undecided, the way of life uncertain."

নবযুবকালের পরিবর্তন :—

দৈহিক বিকাশের চরম পর্য্যায়টি এই নবযুবকালে পরিলক্ষিত হয়। পিটুইটারি গ্রন্থির (যা মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত থাকে) কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির

ফলে এই সময়ে দেহ বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই নালিবিহীন গ্রন্থির রস শরীরের কোষ ও কোষ তন্ত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটায় এবং অন্যান্য নালিবিহীন গ্রন্থি (Endocrene glands) যেমন থাইরয়েড, এড্রিনাল ও গোনাড (যৌন গ্রন্থি) প্রভৃতির কার্যমাত্রা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে, এর ফলে শারীরিক বিকাশ ও বৃদ্ধি মাত্রা উচ্চকিত হয়ে ওঠে। থাইরয়েড গ্রন্থির রস নিঃসরণের ফলে হাড়, দাঁত এবং মধ্যবর্তী স্নায়ুতন্ত্রের (Central nervous system) বিকাশ বৃদ্ধিও বহুগুণিত হয়। যৌন গ্রন্থির কার্যকারিতার জন্য ছেলেমেয়ে উভয়ের বেলাতেই যৌন ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা লাভ ঘটে এবং শরীরের বিভিন্ন প্রকার যৌনগত বৈশিষ্ট্যের (Secondary sexual character) প্রতিফলন ঘটে।

মানসিক পরিবর্তন ঃ—

মানসিক ও প্রাক্ষোভিক (emotional) যে সব পরিবর্তন নবযুবক যুবতীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় তার অনেকটাই এই সব জৈবিক পরিবর্তনের ফল-স্বরূপ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা ও অনুশাসনের দ্বারাও (Social & cultural norms) কিয়দংশে এই মানসিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন ঘটে। নবযুবক তার শারীরিক বৃদ্ধি ও নূতন শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বয়ঃপ্রাপ্তির সীমানায় পৌছাবার জন্যে তার মধ্যে নানা প্রকার প্রয়াস দেখা যায়। শৈশবকালীন পরনির্ভরতা থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সে সচেষ্ট হতে থাকে কিন্তু তার যেসব জৈবিক ও মানসিক চাহিদা আছে সেগুলির পরিপূরণের জন্য তখনও তাকে পরিবারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। একদিকে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস অন্যদিকে পরনির্ভরতা তাকে যন্ত্রণা বিধ্বস্ত করে তোলে। সে জানতে চায় তার আপন পরিচয় এবং ভবিষ্যতে কি হবে এই চিন্তা তাকে আকুল করে তোলে। তার মানস-বিকাশ এমন একটা পর্যায়ে পৌছে যখন সে উন্নত বিমূর্ত চিন্তাও করতে শেখে।

শৈশবকালে শিশুর নিকট সমস্ত জগত যেন অপরিচিত। এই অপরিচিতি থেকে শিশু ধীরে ধীরে তার চারপাশের মানুষ, পরিবার ও সমাজের সাথে পরিচিত হতে থাকে। শৈশবকালে দৈহিক-মানসিক দিক থেকে কোন প্রকার সংহতি থাকে না। সব কিছু এলোমেলো। বাল্যকালে এই এলোমেলো ভাব ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে একটা স্থিতি আসে। পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজনও স্বাভাবিক ও সুস্থ হয়ে আসে। নবযুবকাল আগমণের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থিতি নষ্ট হয়ে যায়—সমস্ত দেহে মনে আবার একটা আন্দোলন ও

আলোড়নের সৃষ্টি হয়। জগত ও জীবনকে সে আবার নূতন করে দেখতে ও বুঝতে শেখে। নূতনভাবে আবার পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে যুঝতে হয়। পারিবেশিক শক্তির প্রবলতার কাছে তার সঙ্গতি রক্ষার শক্তি অপ্রতুল মনে হয় ফলে একটা যন্ত্রণাকাতর মানসিকতার উদ্ভব হয়। ফ্রয়েড, আর্নেষ্টজোনস্ নবযুবকালকে শৈশবের পুনরাগমন বলে মনে করেন। শারীরিক ও মানসিক এই সব পরিবর্তনের পটভূমিতে নবযুবক যুবতীদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

নবযুবকালের সমস্যা ঃ—

(১) দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধি ও দৈহিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা ঃ—

দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি হঠাৎ তরান্বিত হওয়ার ফলে সঙ্গতি-বিধানে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। দৈহিক বিকাশ এই সময়ে সমানুপাতিক হয় না। একজন নবযুবকের হাত, পা নাক বা কান শরীরের অন্যান্য অংশের অনুপাতে অনেক বড় মনে হতে পারে, এর ফলে তার মধ্যে একটা লজ্জা ও অপমানকর অনুভূতি তাকে সর্বদা তাড়িত করতে পারে। সে দেহ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং তার সমবয়সীদের মধ্যে যাদের শারীরিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক তাদের সম্বন্ধে একটা ক্ষোভ ও ঈর্ষা অনুভব করে। এই সময়ে এ সব বিষয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও বিরক্তও করতে পারে। এর ফলে এই সময়ে কেউ কেউ নিজেকে অন্যের কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়, আবার কেউ কেউ বিরক্তিকারীকে আক্রমণ করে এবং এদের সব বিষয়েই একটা আক্রমণ-ধর্মী প্রতিন্যাস (attitude) সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয়ে যদি একটা দয়াদ্র ও সদিচ্ছামূলক পরিবেশ বর্তমান থাকে এবং শিক্ষার্থীদের যদি এটা বুঝানো যায় যে এইরকম দৈহিক পরিবর্তন এই সময়ে একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা তাহলে এই সময়ের অনেক সমস্যা তিরোহিত করা যায়।

এই সময়ে গ্রন্থি-রস নিঃসরণের জন্য যে পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ করে যৌন-গ্রন্থির কার্যকলাপ আরম্ভ হওয়ার জন্য প্রাক্ষোভিক যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার ফলে একটা মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয় ও সঙ্গতিবিধানে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় সঙ্গতিবিধানের জন্য নববযুক যুবতীদের সাধ্যমত নিজেদের চেষ্টা করা উচিত—শিক্ষক, পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয়

ব্যক্তিদেরও এ সমস্যা সহানুভূতির সাথে বিচার বিবেচনা করে দেখা উচিত। গ্রন্থি-ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতাজনিত যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় তা রোধ করা যায় যদি প্রথম থেকেই এ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

(২) মানসিক প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমস্যা :—

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নবযুবক শিক্ষার্থীকে অনেক বিষয়বস্তু থেকে বিশেষ কতকগুলি বেছে নিতে হয়। এই সময়ে সে নিজেই সঠিকভাবে বুঝতে পারে না কোন দিকে তার প্রবণতা, এবং সামর্থ্য রয়েছে। একদিকে তার নিজের সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ধারণা অন্যদিকে পিতামাতার ইচ্ছা ও অভিরুচি, তার সহপাঠীদের রুচি ও প্রবণতা এবং অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের এক এক প্রকারের মতামত শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। এ ছাড়া এ সময়ে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ও ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষা-নির্দেশনা (Educational guidance) একান্তভাবে প্রয়োজন। অনুন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেদের যদিও বিদ্যালয়ে পড়তে হয়, এদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রমের প্রবর্তনা সমীচীন কেননা উচ্চবুদ্ধি ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে সমতা রেখে এরা চলতে পারে না এবং পরিণামে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসে। এই ব্যর্থতাবোধ থেকে তার মধ্যে এমন মনোভাব ও অভ্যাস সৃষ্টি হয় যা থেকে তার মধ্যে বিদ্যালয়ের নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয় এবং পরবর্তী জীবনেও নানারূপ অসঙ্গতি আসে।

এ সময়ে উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও তাদের পিতামাতা, শিক্ষক, কখনও কখনও আপন অবিজ্ঞোচিত অতি অভিলাসের জন্য নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়। নেতৃত্ব করার ও সার্থকতা লাভের ক্ষমতা থাকার জন্য তাকে তার সমকক্ষ সহপাঠীদের সঙ্গে কেবল পাঠ-বিষয়েই নয় অন্যান্য সমাজ-কর্মেও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়—এই প্রতিযোগিতা এত কঠোর এবং এত শক্তি ক্ষয়কারী হতে পারে যে তার বিকাশোন্মুখ স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। পাঠ বিষয়ে প্রতিযোগীকে পরাজিত করার জন্য পাঠ-অনুশীলনেই বিদ্যালয়ের সর্ব সময় ও পরে গৃহের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে। ওয়াইল বলেন :

এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিসমূহের বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকর্মের জন্য বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েরা নানাভাবে ভুগতে পারে—এদের বিশৃঙ্খল কাজের জন্য স্বাভাবিক

সুস্থতাও বিঘ্নিত হতে পারে। থাইরোয়েড গ্রন্থি যদি তার কর্মে অতিমাত্রিক হয়, তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা, কোপন স্বভাবতা (irritability), হঠাৎ ক্রোধ, অধিক স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়—এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা আর্তব-ক্ষয়ের সময় বিশেষ ভাবে দেখা যায়। নিরুৎসাহতা, শক্তি স্বল্পতা, একঘেয়ে ভাব দেখা যায় যখন থাইরোয়েডের কর্ম মাত্রা কমে যায়। পিটুইটারি গ্রন্থির বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকর্মের জন্যও নানারূপ অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। প্যারাথাইরোএড্ গ্রন্থির স্বল্প কর্মের ফলে, অস্থিরতা, অমনোযোগিতা ইত্যাদি দেখা দেয়। আবার এড্রিনাল গ্রন্থির বিশৃঙ্খল কার্য্যকারিতার জন্য উত্তেজনা, রাগত ভাব, বিকৃত যৌন বিকাশ হতে পারে।

যৌন গ্রন্থিরাজির বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ তীক্ষ্ণভাবে যৌন ইচ্ছার উদ্রেক করে। ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। যৌন গ্রন্থির ও লিঙ্গের অকর্মকারিতা হেতু ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধে একটা বীতশ্রদ্ধভাব ও চাপা ক্ষোভ দেখা দেয়।

নব যুবক-যুবতীদের এই সময়ে কতকগুলি রোগাক্রান্তির সমূহ ভয় থাকে যেমন হৃদরোগ, ক্ষয়রোগ, ম্যানেনজাইটিস প্রভৃতি। অপুষ্টি, অতিমাত্রিক শরীর বৃদ্ধি, অস্বাভাবিক ক্ষীণ মাত্রায় বৃদ্ধি প্রভৃতিও এদের মধ্যে স্বাভাবিক সঙ্গতি বিধানে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে, কেননা শারীরিক বিকৃত বিকাশ-বৃদ্ধি কিংবা অবাঞ্ছিত অবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সমাজ প্রতিযোজনে বিঘ্ন আনে। যে সকল যুবক, শারীরিকশক্তিহীনতার জন্য কিংবা অসুস্থতার জন্য স্বাভাবিক ও সুস্থ যুবকদলের সাথে তাদের পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে না, তাদের মধ্যে নানারূপ অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই কারণে দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা এবং সুনিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য শিক্ষা এসময়ে বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হওয়া সমীচীন।

কাজেই উন্নত ও অনুন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন নব যুবক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকালে নির্দেশনা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এই সময়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনা উভয়েরই প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়।

প্রক্ষোভঘটিত সমস্যাবলী :—

প্রক্ষোভঘটিত অপসঙ্গতি জীবনের বিকাশ পর্য্যায়ের একটা বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় না। প্রক্ষোভঘটিত বিশৃঙ্খলার

কারণ ব্যক্তির স্নায়ু ও গ্রন্থি তন্ত্রের অস্বাভাবিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে নিহিত থাকে। এই স্নায়ুতন্ত্র ও গ্রন্থিতন্ত্রের বিকৃত ক্রিয়া কলাপ আরম্ভ হয় পরিবেশিক উদ্দীপকের দ্বারা, যে উদ্দীপকের দ্বারা ব্যক্তি প্রভাবিত হয় এবং যে উদ্দীপক ধারায় সাড়া দিতে দিতে ব্যক্তির মধ্যে প্রতিন্যাস ও অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

নবযুবাকালে ব্যক্তি দ্রুত শারীরিক গঠনের পরিবর্তন হয় শরীরবৃত্তগত ক্রিয়াকলাপ এবং মানসিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা পরিধি বৃদ্ধির দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হয়। বাল্যকালীন আচরণ ও অভ্যাস তাকে আর সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে অত্যন্ত আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, নূতন নূতন পরিবেশের সম্মুখে তার অনিশ্চয়তা তাকে নিজের সাড়া সম্বন্ধে ও তার চারিদিকের ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর করে তোলে। তার বয়ঃপ্রাপ্ততার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য তার যে সংগ্রাম তা তার মধ্যে প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

শিক্ষকদের ও অন্যান্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটা প্রধান কাজ হল প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলার সংলক্ষণগুলো আবিষ্কার করা। এই সময়ে অন্তর্জাত আলোড়ন বিভিন্ন ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। দিবাস্বপ্ন, উদাসীনতা, বিদ্যালয়ের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া প্রভৃতি সংলক্ষনের মধ্য দিয়ে প্রক্ষোভিক অপসঙ্গতি প্রকাশ পায়। কখনও কখনও শিক্ষকের বিরুদ্ধাচারণ করা, বদমেজাজ, সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, বিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্ট করা, প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়েও ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়।

যদিও একজন স্বাভাবিক ও সুস্থ নবযুবকের মধ্যে কখনও কখনও অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়, কিন্তু এই ধরণের মারাত্মক অপসঙ্গতিমূলক সংলক্ষণ সম্বন্ধে বড়দের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই প্রকারের আচরণ ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণ তাঁদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। নবযুবকদের সম্বন্ধে যদি সহানুভূতিশীল ও স্নেহাদ্র হওয়া যায় এবং তাদের সমস্যা যদি মানসিক স্বাস্থ্য-বিদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অবলোকন করা যায় ও প্রথম থেকেই এর সমাধানে সাহায্য করা যায় তা হলে অনেক সমস্যার বিমুক্তি ঘটতে পারে। কোন কোন শিক্ষক এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কখনই ক্রোধের বিস্ফোরণ দেখতে পান না আবার কেউ কেউ প্রতিনিয়তই অভিযোগ করেন যে তাকে ছাত্ররা মানছে না বা নানারূপ অস্বাভাবিক ও অশোভন আচরণ শ্রেণীকক্ষে করছে। এর কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছাত্ররা নয়, শিক্ষক নিজের শ্রেণীকক্ষে

যে পরিবেশের অবতারণা করা দরকার তা করতে সক্ষম হন না। নবযুবকরা স্বভাবতই কিছু পরিমাণে যন্ত্রণা বিধ্বস্ত থাকবে আর সেই কারণেই তাদের জন্য এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যা হবে প্রশান্ত ও যার মধ্যে একটা কার্য্যকরী নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকবে। বিদ্যালয়ে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত কাজ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়—এই কাজ ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে যদি কোন ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবেগজনিত অস্থিরতাও দেখা দেয় তাহলে তা প্রশমিত হতে পারে।

যাদের মধ্যে গৃহ পরিবেশের অসুস্থতা ও অস্থিরতার জন্য কিংবা দৈহিক অসুস্থতার জন্য প্রক্ষোভিক বিশৃঙ্খল দেখা দিয়েছে, যার ফলে পাঠ বিষয়ে অবনতি, জীবিকার পথ বেছে নিতে অক্ষমতা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে নানারূপ সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এমন সব ছেলেমেয়েদের জন্য যথাযথ নির্দেশনার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্ম-পরিচালকবৃন্দ সুস্থব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং যে বিদ্যালয়ের পাঠ-ক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক কর্ম-কাণ্ড এমন ভাবে প্রণীত ও প্রবর্তিত যে নবযুবকদল এতে নিজেদের সার্থক করে তোলার যথার্থ সুযোগ পায় এবং যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষকদের সহানুভূতিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত সাহায্য পায়, সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা ও অপসঙ্গতি কম দেখা দেয়। এ বিষয়ে বিদ্যালয়কে অবশ্যই গৃহ ও অন্যান্য সমাজ-সংস্থার সাহায্য নিতে হবে। এ ছাড়া এদের জন্য যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থাও করা দরকার। যৌন কৌতূহলের স্বাস্থ্যসম্মত নিবৃত্তির উপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নবযুবক-যুবতীদের এ বিষয়ে আলোকিত করা যেতে পারে।

নবযুবকাল ও তার চাহিদা (Adolescence and its needs) :—

নবযুবকালে দৈহিক ও মানসিক যে বিকাশ ঘটে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শরীর ও মনের কতকগুলি নূতন চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি না হলে ব্যক্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়, মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, ফলে নানাবিধ অপসঙ্গতির উদ্ভব ঘটে।

এই চাহিদাগুলিকে মোটামুটি আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি—(ক) শারিরীক চাহিদা (খ) মানসিক চাহিদা।

দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি যে হারে এই সময়ে হয়ে থাকে তার সঙ্গে সমতা রেখে চলতে গিয়ে নবযুবকযুবতী অধিকতর সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা অনুভব করে। এই খাদ্যের চাহিদা ঠিকভাবে পরিতৃপ্ত না হলে এই সময়ে অপুষ্টিজনিত নানা প্রকার ব্যাধি দেখা দেয়। এছাড়া মুক্তবায়ু, রোদ ও প্রকৃতির অকৃত্রিম দান পর্যাপ্তভাবে প্রয়োজন। ব্যায়াম, খেলাধুলা, অবাধ ও পর্য্যাপ্ত দৈহিক সক্রিয়তা ব্যক্তির এই সময়ে প্রয়োজন।

মানসিক চাহিদা ঃ—

(১) আত্ম-অবগতির চাহিদা ঃ—

দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধির তীক্ষ্ণতাহেতু ব্যক্তির মধ্যে একটা নূতন শিহরণ ও চাঞ্চল্য আসে—একটা অতৃপ্তি ও অস্থির ভাব তাকে উদ্বেল করে তোলে। সে নিজেকে অধিকভাবে জানতে চায়। তার জন্ম-বৃত্তান্ত, তার শক্তি-সামর্থ্য, পরিবার ও সমাজে তার স্থান এ সব বিষয়ে জানার জন্য সে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই আত্ম-অবগতির চাহিদা পিতামাতা ও শিক্ষকের দ্বারা যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত।

(২) স্বাবলম্বনের চাহিদা ঃ—

শিশু জন্মক্ষণ থেকে তার মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য সম্পূর্ণভাবে মাতাপিতার উপর নির্ভরশীল থাকে। সমস্ত বিষয়েই সে পিতামাতার মতামতের উপর নির্ভর করে। নবযুবকালে তার মধ্যে এক নূতন পরিবর্তন আসে। দৈহিক দিক থেকে তার বিকাশ একটা এমন পর্য্যায়ে পৌঁছে যখন সে নিজেকে তার চারদিকের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমকক্ষ মনে করতে আরম্ভ করে। এতদিনের পরনির্ভরশীলতা থেকে সে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে। সে সব বিষয়েই আত্মনির্ভর হতে চায়। এই স্বাবলম্বনের চাহিদা যথার্থভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। এই সময়ে পরিবারে ও বিদ্যালয়ে তাকে ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব দিয়ে, তার মতামতকে মর্য্যাদা দিয়ে, ব্যক্তি হিসাবে তাকে যথার্থ সম্মান দেখিয়ে তার এই মানসিক চাহিদার পরিপূরণ করা উচিত।

(৩) আত্ম-সম্মানের চাহিদা ঃ—

এই সময়ে আত্ম-সম্মানবোধ যুবকযুবতীদের মধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়। নিজের সম্বন্ধে নিজের মূল্যায়নের প্রয়াস আরম্ভ হয়। সামান্য আঘাত বা অপমান

তাদের মর্ম-পীড়ার কারণ হয়। পরিবারে ও সমাজে তার অস্তিত্বের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে এ সম্বন্ধে সে স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। এই সময়ে দৈহিক শাস্তি বা সকলের সম্মুখে হেয়কারী কথা বা মতামত তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। এই আত্ম-সম্মানের চাহিদা যথার্থভাবে পরিপূরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হতে পারে।

(৪) **আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদা :—**

নবযুবকযুবতীরা তাদের আচার আচরণ ও বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সর্বদা নিজেদিগকে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিদ্যালয়ে পাঠ বিষয়ে, খেলাধূলা, শিল্প-সৃষ্টি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেদের সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তির উপর সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন বহুলাংশে নির্ভর করে।

(৫) **অজানাকে জানার চাহিদা :—**

বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ এই সময়ে একটা পরিণতিতে এসে পৌছে। নবযুবকযুবতীদের কৌতূহল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সে জীবন ও জগতকে নূতন উদ্যম নিয়ে জানতে চায়। প্রকৃতির ঘটনা প্রবাহকে তারা আর কেবল যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মনে করে না—এই ঘটনা প্রবাহের অন্তরালে যে সত্য নিয়ত ক্রিয়াশীল তাকে জানতে চায়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি তাকে আকৃষ্ট করে। এই অজানাকে জানার প্রয়াস ও উদ্যম এদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা যায়। শিক্ষা-ক্ষেত্রে এর যথার্থ প্রয়োগ এদের শিক্ষাগত জীবনকে সার্থক করতে পারে।

(৬) **স্বাধীনতার চাহিদা :—**

বাল্যকালীন শাসনের সীমানা ছেড়ে নবযুবকযুবতীরা স্বাধীনভাবে চলতে চায়। নিজের সম্বন্ধে নিজেরাই ভাবতে শেখে, সকল বিষয়ে নিজের মতের দ্বারা চালিত হওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা এদের মধ্যে দেখা যায়। কোন কাজের দায়িত্ব পেলে তারা খুশী হয়, পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতামত দিতে পারলে আনন্দ পায়।

অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায়ই এই স্বাধীনতাকে কখনও স্পর্দ্ধা, কখনও উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করেন। নবযুবক-যুবতীদের মনের এই ইচ্ছার যথার্থ মূল্যায়ন

এঁরা করতে পারেন না, ফলে শৃঙ্খলাজনিত নানাপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়। এই স্বাধীনতার চাহিদাকে সহানুভূতির সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে ব্যক্তিত্ববিকাশ যথার্থ রূপে হতে পারে।

(৭) যৌন-চাহিদা ঃ—

যৌন-অঙ্গ ও যৌন-গ্রন্থির বিকাশ ও পূর্ণতার ফলে নবযুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌন চেতনার উদ্ভব হয়। ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা এদের পেয়ে বসে। ছেলেরা সঙ্গিনী এবং মেয়েরা সঙ্গী খোঁজে। যৌন কৌতূহলও এই সময় বিশেষ ভাবে দেখা দেয়। যৌন জীবনের বিভিন্ন দিক জানার জন্য তাদের মধ্যে একটা প্রবল কৌতূহলের উদ্রেক হয়।

এই সময়ে খেলাধূলা, শিল্প-চর্চা ও অন্যান্য সমাজ সংগঠণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে যৌন শক্তির উদ্গতি সাধন (**sublimation**) মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্য সম্মত যৌন জীবন সম্বন্ধে শিক্ষাদানও বাঞ্ছনীয়।

(৮) সমাজ-সংসর্গের চাহিদা ঃ—

বাল্যকালীন পরিবার-পরিচয়-পরিসর থেকে নবযুবকযুবতীরা বৃহত্তর সমাজ-সংসর্গের চাহিদা অনুভব করে। অপরিচিতদের সঙ্গে পরিচিত হতে, সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে নিজেকে প্রতিস্থাপন করার জন্য তাদের মধ্যে আকুলতা দেখা দেয়।

বিদ্যালয়ের নানাবিধ সংগঠনমূলক যৌথ কাজকর্ম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজ-সেবামূলক কাজ কর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নবযুবক-যুবতীদের এই চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো যায়। বস্তুতঃ সমাজ জীবন যাপনের শিক্ষার এই সময়টাই যথার্থ কাল।

(৯) নৈতিক চাহিদা ঃ—

শিশুর মধ্যে উচিত অনুচিত বোধ থাকে না। আত্ম সুখের জন্য তার কর্ম প্রয়াস নিয়োজিত হয়। ভালমন্দ বিচার তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নৈতিক মান তার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে থাকে না।

নবযুবকালে বুদ্ধি-পরিপাক ক্রিয়ার সমাপনে যুবকযুবতীরা যুক্তিগ্রাহ্য বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে। বৃহত্তর সমাজ ও আত্মিক কল্যাণের পটভূমিতে তার ভালমন্দ বিচার করার প্রয়াস আরম্ভ হয়। আপন নৈতিক মানের মাপকাঠিতে তারা নিজের ও অন্যের কাজকর্মের বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে।

এই নৈতিক বোধ পরিমিত না হলে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। নৈতিক মান যদি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব হয় তা হলে স্বাভাবিক কাজেও তীক্ষ্ণ অপরাধবোধ নানারূপ মানসিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায় ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে।

(১০) আদর্শের চাহিদা :—

নবযুবকযুবতীরা এই সময়ে বীর পূজার একটা চাহিদা অনুভব করে, কোন ব্যক্তিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তার মতাদর্শে চলার একটা প্রবণতা এদের মধ্যে দেখা দেয়। সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক, ধর্মদর্শন বিষয়ক প্রশ্নাদি তার মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি করে। বিহ্বলভাবে সে একটা জীবনাদর্শের চাহিদা অনুভব করে।

সুস্থ জীবনাদর্শ গড়ে উঠার জন্য গৃহ পরিবেশে ও বিদ্যালয়ে একটা সুস্থ পরিবেশ রচনা করা দরকার। এ ছাড়া পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যদি সদাদর্শ থাকে তা হলে তাঁদের জীবন দর্শন ও জীবনভঙ্গী নব যুবকযুবতীদের সুস্থ জীবনাদর্শ গঠনে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে।

অনুশীলনী

1. Show your acquaintance with some of the common behaviour-problems of adolescent students. How would you tackle them ?

2. Discuss some of the basic problems of adolescence. Indicate your own ideas regarding the guidance of the adolescent.

3. Give a brief account of some problems of maladjustment of adolescent students to their academic and social surroundings.

4. State problems of adolescence. Why are the symptoms of many abnormalities first observed in the adolescent ?

5. Briefly describe the importance of keeping the Mental Health of the adolescent sound.

6. Indicate the measures you would adopt for keeping the Mental Health of an adolescent sound.

7. Mention the chief characteristics of the mind of the adolescent and suggest the procedure you would adopt for guiding him for his mental health.

8. What are the chief characteristics of the mind of the adolescent ? Discuss the importance of Mental Hygiene in adolescence.

9. How do you explain the emotional disturbances that you experienced duridg adolescence ?

10. List as many differences as you can observe between childhood behaviour and adolescent behaviour.

11. Discuss the needs of the adolescent. How can they be satisfied ?

12. Why is adolescence called the period of 'stress & strin' ? How can the adolescent get rid of this stressed condition ?

নবম অধ্যায়

যৌন শিক্ষা

(Sex Education)

যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :—

ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের শান্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যৌন জীবনের সুস্থতা অসুস্থতার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যৌন-জীবন কেবলমাত্র বংশ রক্ষার সঙ্গেই জড়িত নয়—যৌন শক্তি আধুনিক মনঃসমীক্ষণের মতানুসারে যৌন-মানস-শক্তি (Psycho-sexual-energy) বা জীবন শক্তি; সমস্ত কর্ম প্রবাহের অলক্ষ্য উৎস। এই যৌন শক্তির উদ্গমন ও রূপান্তরণের মধ্যেই ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা, শান্তি ও সৌন্দর্য্য নির্ভরশীল। শিল্প-চর্চ্চা, সাহিত্য-প্রীতি, সমাজ সেবা, সঙ্গীত, দর্শন ও ধর্মাচরণ সবই অনেকাংশে যৌন শক্তির উদ্গতির মধ্য দিয়ে ঘটে। জীবনে শিল্প বা জীবনকে শিল্পায়িত করা কখনই সম্ভব নয় যদি যৌন জীবনের মধ্যে শৃঙ্খলা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা না থাকে। পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র যৌন জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে যৌন শক্তির যে সার্থক ব্যবহার হয় তার মধ্য দিয়েই সুস্থ জীবন যাপনের ভিত্তি স্থাপিত হয় ও যথার্থ মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়। প্রাক্ষোভিক (emotional) জীবনের সঙ্গে যৌন-জীবনের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ব্যক্তিত্ব গঠনে যৌন জীবনের সুস্থতা অসুস্থতা বহুলাংশে দায়ী।

যৌন জীবনের বিকৃতি মানসিক বিকৃতি নিয়ে আসে—সমস্ত জীবন ধারার মধ্যে একটা অস্বাস্থ্য ও বিকৃতি আনে। যৌন বিকৃতি ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ জীবনের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে। একদিকে যথার্থ শিক্ষা দ্বারা সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ না ঘটলে ও অন্যদিকে যৌন জীবনের সুস্থতা ও অসুস্থতার নির্ণায়কগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে, ব্যক্তির মধ্যে যৌন বিকৃতি নিয়ে আসতে পারে যা তার মধ্যে কালে নানা প্রকার মানসিক বৈকল্য নিয়ে আসবে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষুণ্ণ করবে।

বিভিন্ন বিকাশ-স্তর ও যৌন-জীবনের বৈশিষ্ট্য :—

যৌন-জীবনের সুস্থতা অসুস্থতার উপর সমাজ জীবনের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য নির্ভর

করে। সমাজে যৌন শৃঙ্খলা না থাকলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবন কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। বিকৃত রুচি, বিকৃত জীবন ধারণ সমাজ সংহতিকে বিনষ্ট করে।

নবযুবকালের প্রধান বিকাশ বৈশিষ্ট্য হল তার যৌন বিকাশ। এই বিকাশকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় পরিচালিত না করা যায় তা হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়—মানসিক স্বাস্থ্যের বিপর্য্যয় ঘটে। ডঃ জোনসের মতে ব্যক্তির এই সময়ে তার শৈশবকালীন যৌন-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাল্যকালীন সময়ের শেষার্দ্ধে (later childhood period) অবদমিত যে সব যৌনস্পৃহা থাকে সেগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সময়ে এই সব যৌন ইচ্ছা আর অবদমিত অবস্থায় থাকে না—পিতামাতা ভিন্ন অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিদের সম্পর্কেও এই সব অবদমিত যৌনেচ্ছা প্রধাবিত হয়। এই পুনরাবৃত্তি তিনটি পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। প্রথম স্তরে থাকে আত্মরতি (auto eroticism)। নবযুবকালে স্ব-কাম (self-love) দেখা দেয় যখন যুবক যুবতীরা গোপনে স্বীয় অঙ্গচর্চ্চাপ্রসাধনে মনোযোগ দিয়ে থাকে। তার পরের পর্য্যায়ে দেখা যায় সমলিঙ্গকাম (Homosexual)। নবযুবকরা যুবকদের সঙ্গে, যুবতীরা যুবতীদের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়, যে বন্ধুত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কামভাবও থাকে। এই সময়ে কাম-শক্তি আত্মগত তৃপ্তি ছেড়ে, বহিরাভিমুখী হতে থাকে। অবশেষে ইতর-রতির (heterosexuality) পর্য্যায় আরম্ভ হয় এবং এই স্তরের কার্য্যকারিতা ও তার বৈশিষ্ট্য সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে ওঠে। যুবকরা যুবতীদের প্রতি ও যুবতীরা যুবকদের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ অনুভব করে।

যৌন-বিকাশের এই তিনটি পর্য্যায় পরপর না এসে এক সঙ্গে বর্তমান থাকতে পারে। এই সময়ে শিক্ষকের একটা প্রধান কর্তব্য যে তিনি শিক্ষার্থীদের যৌন জীবনের উদ্ভাসে যে যন্ত্রণা ও অস্থিরতা দেখা দেয় তাকে অনুধাবন করবেন এবং এই সময়কার যৌন জীবনের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তার মধ্যে যে কোন বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা নেই, সেটা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। আত্মরতি ও সমলিঙ্গতা এই সময়ে বর্তমান থাকলেও যে সেটা বিকৃতি নয়—স্বাভাবিক বিকাশেরই পরিণতি এটা নবযুবকযুবতীদের সম্যকরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই সময়ে নবযুবকযুবতীদের সাথে বয়ঃপ্রাপ্তদের আচরণ যদি নির্দ্দয় হয় তা হ'লে নবযুবকযুবতীদের মধ্যে একটা দিশেহারা ও যন্ত্রণা-কাতরভাব দেখা যায়, এতে মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

নবযুবকালে যৌনতা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে যৌন-শক্তি জীবনের চারিদিক পরিপ্লাবিত করে—এই শক্তিকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে জীবন সুন্দর ও সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। নবযুবকালের শিক্ষার একটা মূল লক্ষ্য হল এই শক্তির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ। পূর্বে এইসব নবযুবকদের কঠিন দৈহিক কাজ ও খেলাধুলার মধ্যে মগ্ন রাখা হত। এর দ্বারা যৌনতার কিছু স্বাস্থ্যকর নিয়ন্ত্রণ হয় বটে কিন্তু এরূপ দৈহিক শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়েই কেবল নবযুবকের যৌন উদ্বেগতা দূর হয় না। যৌনশক্তি মানসশক্তি বিশেষ, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে যৌনশক্তির উদ্গমন ঘটে তার কারণ হল যে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে মানস শক্তির একটা স্বাস্থ্যকর প্রকাশ ঘটে থাকে। যৌনজ অস্বাস্থ্য থেকে মুক্তির পথ হল বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে যৌন-শক্তির উদ্গতি সাধন।

এ প্রসঙ্গে যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। লজ্জা ও কুসংস্কার যৌন বিষয়ে সর্বদা পিতামাতাকে ও বড়দের নিস্তব্ধ করে রাখে এবং এই নীরবতায় নবযুবকযুবতীরা অন্ধভাবে তাদের যৌন-কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে এবং নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর উৎস থেকে এই সব জ্ঞান আহরণ করে পরিণামে নিজেদের ক্ষতি করে। নবযুবকযুবতীদের জীবন সম্বন্ধে অনেক জানতে হবে। যৌন বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান আহরণ করতে হলে শরীর স্থান ও শরীরবৃত্তিক (Physiological) জ্ঞান নবযুবক যুবতীদের পরিচ্ছন্ন উৎস থেকে চয়ণ করতে হবে। বিকৃত কথাবার্তা, যৌন চিত্র ও অসাধু সাহিত্য প্রভৃতি থেকে যে যৌন-জ্ঞান হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণভাবে অস্বাস্থ্যকর ও বিকৃত—এই অস্বাস্থ্যকর যৌন জ্ঞান থেকে পরবর্তী জীবনেও মুক্ত হওয়া কঠিন। সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে একান্তে যৌনবিষয়ক জ্ঞান আহৃত হওয়া সমীচীন। এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত ধর্মিতা নয়, যথাসময়ে পরিষ্কার খোলাখুলি আলাপ আলোচনা হওয়াই স্বাস্থ্যসম্মত।

যৌন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দান সহজ কোন বিষয় নয় এ বিষয়ে সকলেই একমত—কিন্তু ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে এর যে সুদূর প্রসারী প্রভাব তার দিকে লক্ষ্য রেখে, যে কোন বিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে জ্ঞানদান কঠিন নয়। এই সময়ে নব যুবকযুবতীদের মধ্যে সংশয়, সন্দেহের উদ্রেক হয়, এরা এই সময়ে যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত থাকে এ থেকে

মুক্তি দিতে পারে জ্ঞানী ও সহানুভূতিশীল কতিপয় ব্যক্তি যাঁদের যৌন বিষয়ে বিজ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞানদানের ক্ষমতা রয়েছে। অনেক যুবকযুবতীই এই সময়ে তাদের দেহে ও মনে কি পরিবর্তন হচ্ছে এ সম্পর্কে সঠিক বুঝতে পারে না, ফলে একটা শঙ্কা ও আচ্ছন্নভাবের দ্বারা আবিষ্ট থাকে—কখনো নিজেদের বিকৃত বা রোগগ্রস্ত মনে করে। যৌন বিষয়ক জ্ঞানদানে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হোল সেটা বড় কথা নয়—জ্ঞানদাতার সহানুভূতি ও খোলামন এ বিষয়ে যথার্থ উপকার করতে পারে। নব যুবক-যুবতীদের কাছে এ ভাবনাটাও অনেকটা স্বস্তির কারণ যে তাদের মত যন্ত্রণা মনোকষ্ট ও ক্ষণে ক্ষণে অপসঙ্গতি তাদের সমবয়সী প্রায় সকলের মধ্যেই আছে এবং একজন সহৃদয় বয়স্ক ব্যক্তি তাদের এ যন্ত্রণা ও দুঃখ বোঝার চেষ্টা করছে।

যৌন-শিক্ষা বলতে বস্তুত কি বোঝায় ?—

যৌন শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বজন স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা এখনও নির্দিষ্ট নেই, ফলে যৌন শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও অনেক বিরোধ ও অস্বচ্ছ ধারণা বর্তমান। কারো কাছে এটা হচ্ছে শিশুদের নিকট স্ত্রী ও পুরুষ যৌন অঙ্গের বৃত্তান্ত সহ জন্ম-চক্র বিবৃত করা। কারো নিকট আবার যৌন শিক্ষা হল বালক-বালিকা হিসাবে বিকাশ বৃদ্ধির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—কারো নিকট নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের বিকাশ এবং এই বিকাশ নবযুবক-যুবতী ও স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কি ভাবে পরিবর্তন আনে, প্রাক-বিবাহিত ও বিবাহিত জীবনের সমস্যার সঙ্গে কিভাবে সঙ্গতি রক্ষা করা যায়, এসব সমস্যার উপায় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানদানই যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য।

যৌন শিক্ষা কেবলমাত্র মৌখিক জ্ঞানদান নয়, যৌন শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নীরবে ভাবের আদান-প্রদানও হয়ে থাকে—শিক্ষকের নিজের যৌন বিষয়ক যে ধারণা ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর মধ্যে তার নিরুচ্চার সঞ্চরণ হয়। যৌন জীবনকে স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণকর করে তুলতে হলে কি করা উচিত, যৌনবিষয়ে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য। এইদিক থেকে যৌন শিক্ষা একটা ক্রমাগত ভাষিক (verbal) ও অভাষিক (non-verbal) ভাব দান, যা শিক্ষার্থীর চেতন ও অবচেতন মনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পরিবর্তন আনে। যৌন জীবনের সাথে আবেগগত জীবনের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, ফলে যৌন জীবনের বিকৃতি বা অস্বাস্থ্য আবেগগত

জীবনের সুস্থতা হানি করে, ব্যক্তিত্ব বিকাশকে ব্যাহত করে। সেইজন্য সংযম রক্ষা, দৈহিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশোপযোগী শৈশবকালীন পরিবেশ, বন্ধু-বান্ধবের সাথে যথাযথ ভাবে মেলামেশা করা, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর মনোভঙ্গী সৃষ্টি করতে পারে এমন সব বিষয়বস্তু যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত।

মোটামুটি ভাবে যৌন শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে—

(১) যৌন সম্বন্ধে শরীরগত (anatomical) ও শরীরবৃত্তগত (physiological) জ্ঞান।

(২) যৌন সম্পর্কে এবং তাকে কেন্দ্র করে যেসব সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে, সে সম্বন্ধে সুষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ সাধন।

যৌন বিষয়ে শিক্ষা-দাতা :—

প্রত্যেক শিশুই যখন বড় হতে থাকে তার যৌন শিক্ষা কোন না কোন ভাবে ঘটে। শিশুর এ শিক্ষার স্বরূপ কি ? কার কাছ থেকে এ শিক্ষা আরম্ভ হয় ?

শিশু তার পিতামাতার এ বিষয়ে জ্ঞান ও প্রতিন্যাসের (attitude) দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়। এছাড়া শিশুর ও নব যুবক-যুবতীদের সাথে যেসব ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট তাদের, নারী ও পুরুষদের কাজকর্ম ও আচরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাব ও জ্ঞান শিশু ও নব যুবক-যুবতীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অনেকে যৌন বিষয়কে জীবনের আর সব বিষয় থেকে আলাদাভাবে দেখে এবং অবচেতন মানসে যৌন বিষয়ে একটা ভয় থাকে—এই ভয় অনুচ্চারিত ভাবে নবযুবকদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়—এ ভাবে যৌন বিষয়ে একটা অস্বাস্থ্যকর ভয় ও শঙ্কা নব যুবক-যুবতীদের আছন্ন করে ফেলে ও যৌন বিষয়ে অসুস্থ প্রতিন্যাসের সৃষ্টি হয়।

যৌন বিষয়ে সুস্থ মনোভঙ্গী গঠনের জন্য জ্ঞানের প্রকার :—

যৌন বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে জ্ঞান প্রদত্ত হচ্ছে, সেটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে কেননা জ্ঞান দানের পদ্ধতি, কেবলমাত্র জ্ঞান অপেক্ষা যৌন বিষয়ে প্রতিন্যাস সৃষ্টিতে অধিকতর প্রভাবশালী।

এটা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে তার পিতামাতা যৌন বিষয়ে সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং শৈশবে ও নবযুবকালে যৌন কৌতূহলকে স্বাস্থ্যকর তথ্য পরিবেশন করে পরিতৃপ্ত করবেন।

শিশু পরিবারে ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজনের পোষাক পরিচ্ছদ পরা, স্নানকরা প্রভৃতি দেখে ও তার মধ্য দিয়ে যৌন পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখে। সে নিজে কোন দলভুক্ত সেটাও বোঝার চেষ্টা করে। তিন বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময়ে, শিশু নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ করে এবং সে যে নিজে ভাল করে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া ও খেতে শেখার আগে মাতৃগর্ভেই বড় হয়েছে এ জেনে পরিতৃপ্তি বোধ করে। কোন প্রাণীর জন্ম বৃত্তান্ত দেখে শিশুর এ বিষয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে শিশু জানতে চায় মাতৃ জঠর থেকে সে কিভাবে এ পৃথিবীতে এসেছে এবং তার জন্ম বৃত্তান্তে তার পিতার ভূমিকাই বা কি। এই সময়ে পিতামাতা এবং শিশুর ঘনিষ্ট শিক্ষক শিশুকে এ বিষয়ে সহজ ভাষায় আলোকিত করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

পিতামাতা ও শিক্ষকদের নবযুবকালের আগমনে নবযুবকযুবতীদের দেহে, মনে ও মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ করে, তাঁদের জানতে হবে যে, মেয়েরা ছেলেদের দু তিন বৎসর পূর্বেই নবযুবকালে পৌঁছে যায় এবং ছেলেদের থেকে সবদিক দিয়েই মেয়েরা সম্ভবত বেশী পরিপক্কতা লাভ করবে, যে সময়ে মেয়েদের নবযুবকালীন বিকাশধারা নিম্নগামী হবে, ছেলেদের বিকাশধারা তখনই দ্রুতভাবে হবে এবং মেয়েদের বিকাশ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরও কয়েক বৎসর ধরে ছেলেদের এই দ্রুত বিকাশ চলতে থাকবে, পরিণামে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে আকৃতিতে প্রায়ই বড় হয়ে থাকে। যেসব মেয়েরা সকাল সকাল দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যেসব ছেলেরা একটু বেশী বয়সে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাদের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা উচিত কেননা এই অস্বাভাবিকতা তাদের নারীত্ব বা পৌরষ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসুস্থ ধারণার উদ্রেক ঘটাতে পারে।

নবযুবকালে ছেলে ও মেয়েদের এ সত্যটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে যৌনচেতনা এক সময়ে আসে না ; সাধারণত মেয়েদের যৌনচেতনা কিছুটা বিলম্বে আসে এবং এই চেতনা কিছুটা ব্যপ্ত, ছেলেদের যৌনচেতনা সেখানে কিছু পূর্বেই দেখা দেয় এবং এ চেতনা যৌনলিঙ্গের উপর বেশী নিবদ্ধ থাকে। এই সময়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে নবযুবকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের তাৎপর্য্য কি—এবং এইসব পরিবর্তনকে

কিভাবে সুস্থধারায় নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে নিছক যৌনাকাঙ্ক্ষাকে প্রেমাকাঙ্ক্ষা বলে ভুল করে এই সময়ে নব যুবকযুবতীরা কিভাবে না বুঝে সুঝে বিবাহাদি ঘটিয়ে ফেলতে পারে যা পরিণামে অস্বাস্থ্য ও অশান্তি নিয়ে আসে এ বিষয়ে নব যুবকযুবতীদের বুঝিয়ে দেওয়া সমীচীন। এদের বুঝিয়ে দিতে হবে অন্ধ কামার্ততা, রূপজ আকর্ষণ এবং পরিণত প্রেমাকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য কোথায়—বিবাহিত জীবন সার্থক করে তুলতে হলে প্রথম থেকেই কামজ ইচ্ছাকে কিভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করা সমীচীন সে বিষয়েও শিক্ষাদান প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সাথে পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী ও সংহত ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিভাবে মুখোমুখী হওয়া যায় এবং স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ ভূমিকা কি, তাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ ও তাকে উন্নত করার উপায় সম্পর্কেও শিক্ষাদান যৌন-শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

যৌনশিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশ ঃ—

যৌন বিষয়ে সন্তানদের মধ্যে সুস্থ প্রতিন্যাস সৃষ্টির জন্য, পিতামাতার নিজেদের যৌন বিষয়ে সুস্থ মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। পিতামাতার শৈশবকালীন ও নবযুবকালীন অভিজ্ঞতা যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, যৌন বিষয়ে যদি তাদের একটা অবচেতন ঘৃণা ও লজ্জা থাকে, যদি তাদের যৌনজ্ঞানের উৎস বিকৃত হয়, তাহলে এইসব বিকৃতি বয়ঃপ্রাপ্তকালে তাদের মানসিকতার মধ্যে যৌনবিষয়ে অসুস্থ ও বিকৃত প্রতিন্যাসের সৃষ্টি করে—এবং পরবর্তীকালে পিতামাতা হিসাবে তাদের সন্তানদের মধ্যেও এই বিকৃত প্রতিন্যাস সংক্রামিত হয়। কাজেই প্রথমতঃ পিতামাতার কর্তব্য হবে যৌন বিষয়ে সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

যৌন শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে হবে। অধিকাংশ ব্যক্তিই 'লিঙ্গ' শব্দটি কেবল শরীরবৃত্ত ও শরীরস্থানের পটভূমিতে বিচার করে থাকে। নারী ও পুরুষের পার্থক্য নির্ণায়ক হিসাবে লিঙ্গকে দেখে থাকে। কিন্তু লিঙ্গ বা যৌনের অর্থ যে আরও ব্যাপক এ বিষয়ে পিতামাতাকে সমূহ সচেতন হতে হবে।

নারী পুরুষের ভালবাসা ও প্রেমের উৎপত্তি যৌন বিকাশ থেকেই হয় এবং এ থেকেই পারিবারিক জীবনের উৎপত্তি। সমস্ত পারিবারিক শান্তি ও সুস্থতা নির্ভর করে পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ওপর—এমনিতর পরিবেশই বিকাশোন্মুখ শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

কাজেই পারিবারিক পরিবেশের একটা প্রধানতম নির্ণায়ক হল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—যে সম্পর্ক নির্ভর করে সুস্থ যৌন জীবনের উপর। এই দিক থেকে যৌন জীবনের কার্যকারিতা সুদূর প্রসারী।

যৌনজ প্রেম ও ভালবাসা থেকেই শিল্প সৃষ্টি, কাব্য, সঙ্গীত, ছবি ও নৃত্যকলার সৃষ্টি। এ ছাড়া অনেক মহৎ কাজের উৎসও এই যৌন-শক্তি। বিজ্ঞানচর্চা, ধর্মাচরণ এ সমস্ত কিছুর মূলেই যৌনশক্তির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও উদ্গমন কাজ করে।

আবার যৌন শক্তির অপচিতি ও অপব্যবহার কিভাবে জীবনে অসুখ ও অশান্তি নিয়ে আসে; যৌন বিষয়ে অজ্ঞানতা, বিকৃত জ্ঞান, বা যৌন বিষয়কে জীবনের আর সব দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা, এই সব অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই যৌন জীবনে নানা প্রকার বিকৃতি আসে—ব্যক্তি যৌন বিষয়ে হয় ব্যভিচারী হয়ে ওঠে, নয় যৌন শক্তির অতি অবদমনের ফলে নানাবিধ মানসিক রোগের উদ্রেক ঘটায়। যৌন শক্তির সার্বিক তাৎপর্য সহজ সরল ভাষায় সন্তানদের বুঝিয়ে দেওয়া পিতামাতার একটা কর্তব্য। কিন্তু অনেক পিতামাতাই যৌন বিষয়ে তাদের সন্তানদের সঙ্গে আলোচনায় ব্রতী হতে চান না, অথচ এঁরাই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নানা প্রকার অশ্লীল গল্প ও যৌন বিষয়ে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। অবচেতন মনে এঁদের যৌন বিষয়ে একটা অপরাধবোধ ও লজ্জা জড়িত ভাব থাকে—অবচেতন মানসের এইরূপ বিকৃতভাব পিতামাতার শৈশবকালীন পারিবেশিক প্রভাবের ফল; কাজেই পিতামাতার প্রথম কাজ যৌন বিষয়ে নিজেদের মনোভঙ্গীকে স্বাস্থ্যকর করা—এ জন্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পিতামাতাদের জ্ঞান সঞ্চয় করা সমীচীন।

এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শিশুর যৌন শিক্ষা একটা একক ঘটনা নয়। তার যৌন বিষয়ে প্রবিন্যাস, পরবর্তীজীবনে যৌন বিষয়ে সংযম শিক্ষা কেবল যৌন শিক্ষার মধ্য দিয়ে হয় না—তার বিকাশ পর্বে যে সব পারিবেশিক শক্তি কাজ করে, তার সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুর যৌন জীবনকে প্রভাবিত করে। কাজেই যৌন শিক্ষার সঙ্গে পারিবারিক সমগ্র পরিবেশকেই পর্য্যালোচনা করে দেখতে হবে।

(ক) **পারিবারিক সম্পর্ক**—যদি কোন পরিবারে শিশু দেখে যে পিতা মাতাকে কেবলমাত্র পরিচারিকারূপে বা দাসীরূপে ব্যবহার করে এবং পিতার

যে কোন প্রকার নির্দেশ মাতাকে একবাক্যে পালন করতে হয়, যদি সে দেখে যে সব বিষয়েই বোনদের প্রতি ভাইদের তুলনায় বিরূপ ব্যবহার করা হয়, তা হলে তাদের মধ্যে এ ধারণাটা বদ্ধ হয়ে যায় যে স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব কেবলমাত্র পুরুষদের সুবিধা ও আরামের জন্য। এরূপ ধারণা নিশ্চিতরূপে শিশুদের পরবর্তী যৌনজীবনে সুস্থতা আনে না। এ সব ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যেও পুরুষজাতি সম্পর্কে একটা ক্ষোভের ভাব জন্মে—পুরুষদের যে কোন উপায়ে বশে রাখা ও সুযোগ পেলেই অপমানিত করার একটা প্রবণতা পরবর্তী জীবনে এদের মধ্যে দেখা যায়।

প্রত্যেক গৃহে নারীপুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। ছেলে-মেয়েরা পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করবে। পিতামাতা যদি নিশ্চিতরূপে ছেলে কিংবা মেয়ে এককভাবে পছন্দ করেন এবং সংসারে যাদের কেবল মেয়ে হয়েছে তারা ছেলের জন্য ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন, অথবা যাদের কেবল ছেলে আছে তারা মেয়েদের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেন, এমনি সব ক্ষেত্রে মেয়েরা পিতামাতার ভালবাসা ও মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছেলেদের মত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, আবার ছেলেরা বাবা মার মন পাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব মেয়েদের মত আচার আচরণ করতে থাকে। পরবর্তী জীবনে এর পরিণাম দেখা দেয় স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনের বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে এবং কখনো কখনো বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতেই এরা নানারূপ ভয় পায়।

(খ) **সংযম শিক্ষা**—যৌন-সংযম সম্ভব হয় না, যদি শিশুদের মধ্যে অন্য বিষয়ে সংযম শেখানো না হয়। যে শিশুকে পিতামাতা সর্বদা আহ্লাদ দেয় এবং সে যা চায় তাই দিয়ে থাকে—সেরকম শিশুর পক্ষে যৌন-তাড়নের মত প্রবল তাড়নাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আত্ম-সংযম অভ্যাস করা সম্ভব নয়। পিতামাতার অত্যন্ত আদর পেয়ে পেয়ে যে সব শিশু পরবর্তী জীবনে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাতে থাকে তাদের সম্বন্ধেই পিতামাতা শেষকালে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। শিশুদের সর্বদাই সহিষ্ণু হতে, অপরের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে এবং প্রয়োজন হলে তার জন্যে আত্ম-সুখ বিসর্জন দিতে শেখাতে হবে। পরার্থে আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা তাদের যৌন বিষয়েও এমন একটা মনোভঙ্গীর সৃষ্টি করবে যা যৌন-জীবন ও বিবাহিত সম্পর্ককে পরবর্তী-কালে সুন্দর ও সুষম করে তুলবে।

(গ) **আনন্দানুষ্ঠান**—যৌন বিষয়ে মাত্রাধিক ও অকাল চিন্তা থেকে

বিরত করার জন্য শিশুকে সর্বদা তার আত্ম-শক্তি-বিকাশমূলক কর্ম-প্রকল্পে নিযুক্ত রাখতে হবে ; খেলাধুলা ও অন্যান্য আনন্দকর ও শিক্ষাকর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অবসর যাপনকে মুখরিত করে তুলতে হবে। শিশুর শক্তি যদি সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে নিছক দৈহিক যৌনতার মধ্য দিয়ে তার শক্তি অপচিত হতে পারে না।

নবযুবকালে যৌন চেতনার উন্মেষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সিনেমায় যাওয়াটা এই সময়ে একটা রেওয়াজ। সব চিত্র এই সময়ে নবযুবক যুবতীদের উপযোগী নয়—অনেক ছবি এদের মধ্যে যৌন বিকৃতি আনে, কখনও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অকাল যৌনতার প্রাদুর্ভাব ঘটায়। বড়দের জন্য যে ছবি অত্যন্ত ভাল, সেই ছবিই ছোটদের জন্য ভাল নাও হতে পারে। কোন ছেলে বা মেয়ে যদি অল্প বয়স থেকেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে যৌনবিষয়ক সিনেমা (যাতে অধিককাল ধরে আলিঙ্গন চুম্বন ও অন্যান্য যৌন ক্রিয়াদি থাকে) দেখে, তাহলে এই সব ছেলে মেয়ের মধ্যে অকালে যৌন-চেতনা আন্দোলিত হতে থাকে এবং বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক দিক থেকে যৌন সাড়া দিতে আরম্ভ করে, এ থেকেই পরে এদের মধ্যে যৌন-স্খলন আরম্ভ হয়। কাজেই শিশুদের উপযোগী নয় এমন কোন চলচ্চিত্র শিশুদের দেখা সমীচীন নয়। এ বিষয়ে শিশু চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়—যার মধ্য দিয়ে শিশুরা নির্মল আনন্দ পেতে পারে।

(ঘ) সামাজিক মেলামেশা :—

বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব পর্য্যন্ত যখন ছেলেমেয়েরা মেলামেশা করবে তাদের মধ্যে কোন প্রকার যৌন পৃথকীকরণ করা উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলা করবে। শৈশব ও বাল্যকালে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয় তা অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু বন্ধুত্বের সৌন্দর্য ও অকৃত্রিমতা অনেক পরিমাণে ম্লান হয় যদি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছেলেমেয়েদের এই সরল সহজ মেলামেশাকে বিকৃতভাবে দেখে ও এ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের সামনেই নানাপ্রকার অশালীন মন্তব্য করেন এবং তাদের মধ্যে যে যৌনগত পার্থক্য রয়েছে সে সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। এ থেকে তাদের মধ্যে লজ্জা আসে ও পরস্পর মেলামেশার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। মোটের উপর শিশুদের যতদিন সম্ভব মনের দিক থেকে শিশুই থাকতে দেওয়া উচিত।

একটা সময় স্বাভাবিকভাবেই আসবে যখন ছেলেমেয়েরা যৌন-চেতনা অনুভব করবে—কিন্তু এই চেতনা যাতে কোন প্রকারেই অকালে না আসে, সেদিকে পিতামাতা ও বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তিদের সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শৈশবকালে ছেলেরা ছেলেবন্ধু, ও মেয়েরা মেয়ে বন্ধু পেতে চায়, কিন্তু ছেলেদের মেয়েদের সাথে মেশা, আবার মেয়েদের ছেলেদের সাথে সহজ সরলভাবে মেশার সুযোগও থাকা চাই। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে সর্ব পর্য্যায়েই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি স্বাস্থ্যকর মেলামেশা না থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে সঙ্গতি বিধানে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

(৬) **দৈহিক যত্ন ঃ—**

শিশুদের দৈহিক প্রযত্ন প্রয়োজন। তাদের সুষম পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে এবং অধিক আহারে যাতে অভ্যস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শয্যা যেন খুব কোমল বা খুব কঠোর না হয়। সকালে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরও বিনা কাজে ছেলেমেয়েদের বিছানায় থাকতে দেওয়া উচিত হবে না। খেলাধুলা ও দৈহিক কাজ-কর্মে উৎসাহ দিতে হবে কেননা এর দ্বারা ছেলেমেয়েদের অসুস্থ যৌন-কল্পনা আসতে পারবে না। খেলাধুলা ও শরীর চর্চা যেন মাত্রাধিক না হয় ও এ যেন জোর করে ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়—অনেক ছেলে মেয়ে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা অপেক্ষা অন্য সৃষ্টিশীল কাজে বেশী আনন্দ পায়।

বিদ্যালয় ও যৌনশিক্ষা ঃ—

অনেক বিদ্যালয়ই যৌন-শিক্ষা বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে—এই সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বিদ্যালয় যৌন-শিক্ষার স্থান নয়। কোন কোন কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে সিডোনাই গ্রুয়েনবার্জের মানব জন্মের বৃত্তান্ত গল্পাকারে শিশুদের সামনে পাঠ করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানব জীবনের আরম্ভকাল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও তাদের পিতামাতাদের এক সঙ্গে দেখানো হয়, এতে পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভাব ও জ্ঞানের অংশীদার হতে উৎসাহিত বোধ করে। কোন কোন বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'মলি বড় হচ্ছে' এই মর্মে সিনেমা দেখানো হয়—এতে থাকে মেয়েদের রজঃ সৃষ্টির ঘটনা এবং এর সঙ্গে দেখানো হয় 'মানব বিকাশ' সংক্রান্ত চলচ্চিত্র, যার মধ্যে মানব উৎপাদনের বিবরণ থাকে। এটা

ক্রমশঃই অনুভব করা গেছে যে, শিশুদের জুনিয়ার হাইস্কুল স্তরে পৌছাবার পূর্বেই অর্থাৎ যৌনচেতনা আসার পূর্বেই ও যৌন বিষয়ে সজ্ঞান কৌতূহল প্রকাশের পূর্বেই, এই সব বিষয়ে জ্ঞানদান করা সমীচীন।

স্বমেহন প্রভৃতি বিষয়ে যৌথ আলোচনা ও বিচার বিবেচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ছাড়া বালবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রভৃতি দেখিয়ে ও এ সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করেও এ সময়কার যৌন-সমস্যার নানাবিধ সমাধানের পথ দেখানো যায়। সার্থক ও অসার্থক বিবাহিত জীবনের জন্য কি কি গুণ-দোষ কত পরিমাণে দায়ী এ সব বিষয়েও পুস্তকাদি ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাছে এনে দিতে হবে। এছাড়া রজঃসৃষ্টির বৃত্তান্ত, মেয়েদের দৈহিক পরিবর্তন ও এর সঙ্গে মাতৃত্বের সম্বন্ধ এসব বিষয়েও ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে জ্ঞানদান প্রয়োজন, যাতে এইসব ঘটনাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকর দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্ররা বিচার করতে শেখে।

যৌন-শিক্ষা মূলতঃ সুস্থ বিবাহিত জীবনের প্রস্তুতিপর্ব এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে একটা নীতি ও শালীনতা বজায় রেখে চলার শিক্ষা। এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস, কবিতা ও নাটক প্রভৃতি বিষয় থেকে শিক্ষক তথ্য সংগ্রহ করে ছাত্র ছাত্রীর মানস-লোক উন্নত ও পরিশীলিত করতে পারেন ; শ্রেণীর ছাত্ররা যখন যৌন-শিক্ষা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করবেন তখন মহৎ লেখকদের সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, সমাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের মননে তাদের সমস্যাকে বিশ্লেষিত করে দেখাবেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব এমন উন্নত ও মার্জিত হবে যে সেই পরিবেশ ছাত্রদের মধ্যে একটা উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচির উন্মেষ ঘটাবে। বৃহত্তর পটভূমিতে নরনারী সম্পর্কের মধ্যে নিস্বার্থপরতা, সত্যাচার, মহৎ অনুভূতি আনয়নই যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য। কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ যৌনবিষয়ক জ্ঞানদানই বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য নয়, কাজেই বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষার পাঠক্রম একদিক যেমন যৌন-বিষয়ে শরীরবৃত্তগত পরিবর্তন ও তার কারণ, যৌন বিকার ও তার কুফল সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান হবে—অন্যদিকে মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে প্রেম প্রীতি ও নিস্বার্থপরতা আছে সে সম্পর্কেও ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে হবে। ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রীতিপূর্ণ মনোভঙ্গীর সৃষ্টি ও পরবর্তীকালে দাম্পত্যজীবনকে সুন্দর ও মহিমামণ্ডিত করার জন্য স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য

সম্পর্কেও ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে হবে। এছাড়া খেলাধুলা, শিল্পচর্চা, সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস, ভ্রমণ ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাদির যথাযথ ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখতে হবে। এ সব বিষয়ে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে—যৌনশক্তির সার্থক উদ্‌গতি সম্ভব হবে।

অনুশীলনী

1. Write an essay on Sex Education.
2. Discuss the place of sex education in the school curriculum. How should it be imparted to the children ?
3. Critically discuss the importance of sex education in the life of the adolescent. Formulate a comprehensive programme of sex education for the adolescent.
4. Write with your own comments about the uses and the abuses of sex-education.

দশম অধ্যায়

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা

(Problem Behaviour and Delinquency)

সমস্যামূলক আচরণের স্বরূপ :—

ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা এখন একটা বহু আলোচিত সমস্যা। বিদ্যালয়ে ছাত্ররা নিয়ম শৃঙ্খলা আর আগের মত মানছে না, এ রকম একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়—তা ছাড়া পরীক্ষার হলে চেয়ার-টেবিল ভাঙ্গাচোরা, এরকমের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা সকলেই অবহিত। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিদ্ ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার সমস্যাটিকে নানাদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়াস করছেন। এ রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ছাত্ররা কেন করে? এর যথার্থ কারণগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। ছত্রেদের আচরণ যদি বিদ্যালয় ও সমাজ প্রেক্ষিতে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তা হলে নিশ্চয়ই সেটা বিদ্যালয় ও সমাজের পক্ষে একটা সমস্যা, কেননা কতিপয় ছাত্রের এরূপ আচরণ শ্রেণী-কক্ষের, বৃহত্তরভাবে সমগ্র বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করে ; গৃহেও যদি কোন ছেলের আচার আচরণ অস্বাভাবিক ও বিকৃত প্রকৃতির হয় তা হলে সার্বিক গৃহ পরিবেশের সুস্থতা ও শান্তি বিঘ্নিত হয়। কাজেই এ দিক থেকে সাধারণভাবে উচ্ছৃঙ্খল আচরণকেই সমস্যামূলক (problem behaviour) আচরণ বলা যেতে পারে। তাছাড়া এসব আচরণ পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট একটা গভীর সমস্যারূপে দেখা দেয়।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :—

কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিচারে, সমস্যামূলক আচরণ হল একটি পরিণতি, কারণ আচরণকারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ধারায় হয়নি, ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায়ের কোন না কোন স্তরে তার কোন না কোন প্রকার জটিলতা বা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং এর পরিণতি হিসাবেই উচ্ছৃঙ্খল বা সমস্যামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। কাজেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, সমস্যামূলক

আচরণ হল, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ পর্য্যায়ে সমাজীকরণের (socialization) জন্য যে সব অন্তর্জাত ও বহির্জাত প্রভাব ক্রিয়ারত, তার কোনটির অভাব বা বিকৃত কার্য্যকলাপ থেকে উদ্ভূত।

সাধারণ ধারণা হল, উচ্ছৃঙ্খল আচরণই অসামাজিক আচরণ বা এমন একটা বিকৃত আচরণ, যা পরিবার ও সমাজের আচরণের যে বিধিবদ্ধধারা, তার বহির্ভূত। মনস্তাত্বিক দিক থেকে এ আচরণকে বলা হবে সংলক্ষণ পূর্ণ আচরণ (symptomatic act) বা বিকৃত উপায়ে পরিবার ও সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়াসপূর্ণ আচরণ (pseudo-adjustive act)। দৈহিক রোগ হলে যেরূপ রোগীর মধ্যে কতকগুলি রোগের সংলক্ষণ বা অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায়, যেমন, দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে নানা প্রকারের বিকার দেখা দেয়, অনেক সময় আবোল তাবোল বকে, ঠিক সেই রকম, মানসিক কোন প্রকার বিকৃতি হলে, ব্যক্তি নানাপ্রকার বিকৃত আচরণ করে (symptoms)। মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতাই সমস্যামূলক আচরণ এবং দুষ্ক্রিয়তার কারণ। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, তার নিজের কাছেও কিন্তু এরূপ আচরণ একটা সমস্যা। তার সমস্যা হল যে, তার ব্যক্তিত্ব সুস্থধারায় বিকাশ লাভ করছে না—বাইরের অবাঞ্ছিত প্রভাব তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি অবাঞ্ছিত চেহারা নিয়ে এসেছে, যে সে তা দিয়ে যথার্থভাবে পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। সে নানা কৌশল অবলম্বন করে অস্বাভাবিক পথে সমাজ-পরিবার-পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থতা ও হতাশার সম্মুখীন হচ্ছে (Pseudo-adjustive behaviour)।[১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যামূলক আচরণ আমরা কোন্ কোন্ আচরণকে বলবো? উচ্ছৃঙ্খল আচরণই কি কেবল সমস্যামূলক আচরণ? যে সব ছেলে মেয়েরা সমস্যামূলক আচরণ করে থাকে তাদের আমরা বিপথগামী ছেলে মেয়ে বলতে পারি। যাদের মধ্যে বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, তারাও একদিক থেকে সমস্যাকারী শিশু—কেননা বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু তারা এমন সব আচার আচরণ করে থাকে, যাকে আমরা সমস্যামূলক আচরণ বলতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ এসব

*১। 'The complaint behaviour or problem behaviour or symptom, is the expression of the underlying problem and represents an unacceptable or inadequate solution to difficulties in adjustment'—Loutitt, C. M.: Clinical psychology of Exceptional Children.

ছেলেমেয়েদের আমরা পশ্চাদ্গামী (Backward or subnormal) শিশুই বলে থাকি, বিপথগামী (problem) শিশু বলি না। যাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, বিশেষ করে প্রক্ষোভগত বিকাশ (emotional development) ও সমাজগত বিকাশ (social development) বিকৃত ধারায় হয়েছে অর্থাৎ যারা অসুস্থ ও বিকৃত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (abnormal, তাদেরকেই আমরা বিপথগামী শিশু (problem children) বলে থাকি।

পিতামাতা, শিক্ষক ও মনশ্চিকিৎসকগণ সমস্যামূলক আচরণের স্বরূপ এবং এর গুরুত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। শিশুদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দৈনন্দিন যোগাযোগ রক্ষা করে যাঁদের চলতে হয়, যেমন পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষিক, তাঁরা মনে করেন যে, সেই আচরণকেই সমস্যামূলক আচরণ বলা হবে, যে আচরণ তাঁদের কর্তৃত্ব, নির্ধারিত আদর্শ ও কর্মতালিকাকে অগ্রাহ্য করে খেয়াল খুশী মত চলে। কিন্তু মনশ্চিকিৎসক, যাঁরা শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়, তাঁদের কাছে উপরোক্ত প্রকারের আচরণ ভিন্ন আরও কতকগুলি আচরণ আছে, সমস্যামূলক আচরণ হিসাবে যার অনিষ্টকারিতা ও বিপজ্জনকতা আরও অধিক। এঁদের মতে, অত্যধিক বশংবদভাব, বা নূতন কোন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, অস্বাভাবিক ভয় ও দুশ্চিন্তা, সবসময় জড়সড় হয়ে থাকা প্রভৃতি আচরণ সমস্যা-মূলক আচরণের পর্য্যায়ে পড়ে।

সমস্যামূলক আচরণের প্রকার :—

বিপথগামী শিশুদের বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে শ্রেণীকরণ (classifications) করার চেষ্টা করেছেন। সিরিল বার্ট (Burt, C.) এদের প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন (১) আক্রমণধর্মী সমস্যামূলক শিশু (Aggressive type) (২) চাপা ও অত্যধিক শঙ্কাপরায়ণ (Repressed type) সমস্যামূলক শিশু। আক্রমণর্ধী বিপথগামিতা সাধারণত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাদের প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাব (Negativism), যে সকল নিয়মশৃঙ্খলা পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে বর্তমান, সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা (Obstinacy), সম্পত্তি ও মূল্যবান জিনিষপত্র ভাঙ্গাচোরা (destructiveness), মারধরকরা (assault), চুরি করা (Stealing), না বলে কয়ে বিদ্যালয় বা বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া (Truancy), সহপাঠীদের সাথে সর্বদা ঝগড়াবিবাদ করা

(quarrelling), বিকৃত যৌন আচরণ (sex offences) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

চাপা ও শঙ্কাপরায়ণ সমস্যামূলক (repressed type) আচরণের অন্তর্ভুক্ত হল অত্যধিক ভয় (excessive fear), দুশ্চিন্তা পরায়ণতা (excessive anxiety), বিছানায় প্রস্রাব করা (Enuresis), অনিদ্রা (Insomnia), অত্যধিক বশংবদ(submissive) হয়ে যাওয়া, নূতন কোন পরিস্থিতি থেকে গুটিয়ে নেওয়া (withdrawal), পাঠবিষয়ে অমনোযোগিতা (Absentmindedness) প্রভৃতি।

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার সম্বন্ধ :—

এই সব সমস্যামূলক ও বিপথগামী আচরণের সাথে দুষ্ক্রিয়তার (delinquency) সম্বন্ধ কি ? সমস্যামূলক আচরণকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা থেকে বলা যেতে পারে যে, দুষ্ক্রিয়তা সমস্যামূলক আচরণেরই একটা দিক। আক্রমণধর্মী সমস্যামূলক আচরণগুলি যখন আইনের আওতায় আসে এবং দেশজ আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বলে সাব্যস্ত হয় তখনই আমরা সেইসব আচরণকে দুষ্ক্রিয় আচরণ (delinquency) বলে আখ্যায়িত করি। তা হলে তরুণকালীন সেইসব অস্বাভাবিক আচরণকেই দুষ্ক্রিয় আচরণ বলা যায়, যা যথার্থভাবে পরিদৃষ্ট হয় (overt) এবং যে সব আচরণ সামাজিক দিক থেকে বিধি বহির্ভূত, সামাজিক শান্তি ও সমতা নষ্টকারী এবং তদুপরি দেশের বিধিবদ্ধ আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বলে নির্দিষ্ট। বস্তুতঃ শৈশবে ব্যক্তিত্ব বিকাশ-স্তরে যদি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধ এসে ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বিকৃত ও পঙ্গু করে রাখে, তাহ'লে নানাপ্রকার অপসঙ্গতি মূলক আচরণের উদ্ভব ঘটে—এইসব অপসঙ্গতি দূরীকরণের জন্য যদি প্রথমাবস্থাতেই মনোযোগ না দেওয়া যায়, তাহলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বের বিকৃতি ও অসুস্থতা এমন হয় যে, এইসব ছোটখাট অপসঙ্গতি থেকেই নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয় আচরণ (delinquent behaviour) দেখা দেয়।

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সমস্যামূলক আচরণের সাথে দুষ্ক্রিয় আচরণের কোন তফাৎ নেই—সাধারণভাবে, অপরাধমূলক আচরণ সমস্যামূলক আচরণেরই একটা দিক। কেবলমাত্র দেশের প্রচলিত আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দুষ্ক্রিয় শিশুদের অন্যান্য সমস্যামূলক আচরণকারী শিশুদের থেকে আলাদা করে দেখা হয়।

তরুণকালীন দুষ্ক্রিয় আচরণ :—

দুষ্ক্রিয়তা (delinquency) শব্দটির দ্বারা আমরা বুঝি কর্তব্যকর্মে অবহেলা বা কোন প্রকার দুষ্ক্রিয় কাজ—কিন্তু এ শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর দ্বারা আমরা কেবল শিশু ও তরুণদের (৭—২১ বৎসর) "আইনে দণ্ডনীয়" দুষ্ক্রিয় কর্মকেই বুঝি। একজন বয়স্ক দুষ্কৃতকারীকে আমরা delinquent বলে বুঝি না। দুষ্ক্রিয়তার (Juvenile delinquency) সম্পূর্ণ সমস্যাটি উদ্ভূত হয়েছে এই জন্য যে, সামাজিক ও ব্যবহারিক দিকে থেকে অল্পবয়স্ক দুষ্কৃতকারীদের সাথে একটা বিশেষ মনোভঙ্গী নিয়ে চলতে হয় ; শাস্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার একটা প্রচেষ্টাও চলতে থাকে।

মনশ্চিকিৎসকের নিকট শৈশবকালীন দুষ্ক্রিয় আচরণের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। মনঃসমীক্ষকদের মতে ভবিষ্যতের অপরাধপরায়ণতার কারণ শৈশবকালেই নিহিত থাকে—সাত বৎসরের পূর্বে যে অসামাজিক আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা যায়, সেটা আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বা বিচার্য্য নয়, কিন্তু মনশ্চিকিৎসকের নিকট এ রকম আচরণের সাথে দণ্ডনীয় আচরণের চরিত্রগত কোন পার্থক্য নেই। আমাদের দেশে ৭ বৎসর থেকে ২১ বৎসর বয়স্ক যে কোন অসামাজিক আচরণকারী ও আইনভঙ্গকারীকেই দুষ্কৃতকারী (delinquent) বলে আখ্যায়িত করা হয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মানসিক ও দৈহিক পরিপক্কতা (maturation) সীমায় পৌঁছুবার বয়স ২১—২২। সেইজন্যই এইসব অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুষ্কৃতকারীদের একটা বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত করা হয় এবং এদের বিশেষ প্রযত্ন সহকারে দেখাশোনা করতে হয়। কোন কিশোর অপরাধীকেই সংশোধনকারী বিদ্যালয়ে (Reformatory school) রাখা হয় না, যেই মাত্র তার বয়স আঠার বৎসরে পৌছে। কিন্তু কিশোর অপরাধীদের বন্দী আগারে, ১৫ থেকে ২১ বৎসরের অনেক দুষ্কৃতকারী আছে—পুনর্বাসন ও প্রশাসনের দিক থেকে সুবিধা হয় বলেই নিছক ওদের এখানে রাখা হয়।

সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর মধ্যে যদি অস্বাভাবিক ও অসামাজিক আচরণ পরিলক্ষিত হয় এবং সাত থেকে বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা যদি অসামাজিক আচরণ করে, তা হলে তাদের

বাড়ীতে রেখেই, শিশু নির্দেশনা চিকিৎসালয়ের (child guidance clinic) সাহায্য নিয়ে শুধরে নেবার চেষ্টা করা হয়। এই দুই বয়সের ছেলেমেয়েদের গোষ্ঠীকেই সাধারণভাবে Problem children বা সমস্যামূলক আচরণকারী শিশু বলা হয়। ৭—১৫ বৎসর বয়স্ক দুষ্কৃতকারী তরুণদের নির্দিষ্ট বিচারালয়ে (Juvenile Courts) বিচার করা হয় এবং শাস্তি হিসাবে এদের সংশোধনাগারে (reformatories) প্রেরণ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ১৬টি সংশোধনাগার (Reformatory Schools) আছে। সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাবার পর ছেলেদের পরবর্তী প্রযত্নের জন্য কতকগুলি সংস্থাও আছে। ১৫ বৎসর থেকে ২১ বৎসরের দুষ্কৃতকারীরা, সাধারণতঃ আইনের বিচারে প্রাপ্তবয়স্ক দুস্কৃতকারীদের অপেক্ষা কোন বিশেষ ব্যবহার পায় না—এরাও কারাগারে প্রেরিত হয়ে থাকে। কারাগার কর্তৃপক্ষ অবশ্য যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে এইসব অপ্রাপ্তবয়স্ক দুষ্কৃতকারীদের বিশেষভাবে পরিচালিত কারাগারে (Juvenile Jails) পাঠিয়ে দিতে পারেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দুষ্ক্রিয়তা ঃ—

অনেক মনশ্চিকিৎসকের মতে ব্যক্তির অতি শৈশবকালীন পরিবেশের মধ্যেই দুক্রিয়ার কারণ নিহিত থাকে। সামাজিক, নীতিবোধ ও অর্থনৈতিক সম্পর্কযুক্ত সকলপ্রকার প্রভাবই একসঙ্গে ব্যক্তির পারিবারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই প্রভাব যদি অস্বাস্থ্যকর হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভাবী দুক্রিয়ার বীজ উপ্ত হয়ে থাকে। মনশ্চিকিৎসক ও শিশু নির্দেশনা চিকিৎসালয় সমস্যাকারী বিপথগামী শিশুদের এই ভাবেই বিচার করে থাকে। এই বিচারলব্ধ সত্যের উপর ভিত্তি করেই মনশ্চিকিৎসকগণ সমাজ কর্মীর সাহায্য নিয়ে পিতা-মাতাকে যথার্থভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চান। এঁরা সন্তান প্রযত্নে পিতামাতার মধ্যে সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সাথে সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া সমীচীন ও শিশুর অন্যান্য মৌলিক চাহিদা কি ও এই সব চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি কি ভাবে ঘটানো যায়, এ সম্বন্ধে পিতামাতাকে তথ্য পরিবেশন করেন ও শিক্ষিত করে তুলেন। এর দ্বারা পিতামাতা গৃহ-পরিবেশটিকে সুন্দর ও সুস্থভাবে রচনা করতে পারেন, যে পরিবেশ বস্তুতঃই শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে অটুট ও সুদৃঢ় রাখবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শৈশবকালে শিশু যে মানসিক আঘাত পেয়েছে,

তাকে দূর করার জন্য এঁরা মানসিক চিকিৎসা করবেন। অন্যান্য মানসিক বিকৃতির মত দুষ্ক্রিয়াতেও এ প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল ভাবে দেখা দেয় যে, বংশধারা (Heredity) ও পারিবেশিক প্রভাব (Environment), এর কোনটা দুষ্ক্রিয়ার জন্য অধিক পরিমাণে দায়ী। দুপক্ষেই এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি আছে, এবং বংশ ধারার প্রভাবের উপর জোর দেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী। দুষ্ক্রিয়া রোধে বংশধারার প্রভাবের উপর আমাদের হাত খুবই কম, সেজন্য দুষ্ক্রিয়া থেকে কোন ছেলেকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমরা খুবই হতাশ বোধ করি। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা জানি পারিবেশিক প্রভাব ও বংশধারার প্রভাব এরা উভয়েই ব্যক্তিত্ব গঠনে কাজ করে। এবং কে দুষ্ক্রিয়া করবে আর কে করবে না, সেটাও এই দুই শক্তিই সমন্বিত ভাবে নিরূপণ করে। কাজেই বংশধারার প্রভাব রোধ করতে না পারলেও, পারিবেশিক প্রভাবকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিত্বকে অনেকটা সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনা যায়। সম্পূর্ণ সুস্থ বংশধারা নিয়ে জন্মেও কোন ছেলে যদি চোর গুণ্ডাদের মধ্যে গিয়ে থাকে ও লালিত হয়, তাহলে তার মধ্যে দুষ্ক্রিয়া দেখা দিতে পারে—কিন্তু যেহেতু এ ক্ষেত্রে দুষ্ক্রিয়ার কারণ সম্পূর্ণরূপে পারিবেশিক—সেইহেতু ছেলেটিকে এরূপ পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যদি উন্নত ও সুস্থ পরিবেশে কিছুকাল রাখা যায়, তা হলে কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটির দুষ্ক্রিয়ার প্রবণতা অনেক পরিমাণে কমে গিয়ে সুস্থতা ফিরে আসতে পারে। কিন্তু যেখানে এর কারণ সম্পূর্ণভাবে বংশধারাজনিত, সেখানে দুষ্কৃতকারীকে সুস্থ করে তোলা অপেক্ষাকৃত কঠিন—মনশ্চিকিৎসক ও সমাজ কর্মীদের (Social worker) আন্তরিকতা ও নিপুণ চিকিৎসা-জ্ঞান সহকারে পরিচর্যা ও প্রযত্নই এরকম দুষ্কৃতকারীকে সমাজ-নির্দ্ধারিত আচরণ পথে ফিরিয়ে আনতে পারে—অনেকটা সুস্থ করে তুলতে পারে।

এক প্রকারের দুষ্কৃতকারী আছে, যারা জন্মের সঙ্গে এমন একটা বিকৃতি (দেহগত কোন বিকৃত গঠন) নিয়ে জন্মায় যে, এই গাঠনিক বিকৃতি থেকে, তাদের দেহগত কার্যকারিতায় (মস্তিষ্কের কোন অংশের বিকৃতকাজ ও নালী-বিহীন গ্রন্থির রসক্ষয়ে বিকৃতির জন্য) বিকৃতি দেখা দেয়, মানসিক সুস্থতা বিঘ্নিত হয় ও এদের মধ্যে নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়া দেখা দেয়। কখনো কখনো যথাযথ চিকিৎসার দ্বারা এরূপ গাঠনিক বিকৃতিকে রোধ করা যায়। এপিলেপটিক অবস্থার সাথে, কোন কোন প্রকারের দুষ্ক্রিয়ার একটা সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই এপিলেপ্টিক আক্রমণের পর, যে একটা উদভ্রান্ত

আচ্ছন্নকারী সময় আসে, তখনই এপিলেপসি আক্রান্ত ছেলে দুষ্ক্রিয়া করে থাকে। এ সময়টা কেটে গেলে সে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। Electroencephelography (মস্তিষ্কর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মসী চিত্রলিপি) এ বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছে।

এরকম একজন অল্পবয়স্ক দুষ্কৃতকারী ছেলে ছিল, যে বাল্যকাল থেকেই রাত্রিবেলা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে, ঘুম থেকে আচ্ছন্নভাবে উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়তো। ঘরে যদি তালা দেওয়া থাকতো, তা হলে সে দরজা ভেঙ্গে ফেলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো। কেউ যদি এসে এ সময়ে বাধা দিত, তাহলে তাকে মারধর পর্য্যন্ত করত। এ রকম অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর, তার আচ্ছন্নভাব কেটে যেতো ও মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসতো। বংশধারার মধ্যে তার কতকগুলো বিকৃতি ছিল—তার মা ছিল উন্মাদ, তার এক কাকাও ছিল অত্যন্ত বদমেজাজের লোক। দুষ্কৃতকারীর এক ভাইও অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির ছিল।

আর একটি তেরো বৎসরের ছেলে। সে মাঝে মাঝে বাবামা'র ও সহপাঠীদের টাকা পয়সা চুরি করত এবং বাড়ী থেকে পালিয়ে টিকেট না কেটে কোন দূর দেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠে পড়ত। রেল কর্তৃপক্ষের বা গাড়ীর কোন লোক যদি তার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে বা তার গতিবিধি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করত তাহলে সে নানারকম বানানো গল্প বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। কিছুদিন বাইরে ঘুরে সে বাড়ীতে একটা অনুশোচনার ভার নিয়ে ফিরত। এই ছেলেটিরও আচ্ছন্নাবস্থা (Fugue) এক নাগারে কিছুদিন থাকতো। এপিলেপসির চিকিৎসা করে ছেলেটির আচ্ছন্নাবস্থার রোগ ও দুষ্ক্রিয়তা একই সঙ্গে চলে যায়।

আরো একটি চৌদ্দ বৎসরের ছেলে আচ্ছন্নবস্থায় (Fugue) বিভ্রান্তভাবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ত এবং বেরিয়ে এক টানা অনেকটা পথ চলত—চলতে চলতে পথে যতরকমের অসদাচরণ সম্ভব করতে থাকত। কয়েক ঘণ্টা পর হঠাৎ যেন সে 'জেগে' উঠত এবং অবাক হয়ে দেখত যে, সে একটা একেবারে অপরিচিত জায়গায় চলে এসেছে। তখন পথের লোকদের জিজ্ঞাসা করে বাড়ীর রাস্তা জানার চেষ্টা করত। বাড়ী ফিরে অবশ্য ছেলেটি রাস্তার কোন ঘটনার কথা আর বলতে পারত না। রাস্তার লোকজনের কাছ থেকে জানা যেত যে, সে রাস্তায় মারধর, চুরি এবং আরও নানা

প্রকারের নষ্টামি করেছে। এ ক্ষেত্রেও এপিলেপসির চিকিৎসা করে ছেলেটিকে সুস্থ করে তোলা হয়।

এইসব উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দুষ্ক্রিয়তায় (delinquency) শরীরবৃত্তগত (Physiolosical) কার্য্যকারিতা ও গঠনের বিকৃতি প্রভূত পরিমাণে দায়ী হতে পারে।

এ ছাড়া আর এক প্রকারের দুষ্কৃতকারী আছে, যাদের মধ্যে নৈতিকবোধ (moral sense) খুব অপুষ্ট বা একেবারে নেই। এদের মধ্যে বুদ্ধি যদিও স্বাভাবিক পরিমাণেই থাকে, তবু নৈতিকবোধ অবর্তমান। তবে কারো কারো মতে বুদ্ধির ক্ষীণতা ভিন্ন নৈতিকবোধের অভাব ঘটতে পারে না। প্রায়শঃই দেখা যায় যে, বুদ্ধির কমতির ফলেই এরূপ নৈতিকবোধের অভাব দেখ যায়।

নিম্নে এরূপ একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পনেরো বৎসর বয়সের একটি ছেলে। শৈশবে সে অত্যন্ত একগুয়ে ছিল এবং মাঝে মাঝে একটা গভীর হতাশার দ্বারাও সে আক্রান্ত হত। সে সব বিষয়েই অত্যন্ত নোংরা প্রকৃতির ছিল এবং অস্বাভাবিক রকমের খেতে পারত। তার কোনপ্রকার নীতিবোধ ছিল না। সে সহপাঠীদের বই, কলম প্রভৃতি চুরি করত; চিঠি ও চেক্ জাল করে একটা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টাও সে করেছে। সে বুঝতেই পারত না যে, সে কোন রকম অন্যায় কিছু করছে। বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তার বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে কিছু কম। তার বংশধারা থেকে দেখা যায় যে, তার প্রথম একভাই অপরিণত ও বিকৃত দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মাবার কিছুকাল পরেই মারা গিয়েছিল। তার আর এক ভাই ছিল একজন মদ্যপ। তার এক কাকাও ছিল মদ্যপায়ী। তার ঠাকুরদাদাও ছিল মদ্যপ এবং ঠাকুরদাদার এক ভাই উন্মাদ ছিল।

এপিলেপ্‌সি থেকে যে দুক্রিয়তা তার চিকিৎসা করা যেত, কিন্তু বংশধারা জনিত যে নীতিবোধহীনতা ও তজ্জনিত যে সব দুক্রিয়া তাকে চিকিৎসার দ্বারা সারিয়ে তোলা যেত না। এহেন দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে প্রায়ই বুদ্ধির স্বল্পতা থাকে এবং এর সঙ্গে বাতুলতার (Psychosis) নানারূপ লক্ষণও দেখা যায়। মনশ্চিকিৎসার দ্বারা এদের সারিয়ে তোলা প্রায়ই খুব দুঃসাধ্য হয়, কারণ রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের সাথে যেভাবে সহযোগিতা করা দরকার তা এরা করে উঠতে পারে না। অন্যান্য সমস্যামূলক শিশু ও কিশোরদের

ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ ঘটে না—তারা মনশ্চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে সহযোগিতার মনোভাব দেখায়।

দুষ্ক্রিয়তার সামাজিক দিক :—

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দুষ্ক্রিয়তা এক প্রকারের রোগ সংলক্ষণ (symptom)। মানসিক অসুস্থতার প্রকাশ ঘটে এই সব দুষ্ক্রিয় আচরণের মধ্য দিয়ে। মানসিক অসুস্থতার মধ্যে উন্মায়ু ও বাতুলতাও পড়ে। কিন্তু এদের অস্বাভাবিক আচরণ সামাজিক বিধিবদ্ধ নিয়ম কাঠামোর মধ্যে ভাল বা মন্দ হিসাবে বিচার করা হয় না। কিন্তু দুষ্ক্রিয়তা সর্বদাই সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়ম কানুনে বিচার্য্য। এইসব সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়ম-কানুনকে ভেঙ্গে ফেলা ও আক্রমণ করা দুষ্ক্রিয়তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই দুষ্ক্রিয়তার সঙ্গে সমাজের একটা বিশেষ যোগ আছে।

বস্তুতঃ ব্যারণের (Barron) মতে সেই শিশুকে বলা হবে দুষ্কৃতকারী, যে শিশুর সমাজ সঙ্গতি সাধনের ধরণ সমাজ নির্দ্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত।[১]

দুষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য :—

দুষ্ক্রিয়তার সমস্যাটিকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে, দুষ্কৃতকারীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে বুঝা দরকার। গোষ্ঠীভুক্তভাবে দুষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যগুলি জানা থাকলে, কোন একজন বিশেষ দুষ্কৃতকারীর সমস্যা আরও গভীরভাবে প্রণিধান করা যেতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের আরও বৈজ্ঞানিক পটভূমিতে পর্য্যালোচনা করা যায়—এদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও যথাযথভাবে করা যেতে পারে।

বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিদ দুষ্কৃতকারীদের অনেকগুলি গোষ্ঠীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এঁদের মধ্যে হিলি (Healy), বার্ট (Burt) এবং গ্লুয়েক (Glueck) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মতে দুষ্কৃতকারীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : (১) শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ দুষ্কৃতকারীদের বুদ্ধি কম। (২) প্রাক্ষোভিক (emotion) দিকে থেকে এরা অত্যন্ত অস্থির। (৩) বিদ্যালয় সম্বন্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত

১। "Delinquent is a child whose pattern of adjustment deviates from the code of conduct society is attempting to enforce."

Barron, M. L. The Juvenile in Delinquent Society.

বৈরিতাপূর্ণ। (৪) এদের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ শৈশবকাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়। (৫) সামাজিক দিক থেকে দুষ্কৃতকারীরা একেবারে একাকী নয় কেননা প্রায়শঃই এরা এদের মত দুষ্কৃতকারীদের সাথে একটা গোষ্ঠী ও সমাজ সৃষ্টি করে থাকে। (৬) (ক) দুষ্কৃতকারীরা প্রায়শঃই নীচ মানের সমাজ ও আর্থিক স্তর থেকে আগত ও নিম্ন নৈতিকমান সম্পন্ন পরিবার থেকে উদ্ভূত হয়। (খ) যে সব পরিবারে পারিবারিক সম্বন্ধ সুস্থ নয় অর্থাৎ পিতামাতার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ অত্যন্ত কুৎসিৎরূপ নেয়, পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ প্রভৃতি দেখা দেয় সেই সব পরিবার থেকেই বেশী আসে। (৭) দুষ্ক্রিয়তা সেই সব অঞ্চলে বেশী করে দেখা যায় যে সব অঞ্চল রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে সহংতি হারিয়ে ফেলেছে।

দুষ্ক্রিয়তার প্রকারভেদ :—

জে, এ, হেড্‌ফিল্ড (J. A. Hadfield) দুষ্ক্রিয়তাকে চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনুসারে চারভাগে ভাগ করেছেন।

(ক) নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা (Benign Delinquencies)।

(খ) মেজাজগত দুষ্ক্রিয়তা (Temperamental Delinquencies)।

(গ) সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা (Simple Delinquencies)।

(ঘ) প্রতিক্রিয়ামূলক দুষ্ক্রিয়তা (Reaction Delinquencies)।

(ক) **নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা :—**

নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা বলতে সেই সব আচরণ বুঝায়, যে গুলোকে সামাজিক দিক থেকে দুষ্ক্রিয়তা বললেও, মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে দুষ্ক্রিয়তা বলা চলে না। যেমন কোন ছেলে রাস্তায় ফুটবল খেলছে, এখন রাস্তায় ফুটবল খেলে পথচারীদের অসুবিধা সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই সামাজিক দিক থেকে, ও পৌর আইনের দিক থেকে অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু যে এরূপ আচরণ করছে সে তো নির্দোষ আনন্দলাভের জন্য করছে, তার মনের দিক থেকে কোন প্রকার জটিলতা নেই। কোন ছেলে হয়তো, জাহাজ দেখার জন্য বন্দরের নিষিদ্ধ এলাকা অতিক্রম করেই চলে গেল। এখানে ছেলের অসুস্থ মন নয়, তার আকাশ-চুম্বী মনই তাকে আইন অমান্য করায়। এটা নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা।

(খ) মেজাজগত দুষ্ক্রিয়তা :—

এর মূল কারণ শরীরবৃত্তগত কার্যকলাপের মধ্যে কোনপ্রকার চ্যুতি বা বিকৃতি। যেমন শর্করার ভাগ রক্তে অত্যন্ত কমে গেলে আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপের ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে। এছাড়া নালীবিহীন গ্রন্থির রস নিঃসরণে যে সমতা থাকা প্রয়োজন, সে সমতা যদি (Endocrene glands) কোন বিশেষ একটি গ্রন্থিরসের বিকৃত কার্যকারিতার জন্য নষ্ট হয়, তা হলেও প্রাক্ষোভিক দিক থেকে একটা অসাম্য ও মেজাজের মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখাদেয়। এই অস্থিরতার মধ্যে শিশু নানা প্রকারের দুষ্ক্রিয় কাজ করতে পারে। এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির মাত্রাধিক কার্যকারিতার ফলে যে রস নিঃসরণ হয় তা শারীরিক দিকে রক্তরসায়নের মধ্যে (Blood Chemistry) কতকগুলি বিকৃত পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এই বিকৃতি মানসিক কার্যকারিতাকেও নিয়ন্ত্রিত করে এক্ষত্রে, ব্যক্তি অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নানাপ্রকারের দুষ্ক্রিয়া করে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে শারীরিক বিকৃতি প্রতিরোধ করা গেলে দুষ্ক্রিয়তার দূরীকরণও করা যেতে পারে।

(গ) সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা :—

সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা তাকেই বলা হয় যা মূলতঃ পারিবেশিক প্রভাব থেকে উদ্ভূত। অতি দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবেশ, ভগ্ন পরিবার (Broken home), পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য, নিয়ত কলহ, এমন কি উভয়ের মধ্যে সম্পর্কচ্যুতি, গৃহে অতি জনবহুলতা, পরিবারের কোন ব্যক্তির অধিক মদ্যপায়িতা, পারিবারিক উচ্ছৃঙ্খলতা, অতি আদর, অতি শাসন, কুশাসন, উদাসীনতা প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়ে ছেলেপুলে মানুষ হলে, যে দুষ্ক্রিয়তার আবির্ভাব ঘটে তাকেই সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা বলে।

(ঘ) প্রতিক্রিয়ামূলক দুষ্ক্রিয়তা :—

পিতামাতার কাছ থেকে যদি সন্তান তার প্রাপ্য স্নেহ-প্রযত্ন না পায় এবং অন্যায়ভাবে অতিশাসিত ও অত্যাচারিত হয়, তাহলে তার মনের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, সেই ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ারূপে নানাপ্রকারের বিদ্রোহাত্মক আচরণ প্রকাশ পায়। পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে যে সমস্ত বিধিবদ্ধ

আচরণ-ধারা আছে, তাকে ভেঙ্গেচুরে ফেলার নানাপ্রকারের প্রয়াস চলতে থাকে। এ প্রয়াসগুলি, সামাজিক ও দেশের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, দুষ্ক্রিয়তা-রূপে অভিহিত হয়।

পিতামাতা সন্তানের একমাত্র আশ্রয়—তার নিরাপত্তাবোধ নির্ভর করে পিতামাতার সামগ্রিক সম্পর্কের উপর অর্থাৎ পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যদি সৌহার্দ্য, পরস্পর বোঝাবুঝি ও স্থিরতা থাকে এবং শিশু যদি এটা অনুভব করতে পারে তাহলে সে নিজেকে নিরাপদবোধ করে। অন্যথায় পিতামাতার অসুস্থ সম্পর্ক, সন্তানের মধ্যে একটা গভীর নিরাপত্তাবোধহীনতা ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তার ভাব নিয়ে আসে। নানাবিধ দুষ্ক্রিয় আচরণের মধ্য দিয়ে দুশ্চিন্তা-জনিত যে পুঞ্জীভূত আবেগ তার প্রকাশ ঘটিয়ে, ব্যক্তি নিজেকে কিছুটা হাল্কা করার চেষ্টা করে।

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার মূল কারণ ঃ—

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ সমধর্মী, কেননা উভয়েরই উৎস ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিকৃতি ও তজ্জনিত মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা। একমাত্র দেশজ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি আচরণ দুষ্ক্রিয়তা বলে চিহ্নিত হয়, কাজেই দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণের কারণ বিশ্লেষণে আমরা একই পটভূমি থেকে আলোচনা করব।

দুষ্ক্রিয়তামাত্রই সমস্যামূলক আচরণ; কিন্তু সব সমস্যামূলক আচরণই দুষ্ক্রিয়তার পর্য্যায়ে পড়ে না, যদিও ক্ষীণ সমস্যামূলক আচরণ থেকে দুষ্ক্রিয়তার সূচনা।

প্রধানতঃ সমস্যামূলক আচরণ এবং দুষ্ক্রিয়তার কারণ বংশগতি ও পারিবেশিক ক্রিয়াকলাপের পরিণত ফল। কোন শিশুর আচার আচরণ কি প্রকারের হবে, সেটা নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব কি ভাবে গড়ে উঠছে এবং তার ব্যক্তিত্বের জন্মগত উপাদানগুলি স্বাভাবিক কিংবা বিকৃত তার উপর। ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ ভাবে গড়ে ওঠে তাহলে সুস্থব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে সুস্থ আচরণের মধ্যে, আর ব্যক্তিত্ব যদি অসুস্থভাবে গড়ে না ওঠে তাহলে তার আচার আচরণ হবে অপ্রকৃতস্থ বা বিকৃত। ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে ব্যক্তি জন্মগতির দিক থেকে কতটা স্বাভাবিক অর্থাৎ বংশধারাক্রমে সে স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক গঠন নিয়ে জন্মেছে কিনা—এবং শিশু জন্মাবার পর যে সব পারিবেশিক প্রভাবের

মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, সেটা কতটা তার মানসিক বিকাশ বৃদ্ধির সহায়ক বা প্রতিবন্ধক, তার উপর।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে, বংশগতি ও পারিবেশিক এই দুটি ব্যক্তিত্ব গঠনকারী শক্তির কোন্‌টি সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা সৃজনে অধিক দায়ী। এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে যে, বিকৃত শারীরিক গঠন নিয়ে জন্মালে বা প্রতিকূল শারীরবৃত্তিক (Physiological) ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মালে, শিশুর বিপথগামী বা দুষ্কৃতকারী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে শৈশবকালীন পরিবেশ প্রভাবের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি বিশেষ প্রভাব-শালী ও কার্যকরী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ একই পরিবেশে সুস্থ ও স্বাভাবিক বংশগতি নিয়ে যদি কেউ জন্মায় ও প্রতিপালিত হয়, তবে সে শিশুর মধ্যে সমস্যা-মূলক আচরণ বা কোন প্রকার ব্যক্তিত্বের বিকৃতি দেখা যায় না। গ্লুয়েক (Glueck) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ সমস্যামূলক আচরণ ও নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়তা সৃষ্টিতে বংশগতি ও পরিবেশ প্রভাব সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের শতকরা পঞ্চাশজনের পারিবারিক ইতিহাসেই নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়তা ও কঠিন অপরাধ সংঘটনের নজির রয়েছে। যদিও এ ঘটনা বংশগতির প্রভাবই দুষ্ক্রিয়তার জন্য অধিক দায়ী বলে ইঙ্গিত দেয় তবু এ থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কেননা আরও বহু, দুষ্কৃতকারীর পারিবারিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বংশগতি ও পারিবেশিক প্রভাব উভয়ই সমন্বিতভাবে দুষ্ক্রিয়তা সৃজনে প্রভাব বিস্তার করে। তবে বার্ট (Burt) হিলী (Healy) এবং ব্রোনার (Bronner) প্রমুখ সমাজবিদ্ মনস্তাত্ত্বিকগণ দেখেছেন যে, দুষ্কৃতকারীদের (delinquents) মাত্র শতকরা ২৫ ভাগের মধ্যে বংশানুক্রমিক বিকৃতি বা অপরাধ-পরায়ণতার নজির আছে। ছোট খাটো সমস্যামূলক আচরণ বা দুষ্ক্রিয়তাতে বংশধারার প্রভাব অনেক পরিমাণে কম; যদিও যেসব অপরাধী একটার পর একটা কঠিন অপরাধ সমাজে করে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে বংশধারার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এসব পরীক্ষালব্ধ সত্য থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পরিবেশ ও বংশগতি দুটি শক্তিই যদিও একই সঙ্গে দুষ্ক্রিয়তা বা সমস্যামূলক আচরণ সৃজনে কাজ করে তথাপি পারিবেশিক প্রভাবই সমধিক। কাজেই এ বিষয়ে পরিবেশের কি কি প্রভাব কাজ করছে

আমরা সেদিকেই বেশী করে আলোকপাত করব। বস্তুতঃ বংশগতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু পারিবেশিক প্রভাবকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারি, যার ফলে শিশুর আচার আচরণ সুস্থ ও সামাজিক হবে। যদি কারও কোন প্রকার সমস্যামূলক আচরণ দেখাও দেয়, তাহলেও সেটা যাতে গুরুতর আকার না নিতে পারে তার জন্য পূর্ব থেকেই যথোচিতভাবে পারিবেশিক প্রভাবশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার কারণগুলিকে, আলোচনার সুবিধার জন্য, আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—যেমন বংশানুক্রমিক ও পারিবেশিক। এই পারিবেশিক প্রভাবকে আবার প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—যথা (ক) পারিবারিক (খ) বিদ্যালয় (গ) সামাজিক।

বংশানুক্রমিক প্রভাব :—

সাধারণতঃ খুব বড় রকমের জৈবিক কোন বিকৃতি (বংশগতি থেকে প্রাপ্ত) সমস্যামূলক আচরণকারী বা দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, এপিলেপ্সি রোগ যেসব শিশুদের মধ্যে আছে তাদের অনেকেই সমস্যামূলক আচরণকারী বা দুষ্কৃতকারী হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসার দ্বারা জন্মগতি প্রাপ্ত এই এপিলেপ্সি রোগকে যদি সারিয়ে তোলা যায় তাহলে দুষ্কৃত আচরণও শিশুর মধ্য থেকে দূর হয়। তবে কোন প্রকারের, বড়ই হোক বা ছোটই হোক, শারীরিক বিকলাঙ্গতা যদি শিশুর মধ্যে বংশধারাক্রমে বর্তায় তাহলে শিশুর মনেও তার একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিশু একটা হীনমন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতে থাকে। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানাপ্রকারের অস্বাভাবিক প্রয়াস ও আচরণ করতে থাকে। এই অস্বাভাবিক আচরণগুলো সমস্যামূলক আচরণ হিসেবে দেখা দেয়। কখনও কখনও তা দুষ্ক্রিয়তারূপেও প্রকাশ পায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, দুষ্কৃতকারীদের বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম থাকে। বুদ্ধি যেহেতু বংশগতি প্রসূত, সেহেতু দুষ্ক্রিয়তায় বংশগতির প্রভাবও এ সব ক্ষেত্রে বর্তমান। কোন শিশুর বুদ্ধি যদি স্বাভাবিক না থাকে, তাহলে সে নিজের বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমাজে ভালমন্দ গ্রহণবর্জন করতে পারে না। এরা প্রবৃত্তি ও আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়—কুসংসর্গে পড়ে অল্প প্ররোচনাতেই বিপথে চলে যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধি স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক থেকে বেশী

থাকলেও দুষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই দুষ্ক্রিয়তার অন্য সব কারণ অধিক সক্রিয় থাকে।

বংশগতি ব্যক্তিত্বগঠনে, নালী বিহীন গ্রন্থির (Endocrene Glands) ক্রিয়া কলাপের মধ্য দিয়ে, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে কাজ করে। এই সব গ্রন্থিরসের কোনটির যদি স্বাভাবিক থেকে কম বা বেশী নিঃসরণ ঘটে তাহলে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। যেমন অ্যাড্রিন্যাল, পিটুইটারি, থাইরয়েড এবং গোনাড প্রভৃতি গ্রন্থির রস নিঃসরণের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে এবং এদের কোনটির মধ্যে যদি মাত্রাধিক সক্রিয়তা থাকে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা, অতিকর্ম-প্রবণতা, আক্রমণাত্মক সক্রিয়তা প্রভৃতি দেখা দেয়। এ থেকে সমস্যামূলক আচরণ বা দুষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে।

পারিবেশিক প্রভাব :—

(ক) গৃহ ও পরিবার পরিবেশ—

পারিবেশিক প্রভাবকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে তার দুটি দিক দেখতে পাবো।

১। ভৌতিক পরিবেশ (Physical environment)।

২। মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ (Psychological environment)।

মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশই আমাদের যথার্থ বিচার্য্য, কেননা ভৌতিক পরিবেশ কিভাবে সেই পরিবেশে স্থিত শিশুর মানস ভূমিতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করছে. সেটিই আমাদের লক্ষণীয় বিষয়।

ভৌতিক গৃহ পরিবেশ ও তৎসঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য :—

১। দারিদ্র্য এবং গৃহে স্থান সংকুলানের অভাব (এক বাড়িতে অনেক লোকের গাদাগাদি করে থাকা)।

২। ঘন বসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ও দারিদ্র্য প্রপীড়িত বিশৃঙ্খল নগর কো। যে সব স্থানে বেকারী ও অধিক অসাচ্ছন্দ্য রয়েছে, সমাজ জীবনের বাঁধন যেখানে শিথিল এবং নানাপ্রকারের অপরাধ কার্য (যেমন চুরি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি) প্রায়ই যেখানে ঘটে, সেই সব অঞ্চলে দুষ্ক্রিয়তার নজির শহরের অন্যান্য অঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা বেশী পরিমাণে দেখা যায়। কাজেই এরূপ পরিবেশ যে ব্যক্তিত্বের সুস্থভাবে গড়ে ওঠার পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে এবং দুষ্ক্রিয়তা নিয়ে আসে, এরূপ সিদ্ধান্তে আসার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে।

উপরোক্ত দুটি অবস্থাই ভৌতিক পরিবেশের অবস্থার কথা বলেছে, যে অবস্থা দুষ্ক্রিয়তা বা সমস্যামূলক আচরণ সৃষ্টির সহায়ক। কিন্তু আমরা জানি ভৌতিক পরিবেশ মনের ওপরে যখন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় তখনই সেটা ব্যক্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। যেমন, দারিদ্র্য যদি গৃহপরিবেশে বর্তমান থাকে, তাহলে ব্যক্তিত্বকে সুস্থভাবে গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত বস্তু একান্তভাবে প্রয়োজন (যেমন সুষম খাদ্য, যথার্থ আশ্রয়, উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, অবসর বিনোদনের প্রয়োজনীয় সুস্থ উপকরণ প্রভৃতি) সেগুলি যথাযথভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না—ফলে শিশুর মৌলিক দৈহিক চাহিদাগুলি মেটে না। এর দ্বারা তার দৈহিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং স্বভাবতঃই তার মানসিক বিকাশ-বৃদ্ধিও রুদ্ধ হয়। তাছাড়া এই সমস্ত চাহিদার অপূরণজনিত যে অতৃপ্তি তা থেকে তার মধ্যে ক্ষোভ, নিরাপত্তার অভাববোধ ও একটা হতাশার ভাব আসে, তার প্রাক্ষোভের মধ্যে নানা প্রকার জটিলতা দেখা দেয় ও পরিবার-সমাজ সম্বন্ধে একটা আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী তৈরী হয়।

সমাজ-জীবনের বাঁধুনি ও শৃঙ্খলা যদি দৃঢ় না হয়, তাহলে সেই সমাজ-পরিবেশে যে সব শিশুরা বড় হয়, তাদের জীবনকে ঠিকভাবে গড়ে তুলবার জন্য কোন স্থির আদর্শ বা লক্ষ্য তাদের চোখের সামনে থাকে না।

শিশু প্রথম অনুকরণের মধ্য দিয়েই শেখে। তার চারিদিকে সমাজ-জীবনের মধ্যে যদি সর্বদা একটা বিশৃঙ্খলা সে দেখে এবং বয়স্কদের মধ্যে চুরি, রাহাজানি এরকম নানাপ্রকারের অসাধু ও অসামাজিক আচরণ দেখে তাহলে তারাও সে জিনিসগুলো অনুকরণ করে। এইসব অস্থির ও নিয়ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে শিশুদের মানসিক স্থিরতা আসতে পারে না। সর্বদাই তাদের মনের মধ্যে একটা নিরাশ্রয়বোধ ও ভয় থাকে। কোন বিষয়েই গভীরভাবে মনোনিবেশ তারা করতে পারে না। এইসব কারণে এরূপ পরিবেশ তাদের ব্যক্তিত্বকে অসুস্থ করে ফেলে, দুষ্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে এদের মধ্যে দেখা দেয়।

মূল গৃহপরিবেশ ও পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক :—

পরিবেশ বলতে আমরা কেবল বাড়ী, ঘর-দোরই বুঝি না, সেই বাড়ীর মধ্যে যাঁরা বাস করেন তাদের পরস্পরের সম্পর্ককেও বুঝি। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এ সম্পর্কের মূল্যায়ন, এর সুস্থতা-অসুস্থতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,

কেননা এই পারস্পরিক সম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশকে অত্যন্ত শক্তিশালী উপায়ে প্রভাবিত করে—তার মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতা, তার দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্য-বোধ প্রভৃতি এ সম্পর্কের হের-ফের দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।

শৈশবকালে মানব শিশু প্রায় সম্পূর্ণভাবে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে। স্পর্শকাতর এবং অত্যন্ত নমনীয় এ সময়টিতে শিশু পিতামাতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে থাকে। পিতামাতাই এই সময়ে শিশুর নিকট একমাত্র আদর্শ, —তাঁদের আচার-আচরণ, চিন্তাভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী, মোটের উপর তাঁদের ব্যক্তিত্ব শিশুর ব্যক্তিত্ব কি রকমের হবে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা বহুলাংশে নির্ণয় করে। অতএব গৃহ পরিবেশে পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক না হয়, তা হলে এসকল পিতামাতা গৃহ-পরিবেশটিকেও সুস্থ ও সুন্দর ভাবে রচনা করতে অক্ষম হয়। এবং এই অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিকৃত ও রুদ্ধ হয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে যে সকল মৌল উপাদানের দিকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে তাদের মধ্যে আছে (ক) পিতামাতার বিবাহিত জীবনের সঙ্গতি বা অপসঙ্গতি (খ) পিতা-মাতার সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী (গ) বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁদের নীতিবোধ ও অন্যান্য বিষয়ে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়াস-প্রকার এবং (ঘ) ভাইবোনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

পিতামাতা দুক্রিয়া বা সমস্যামূলক আচরণ নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে না করলেও তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি কোনপ্রকার অগোচর অসুস্থতা বা বিকৃতিও থাকে, তাহলেও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ বা দুক্রিয়তা দেখা দিতে পারে। প্রতিকূল গৃহপরিবেশ, বিশেষভাবে অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতামাতাই, সন্তানের মধ্যে দুক্রিয়তার সৃষ্টি করে।[1]

---

1. "The inadequacy of the home both emotionally and physically impairs the mental health of the growing children. There are many factors which make a home inadequate, usually the prime factor is the inadequacy of the parent" Ford, D. The delinquent child and the community."

"It is not necessary for parents to demonstrate specifically delinquent tendencies to disperse their children to delinquency or problem behaviour, any form of inadequency may result in delinquent behaviour in the children." (Ford, D.)

"It is emotional instability and inability of parents to make effective relationships which are the outstanding cause of children be-coming deprived of a normal home life." Bowlby, John. Child care and the Growth of love.

(ক) পিতামাতাই সন্তানের আশ্রয়স্বরূপ। পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা শিশুর একান্ত কাম্য। এখন পিতামাতার মধ্যে যদি সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান না থাকে, যদি তাঁদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে অশান্তি, অস্থিরতা, ছেদ, (Temporary separation) এমন কি বিচ্ছেদ (Divorce) পর্যন্ত দেখা দেয় (Conditions of broken home) তাহলে সেই গৃহ পরিবেশে শিশু অত্যন্ত নিরাশ্রয় ও অনিরাপদ (feeling of insecurity) বোধ করে। এই বোধ থেকে শিশুর মধ্যে যে প্রবল দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও ভয়ের সৃষ্টি হয় সেটা তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর, তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটি বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ। এই অবস্থা থেকে শিশুর মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধও দেখা দিতে পারে।

পিতামাতা নিজেরাই যদি সর্বদা কলহ ও মনোমালিন্য জর্জরিত থাকেন তাহলে তাঁদের পক্ষে সন্তানের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। সন্তানের মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে এঁরা অত্যন্ত উদাসীন থাকেন (Indifference)। ফলে সন্তানের ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে গড়ে ওঠে না।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ও নির্দয় হয়ে থাকেন (Rejection & hostile attitude)। এঁরা সব কিছুই ওপর থেকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিতে চান। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত যে চাওয়া পাওয়া, তার দিকে এঁদের কোন লক্ষ্য থাকে না। এঁরা সর্বদাই শিশুকে উপহাস করেন। অহেতুক সমালোচনা. পদে পদে বাধা এবং অধিক শাসন শিশুকে ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত করে ফেলে। এ সব ক্ষেত্রেও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে হতে পারে না—নানাপ্রকারের সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

কোন কোন পিতামাতা শিশুদের অত্যন্ত আদর দিয়ে থাকেন। শিশুরা খেয়াল খুশীমত যখন যা চায় তখনই তাদের সে সব সাধ তাঁরা পূরণ করার জন্য অতিপ্রয়াসী হয়ে ওঠেন। শিশু এ থেকে নিজের সম্পর্কে একটা অতি অবাস্তব উচ্চ ধারণা পোষণ করে—যে ধারণার বশবর্তী হয়ে সে নিজেকে এবং আর সকলকে বিচার করতে আরম্ভ করে। এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার মধ্যে নানাপ্রকারের সমস্যামূলক আচরণ, এমনকি দুষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে।

(গ) অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতামাতার বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী অসুস্থ ও বিকৃত থাকে। ফলে তাদের প্রতিযোজন (adjustment) প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক রূপ ধরে। এই সমস্ত অস্বাভাবিকতা তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সর্বদা প্রতিফলিত হয়। শিশুদের কাছে পিতামাতাই হল জীবনাদর্শ (ego ideal)। পিতামাতার অসুস্থ ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের অপ্রকৃতস্থ আচার আচরণ শিশুর মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে। সে জীবনে যথার্থ আদর্শ খুঁজে পায় না। এর ফলে শিশুদের আচার আচরণ ও চিন্তা ভাবনার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ও ছন্নছাড়া ভাব দেখা দেয়। এ থেকে সমস্যা-মূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে। পিতামাতার নৈতিক চরিত্র শিশুর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পিতামাতার স্বভাব চরিত্র যদি সামাজিক ও নৈতিকশীলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত না হয়—যদি তাঁরা নিজেরাই দুর্নীতি পরায়ণ হন, তাহলে পারিবারিক জীবনের সংহতি ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। এরূপ গৃহ পরিবেশে শিশুরা অতি সহজেই দুষ্কৃতকারী হয়ে ওঠে।

মূলতঃ ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যে সুস্থতা অসুস্থতা নির্ণীত হয় পিতা-মাতার সম্পর্কের দ্বারা। পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক যদি সুস্থ থাকে এবং পরিণামে সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যদি একটা সুস্থতা ও সমতা থাকে; তাহলে ভাই-বোনদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কও সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়। কিন্তু শিশুরা যদি পিতামাতার কাছ থেকে যথার্থ পরিমাণে স্নেহ ভালবাসা না পায় এবং পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক অসৌহার্দ্য-জনক সম্পর্কের জন্য সর্বদাই গৃহ-পরিবেশের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও উত্তেজনা বর্তমান থাকে, তাহলে সেই পরিবেশে প্রতিপালিত সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর আবেগ জটিলতার সৃষ্টি হয়, যা থেকে পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

বিদ্যালয়ের প্রভাব :—

শিক্ষক যদি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্মম হন, সামান্য অপরাধে অধিক শাস্তি, পদে পদে শিক্ষার্থীকে সমালোচনা করেন ও বাধা দেন, শিক্ষার্থীর

আত্মসম্মানকে অহেতুক ক্ষুণ্ণ করে কথা বলেন বা আচরণ করেন, তাহলে শিক্ষার্থীর মনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা ক্ষোভ থেকে যায়—এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একদিন নানাপ্রকার শৃঙ্খলাভঙ্গকারী-আচরণের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে, এবং শিক্ষকের প্রতি ক্রোধ, বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া, বিদ্যালয়ের জিনিস পত্র ভাঙ্গা, শিক্ষকদের অপমান করা এ সব দুষ্ক্রিয়তা শিক্ষকদের বিকৃত ও নির্দয় আচার আচরণ থেকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দিতে পারে।

শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মানস-বৈশিষ্ট্যের দিকে, তার সুবিধা-অসুবিধার দিকে যথাযথ নজর না দেন, তা হলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে অলক্ষ্যে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন শিক্ষক যদি বয়সধর্ম অনুযায়ী বাড়ীর পড়া করতে না দেন, অধিক বাড়ীর পড়া দেন, যদি তা আবার শিশু বাড়ী থেকে ঠিক মত করে না আনে, তার জন্য অধিক শাস্তি দিয়ে থাকেন তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়—পড়াশুনায় তার স্বচেষ্টা, উৎসাহ প্রভৃতি তো হ্রাস পায়ই, এছাড়া নিজের সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়—এ থেকে পাঠবিষয়ে অনীহা দেখা দেয়, পাঠের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। হীনমন্যতাবোধ শিশুর মধ্যে আসে এবং এ থেকে মুক্তিলাভের জন্য সে নানাপ্রকার বিকৃত আচরণ করে থাকে ; যেমন কখনো কখনো নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেয়—কখনো-বা নিজেকে সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানাপ্রকার অপপ্রয়াস অবলম্বন করে থাকে, যা বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলার পরিপন্থী ; পরীক্ষায় নকল করা, সহপাঠীকে মারধর করা—যারা পড়াশুনায় ভাল করবে তাদের কটাক্ষ করা, শিক্ষকদের অপমানিত করা ইত্যাদি আচরণ এরা করে থাকে। শিক্ষক সম্বন্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, নানাবিধ সমস্যা শিশুর মধ্যে দেখা দেয়—মোটের ওপর শিক্ষক যদি পঠন-পাঠন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন না হন—মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ না হন, তা হলে বিষয় জ্ঞানে শিক্ষক পণ্ডিত হলেও সেই বিষয়কে পড়ানো, তাকে যথাযথভাবে পরিবেশন করার যে কলা-কৌশল, তা শিক্ষক না জানার জন্য তার পড়ানো শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন উৎসাহ ও প্রাণের সঞ্চার করবে না। এ হেন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের পাঠবিষয়ে অমনোযোগিতা দেখা দেয় এবং বয়স ধর্ম অনুযায়ী প্রাণশক্তিকে নানাপ্রকার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে নষ্ট করে—ব্যক্তিত্ব যথাযথ ভাবে বিকাশ লাভ করে না। নানাপ্রকার বিকৃতি শিশুর ব্যক্তিত্বে দেখা দেয়—সমস্যামূলক

আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা অবৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।

বিদ্যালয়-পরিবেশের মৌল উপাদান ও তার প্রভাব :—

তাহলে দেখা যাচ্ছে গৃহপরিবেশের পরে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে প্রভাব সর্বাধিক কাজ করে, তা হল বিদ্যালয়ের পরিবেশ। বিদ্যালয় পরিবেশ যদি সুস্থ ও খোলামেলা না হয়, শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ ও সুন্দর না হয়, তাহ'লে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুর ব্যক্তিত্বকে তা বিকৃত করে ফেলতে পারে—বিদ্যালয় সম্বন্ধে তার একটা নেতিবাচক মনোভঙ্গী দেখা দেয়—পড়াশুনায় গভীর অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর বিদ্যালয় শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সুনিশ্চিত ভাবে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী উপাদান। গৃহপরিবেশের পরেই বিদ্যালয় পরিবেশের প্রভাব শিশুর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে—দিনের অনেকটা সময়ই শিশুকে বিদ্যালয়ে কাটাতে হয় এবং শিশুর স্পর্শকাতর মন নানাবিধ প্রভাবশালী মৌলশক্তির সান্নিধ্যে আসে। আমরা বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির কথা একে একে আলোচনা করব।

(ক) শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ :—

গৃহপরিবেশে শিশুরা পায় পিতামাতাকে। এঁরাই শিশুর একান্ত আশ্রয় ও ভালবাসার জন। বিদ্যালয়ে পিতামাতার স্থান নিয়ে থাকেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী, স্নেহপ্রীতি, নিয়মানুবর্তিতা, পড়ানোর বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, বিষয়-জ্ঞান, সবকিছুই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশু-শিক্ষার্থীর মনকে আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে।

শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের নিকট থেকে যথোপযুক্ত ভালবাসা, উৎসাহ না পায়, তা হলে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান, সে সম্পর্কে এবং সামগ্রিক ভাবে বিদ্যালয় সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব তার মধ্যে তৈরী হয়।

(খ) অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম :—

শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও বিকাশ-পর্য্যায়ের সাথে সমতা রেখে যদি পাঠক্রম নির্দ্ধারিত না হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠবিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে কোন উৎসাহও বোধ করে না। শিক্ষার্থী হয় পাঠক্রমের অধিক চাপে

জর্জরিত হয়ে পড়ে, না হয় অত্যন্ত অপ্রতুল পাঠক্রমের জন্য অনেক সময় অন্যভাবে অপচিত করার প্রচুর অবসর ও প্রয়াস পায়। সুস্থ ব্যক্তিত্বের জন্য যথোচিত পাঠক্রম নির্দ্ধারণ হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। এর অভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সঠিকভাবে ঘটে না এবং নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিতে পারে।

(গ) সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অভাব ও অত্যধিক শৃঙ্খলার চাপ :—

ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের জন্য ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য পড়াশুনার সাথে সাথে বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, শিল্পচর্চা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, যৌথপ্রয়াসে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মোদ্যগের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার উন্মেষ করা যেতে পারে, এর মধ্য দিয়ে তার যে প্রাবৃত্তিক শক্তি রয়েছে তার যথার্থ নিয়ন্ত্রণও হতে পারে—মানসশক্তিনিচয় সুষমভাবে বিকশিত হতে পারে। স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে আনন্দ শিশু-শিক্ষার্থী পায় তা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয় এর মধ্য দিয়ে তার মৌলিক চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তিও ঘটতে পারে। এ সব কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে ভালবাসতে শেখে—বিদ্যালয়ের সাথে একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে; তাছাড়া শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থী যদি বিদ্যালয়কে ভালবাসে তাহলে বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা তারা আপনা-আপনি মেনে চলে—বিদ্যালয়ের কোন অগৌরব তাদের আহত করে। কাজেই সহপাঠক্রমিক ক্রিয়া-কলাপের অবতারণার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়াস করা হয় তাহলে তা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবেই রক্ষা করা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে যদি এ সকল কর্মপ্রয়াসের অভাব থাকে এবং জোর করে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ওপর থেকে চাপ দেওয়া হয়, অনবরত শাস্তির ভয় দেখানো হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরমধ্যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হয়—বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা নেতি-বাচক প্রতিন্যাসের (negative attitude) উদ্ভব হয়। এ থেকে শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠে অমনোযোগ, অনগ্রসরতা, বিদ্যালয়ের আইন শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে ফেলার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তিজনিত যে অবদমিত প্রক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে জট

(complex) এর সৃষ্টি হয়, তা শিক্ষার্থীর আচার-আচারণকে বিকৃত ও সমস্যামূলক করে তুলে। সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিবেশকে ঘৃণা করে, ফলে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকারের সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয়।

(ঘ) **বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার অভাব :—**

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বর্তমান। একের সাথে অপরের অনেক বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রভেদ থাকে। বুদ্ধি, মেজাজ, বিশেষ সামর্থ্য, রুচি, প্রবণতা, পরিশ্রম করার শক্তি, অধ্যবসায়, এ সব বিষয়ে শিক্ষার্থীতে শিক্ষার্থীতে পার্থক্য কম বেশী বর্তমান। এ সকল ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে পাঠক্রম গ্রহণে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। পাঠক্রম নির্ধারণে যদি ভুল হয়ে যায়, যদি যথাযথ প্রযত্ন সহকারে ও পদ্ধতিতে শিক্ষা নির্দেশনা (Educational guidance) দেওয়া না হয়, এবং শিক্ষা-নির্দেশনার সাথে বৃত্তি নির্দেশনা (Vocational guidance) দেওয়া না হয়, তা হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে তার যথার্থ বিকাশ হয় না, ব্যর্থতা জীবনকে বিষণ্ণ করে তুলে। হীনমন্যতা ও নিরাপত্তা বোধের অভাব, দুশ্চিন্তাজর্জরতা প্রভৃতি শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেমন অনগ্রসরতা দেখা দেয়, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্বের মধ্যেও নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী হয় নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিতে চায়, না হয় শিক্ষার্থী নিজের শক্তিকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারছে না বলে, অপরের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়েছে বলে, একটা ক্ষোভ ও রাগ অনুভব করে—যা নানা প্রকার আক্রমণাত্মক কার্য্যের মাধ্যমে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

(ঙ) **পরীক্ষা পদ্ধতি :—**

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির উপর বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পরীক্ষা গ্রহণে যদি বিদ্যালয় সতর্কতা ও আন্তরিকতা অবলম্বন না করে ; পরীক্ষা নিয়ে, পরীক্ষা-পত্র যদি যথাযথভাবে দেখা না হয় এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপ যথাযথ না হয়, তা

হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষও বিক্ষোভ দেখা দেয়। আবার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন যদি পঠন-পাঠনানুগ না হয়, তা হলেও শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও পরীক্ষা প্রস্তুতির যথাযোগ্য বিচার করার সুযোগ পায় না, ফলে নিজের সম্বন্ধে নিজের সঠিক ধারণা তৈরী হতে পারে না। এর দ্বারা শেষ পরিণতি হিসাবে এমন হতে পারে যে, শিক্ষার্থীরা সামগ্রিক ভাবে পড়াশুনা সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে উঠতে পারে —পরীক্ষা বিষয়ে যদি শিক্ষকগণ সুবিবেচনা ও পক্ষপাত হীনতার স্বাক্ষর না রাখতে পারেন তাহ'লে পরিণামে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে—একটা ক্ষোভ তাদের ভিতরে ভিতরে জমা হতে থাকে। এর ফলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে নানা প্রকার সমস্যামূলক আচার-আচরণ, যেমন বিদ্যালয় হতে পলায়ন (Truancy) বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা নষ্ট করা, শিক্ষকদের অপমান করা, নেতিবাচক মনোভাব (Negativism) প্রভৃতি দেখা দেয়।

(চ) **উচ্ছৃঙ্খল ও অসামাজিক বিদ্যালয় পরিবেশ :—**

বিদ্যালয়ে যদি নিয়মশৃঙ্খলা না থাকে, বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম যদি অবিন্যস্ত ও এলোমেলো হয়, শিক্ষকদের ক্লাশে যাওয়া আসা যদি নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা পরিশীলিত না হয়, চিৎকার হৈ হুল্লোর যদি সর্বদা বিদ্যালয়ে চলতে থাকে তা হলে শিক্ষার্থী অশান্ত ও অস্থির পরিবেশের মধ্যে নিয়ত থেকে সমাজীকরণের (Socialization) সুযোগ ঠিক ভাবে পায় না। যথার্থ বিদ্যালয় পরিবেশ সমাজীকরণের একটি প্রধান শক্তি ও হাতিয়ার।

বৃহত্তর পরিপার্শ্ব :—

জন্মক্ষণ থেকে প্রথমে শিশু গৃহ-পরিবেশের প্রভাব-শক্তির দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, পরে কিছু বড় হয়ে সে আসে বিদ্যালয়ে, আরও বড় হয়ে বিদ্যালয়ের সাথে সাথে পারিপার্শ্ব-প্রভাব দ্বারাও সে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়। পিতামাতা, শিক্ষক ভিন্নও বাইরের ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় ক্রমে অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হয় এবং এইসব ব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মনের উপর ছাপ ফেলে —তার দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ, সার্বিকভাবে ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। দুষ্কৃতকারী অসামাজিক কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে যদি শিশু এই সময়ে আসে, তাহলে তার কোমল ও স্পর্শকাতর মনে এই সব ব্যক্তির আচার-আচরণ

প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে—নানাপ্রকারের আরামপ্রদ অথচ অসামাজিক চিন্তায় ও কাজে সে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নবযুবকালে এ রকম অস্বাস্থ্যকর প্রভাব ব্যক্তিত্বকে অসামাজিক ও বিকৃত করে তুলতে পারে।

এ ছাড়া পারিপার্শ্ব অবস্থার মধ্যে যদি অনেক খুনী, চোর প্রভৃতি দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি থাকে ও একটা স্থির সুসমঞ্জস ও সুস্থ জীবনাদর্শ না থাকে, যদি এতে আনন্দ-আহ্লাদ প্রকাশের কোন সুযোগ না থাকে, তা হলে শিশু এরকম পরিবেশে থেকে বিহ্বল ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কেননা বিদ্যালয়ে ও গৃহে তাকে যেরকম ভাবে চলতে উপদেশ দেওয়া হয়, তার চোখের সামনে সে তার কোন প্রকার চিহ্নই দেখতে পায় না। জীবনে তার কোন প্রতিফলনই দেখা যায় না। প্রচারিত আদর্শ ও জীবনে তার অনুশীলন, এর মধ্যে যত পার্থক্য থাকে, ততই শিশুর মনে দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। সে কেমন ভাবে চলবে, কী ভাবে ভাববে, তার কিছুই ঠিক করতে পারে না। সুখান্বেষী জীবন ক্রিয়ায় সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। যুদ্ধ, মহামারী, রাজনৈতিক উত্থান-পতন কালে এ রকমের অবস্থা প্রবল হয়ে ওঠে। এরকম অবস্থাই মানসিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন গৃহ-পরিবেশের (Broken Home Condition) অবতারণা করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রতিকূল পারিবেশিক প্রভাবের জন্য দুষ্ক্রিয়তা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়, কারণ প্রতিকূল পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে পঙ্গু করে ফেলে। দৈহিক কারণেই হোক বা মানসিক কারণেই হোক, বিপথগামী শিশুর মধ্যে একটা হীনমন্যতা বোধ, নিরাপত্তা-হীনতা এবং পিতামাতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মনোভাব কাজ করে। মৌলিক চাহিদা অপূর্ত্তিজনিত ও পিতামাতার যথোচিত ভালবাসা না পাওয়ার জন্য যে গভীর ব্যর্থতা ও হতাশার ভাব মনের মধ্যে কাজ করে, তা থেকে শিশুর মধ্যে একটা গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এরা প্রক্ষোভের দিক থেকে অপরিণত থেকে যায়। আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রায়শঃই পিতামাতা, বিদ্যালয় ও সমাজের উপর প্রতিফলিত হয়। এরা বাইরে যে সব অপরাধপরায়ণ ব্যক্তি থাকে তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকে, অসামাজিক ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করতে ভালবাসে। যখন যা মনে হয় তাই করে ফেলে, বিবেক-নির্দেশ মানার মত মানসিক সংহতি এদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না।

দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ উদ্ভবের কারণ ঃ—

বংশধারা ও পরিবেশের উপাদান

(সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হল)

বংশানুক্রমিক ঃ—

(ক) অস্বাস্থ্যকর বংশধারা—অর্থাৎ যে বংশে পাগল, খুনী, দুশ্চরিত্র, বুদ্ধিহীন, ব্যক্তিও এ্যাপিলেপসি প্রভৃতি রোগের প্রাবল্য দেখা যায়।

(খ) বুদ্ধির স্বল্পতা—সাধারণ দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৫-৯০ এর মধ্যে থাকে—১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক থাকে না, তবে তিনভাগের দুই ভাগ দুষ্কৃতকারীর বুদ্ধিই স্বাভাবিক বা স্বাভাবিক থেকে বেশী।

(গ) ভাষাজ্ঞানার্জনের ক্ষমতা কম, ফলে বিদ্যালয়ের পাঠোন্নতি বিঘ্নিত হয়।

(ঘ) কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকমের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও শক্তির অহেতুক প্রাবল্য দেখা যায়—যা থেকে আক্রমণধর্মীতা, অধিক-কর্ম চাঞ্চল্য, অস্থিরতা উদ্ভূত হয়।

গৃহ-পরিবেশ ঃ—

(ক) দারিদ্র্য ও এক বাড়ীতে অনেক লোকের গাদাগাদি করে বাস।

(খ) বাবা মা, ও বড় ভাইবোনদের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তা ও বড় রকমের অপরাধ পরায়ণতার নজির।

(গ) ভগ্ন গৃহ-পরিবেশ (Broken Home)—পিতামাতার মৃত্যু, তাদের মধ্যে নিত্যকলহ এমন কি বিচ্ছেদ, পিতামাতা কর্তৃক বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ; পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসা থেকে সন্তানের বঞ্চিত হওয়া—সবই ভগ্ন-গৃহ পরিবেশের বৈশিষ্ট্য।

---

1. A 'delinquent' environment consists of three main elements : a home in which parents are unsuccessful economically, are of not more average native ability, are of undesirable personal habits, and are of questionable morality, who are ineffective in discipline, unable to furnish emotional security, and inclined to reject their delinquent child both before and after his misdeeds ; a neighbourhood that is devised for adults, quite without safeguards for children, largely without safe outlets for emotional and social life, and full of unsatisfactory models and conflicting standards ; and a school that tries to make scholars out of nonacademic material and sometimes furnishes teachers who are too rejective in their attitudes. When all three elements are affecting the same unstable child at the same time, a delinquent is likely to be produced.

—Cole, Luella—Psychology of Adolescence.

(ঘ) নিরাপত্তার অভাব বোধ, গৃহে সর্বদা অস্থিরতা ও উত্তেজনা, পিতামাতার প্রাক্ষোভিক জীবনের (emotional life) ভারসাম্যহীনতা।

(ঙ) গৃহ-পরিবেশে যথাযথ ও ধারাবাহিক নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব।

(চ) পিতামাতা কর্তৃক সন্তান-প্রযত্নে অবহেলা, সন্তানকে মনের দিক থেকে প্রত্যাখ্যান বা সন্তান সম্পর্কে উদাসীনতা।

(২) **বিদ্যালয়-পরিবেশ :—**

(ক) বিদ্যালয়ের কাজকর্মে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব—সব কিছুতেই উদ্দীপনা ও প্রাচুর্য্যের অভাব।

(খ) বিদ্যালয়কে ভাল না লাগা।

(গ) বিদ্যালয় থেকে প্রায়ই পালিয়ে যাওয়া।

(ঘ) শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে অকারণে প্রত্যাখ্যানের মনোভাব প্রকাশ করা, শিক্ষার্থীর সাথে নির্দয় আচরণ, সব সময় তাদের উপরে কর্তৃত্ব করার আগ্রহী হয়ে থাকা।

বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ :—

(ক) সমাজ-পরিবেশে অনেক অপরাধী, খুনীর আদর্শ বর্তমান।

(খ) সমাজ-সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে শিশুদের যত্ন ও রক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকা।

(গ) শৈশবের ও নবযুবকালের শক্তির যথার্থ ও স্বাস্থ্যকর প্রবাহের ব্যবস্থা না থাকা।

(ঘ) সমাজে নীচমানের আত্মিক অনুশাসন বর্তমান বা কারো মধ্যে উচ্চমানের ও কারো মধ্যে নীচমানের আত্মিক অনুশাসন জনিত সমাজে দ্বন্দ্ব।

---

1. It is highly probable that some teachers also contribute to the creation of the delinquent child. They influence him, as they do all other children, through the emotional atmosphere of their classroom. If they are demanding, harsh, domineering and authoritarian, they arouse the aggressive hostility of the already rejected child, who now finds himself rejected once more....One can hardly blame him for hating school, for playing truant, or for leaving as soon as possible.

School discipline is sometimes so administered as to be thoroughly unacceptable even to well-balanced, normal children and adolescents. The effect upon delinquents is disastrous and stimulates them to even greater hostility toward their school.

—Cole, Luella : Psychology of Adolescence.

পারিবেশিক এইরকম প্রভাবের মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশ পর্য্যায় অতিবাহিত হওয়ার ফলে—শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা, নিরাপত্তাবোধ হীনতা ও প্রত্যাখ্যানের মনোভাব সৃষ্টি হয়, নিয়ত একটা হতাশা ও ব্যর্থতা অনুভব করে এবং এর জন্য একটা আক্রমণধর্মী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রাক্ষোভিক বিকাশ অপরিণত থেকে যায়। আক্রমণমুখীতা পিতামাতা, বিদ্যালয় এবং সমাজের দিকে প্রধাবিত হয়। পরিপার্শ্বে যে সব অসামাজিক ব্যক্তি থাকে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করার চেষ্টা করে—এদের সঙ্গে মেলামেশা করে, অসামাজিক কাজকর্ম করে অবদমিত আবেগের স্ফূর্তি ঘটিয়ে থাকে।

মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে দুষ্ক্রিয়তার কারণ ঃ—

মনঃসমীক্ষকদের মতে শিশু গৃহ-পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে পা বাড়াবার পূর্বেই অর্থাৎ অতিশৈশবকালীন ব্যক্তিত্ব বিকাশপর্বের মধ্যেই, শিশু পরবর্তীকালে দুষ্কৃতকারী হবে কি হবে না, তা নির্ণীত হয়ে যায়। সব শিশুই জন্মাবার পর দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত 'দুষ্কৃতকারীই' থাকে—কেননা তখন তাদের আচার-আচরণ সম্পূর্ণরূপে জৈবিক ও সুখান্বেষী কর্মপ্রয়াসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তাদের যা ভাল লাগে তাকেই তারা চায়—তাই পেতে চেষ্টা করে। এতে সমাজ পরিবেশের অনুমোদন আছে কি নেই, সে দিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিন বৎসর বয়স হওয়ার সাথে সাথে তাদের কিছু রয়ে সয়ে চলার অভ্যাস করতে হয়, কোন কোন আরামপ্রদ জিনিসকেও ছাড়তে শিখতে হয়, একটা জিনিসের বদলে অন্য একটা জিনিসকে পেয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। মোটের ওপর, তাদের শিখতে হয় যে, যা চাওয়া যায় তা সব সময় সে ভাবেই পাওয়া যায় না। বাবা মা'র ভালবাসা, মা'র কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া একদিকে, আর অন্যদিকে আরামপ্রদ কোন অবস্থা-এক্ষুণি পেতে ইচ্ছে করছে এমন কোন বস্তু—এ দুই এর দ্বন্দ্বে, বাবা মা'র ভালবাসা পাওয়ার জন্য তাদের কথা মত যা বর্জনীয় এমন বস্তুকে বর্জন করাই যখন শিশু শ্রেয় বলে শেখে তখনই তার মধ্যে বিবেক-সত্তা (Super-ego) গড়ে ওঠে। যদি শিশুর মধ্যে এ বোধ না জন্মে, যদি তার এ শিক্ষা না ঘটে, তাহ'লে সে, এই ক্ষণেই যা পাওয়া যাচ্ছে, তাকে পাওয়ার জন্য কোনকিছুর দিকেই তাকাবে না, বাবা মা'র শাসন বাক্যও তাকে নিরস্ত করতে পারবে না। শিশু যত বড় হতে থাকে, বাস্তব জীবনের সমস্যা ও বাধা নিষেধের সম্মুখীন তাকে তত হতে হয়—গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়—কিন্তু

যার মধ্যে শৈশবকাল থেকে বাবা মা'র মুখ চেয়ে, তাদের কথা মেনে, সময় বিশেষে কিছু ছাড়ার শিক্ষা না হয়, তারা বড় হয়ে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে পিছন দিকে চলতে থাকে অর্থাৎ শৈশবকালীন আচরণের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে, শৈশবকালে যেমন যখন যা মনে হত সেইরকম ভাবে চলতে চাইত, বড় হয়েও সেইরকম ভাবে চলতে চায়। বাবা মার ভালবাসা পাওয়ার জন্য আপাতমধুর কোনকিছুকে বর্জন করতে শিশু তখনই পারে, যখন বাবা মা'র কাছ থেকে সে ভালবাসা প্রযত্ন যথাযথরূপে পেয়ে থাকে—যথাযথ ভালবাসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে। বাবা মার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দুঃখকর অভিজ্ঞতা যদি কোন শিশুর মধ্যে থেকে থাকে, তাহ'লে বাবা মার ভালবাসা পাওয়ার জন্য সে কোন কিছু বর্জন করা, কোন কিছু ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না— এ নিয়ে তার মধ্যে কোন সংশয় ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না—পিতামাতার অকৃত্রিম ভালবাসাকে চেয়ে যদি সে না পায় তাহলে তার ভালবাসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়—বাবা মা'র প্রতি একটা গভীর রাগ জন্মে, সে রাগ নানাভাবে শিশু প্রকাশও করে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিশুর পিতামাতার সাথে সম্পর্ক-ধারা বহুলাংশে শিশুর ব্যক্তিত্বকে নিরূপণ করে। যদি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে, তাহলে তিন থেকে ছ'বৎসর বয়সের মধ্যেই, শিশুর মধ্যে বিবেকসত্তা (Super-ego) গঠিত হয় এবং একটি স্থির ও দৃঢ় বাস্তব সত্তাও (Ego) প্রায় গঠিত হয়ে ওঠে, যা বাস্তব জীবনে কোনটা গ্রহণীয় ও কোনটা বর্জনীয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একজন দুষ্কৃতকারী বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হলে তার সাথে যথাযথ ভাবে সামঞ্জস্য করে চলার চেষ্টার আগেই পিছনদিকে চলে যায় অর্থাৎ শৈশবে যেমন কোনকিছু না মেনে সুখান্বেষণে ছুটত, সেইরকমভাবে চলতে চায়। এদের মধ্যে বিবেকসত্তা (Super-ego) ঠিক ভাবে গঠিত হতে পারে না। সুপার-ইগো যদি একেবারেই অপুষ্ট ও দুর্বল থাকে, তা হলে দুষ্কৃতকারীর কোন অসুবিধা হয় না, কেননা তার প্রবৃত্তি তাকে যে দিকে তাড়িয়ে নেয়, সে সেদিকেই ছুটতে থাকে, বিবেকের সাথে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। কিন্তু প্রায়ই বিবেক-সত্তা এমন অপুষ্টভাবে গঠিত হয় যে, প্রবৃত্তিগত তাড়নের জন্য দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বিবেক-সত্তার কষাঘাতে অপরাধ বোধও প্রবলভাবে উপস্থিত হয়। বিবেক-সত্তা এমন দৃঢ় ও পুষ্ট থাকে না, যা যথার্থভাবে ব্যক্তিকে ঠিকপথে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, ব্যক্তি বিবেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ

হিসাবে আরও অসামাজিক কাজ করে বসে এবং এর মধ্য দিয়ে সে যেন নিজেকে আরও শাস্তি দিয়ে থাকে। প্রায়শঃই নিজের বিবেক-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, ব্যক্তি অক্ষমভাবে পরিপার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তিকে নিজের যন্ত্রণার জন্য দোষারোপ করে থাকে।

জীবন যতই জটিল হতে থাকে এবং বাস্তবের দাবী কঠিন হতে থাকে, শিশু ততই প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে থাকে। সে বাস্তব পরিবেশের দাবীর দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে প্রাথমিক প্রাবৃত্তিক ইচ্ছাগুলির চরিতার্থ করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকে। সে সুখান্বেষী (Pleasure Principle) ইচ্ছার দ্বারা চালিত হতে থাকে। কারও সম্বন্ধেই এদের কোন গভীর ভালবাসা বা আগ্রহ নেই যা এদের এইসব অসামাজিক কাজ করা থেকে বিরত করতে পারে। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন দুষ্কৃতকারীর ব্যক্তিত্বের কাঠামো এমন, যার প্রাবৃত্তিক প্রেষণা অত্যন্ত প্রবল, অথচ বিবেক সত্তা অত্যন্ত দুর্বল এবং বাস্তব সত্তা (Ego) প্রচলিত নিয়ম ধারাকে অগ্রাহ্য করে তাৎক্ষণিক সুখের দিকে সর্বদা ঝুঁকে থাকে। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের এরূপ সন্নিবেশ প্রায়শঃই তাকে দ্বন্দ্ব জর্জরিত করে রাখে এবং সে বাস্তব জগতকে সর্ব্বদা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এরকম ব্যক্তির পক্ষে দুষ্ক্রিয় আচরণ হল তার নিকট বিরক্তিকর ও ভীতিকর বাস্তব থেকে সবচেয়ে সন্তোষজনক আত্মরক্ষার উপায়।

দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ প্রতিরোধের সাধারণ উপায় ঃ—

সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিলে তার প্রতিকার ও নিরাময় অপেক্ষা সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা যাতে আদৌ দেখা না দেয় সেইরূপ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনই শ্রেয়। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, সমস্যামূলক আচরণের কারণ বংশক্রম ও পারিবেশিক প্রভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে। বিকৃত বংশক্রমের উপর আমাদের তেমন কোন হাত নেই। কিন্তু পারিবেশিক প্রভাবকে স্বাস্থ্যপ্রদ করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি।

পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যতটা সহজ বলে মনে হয় ততটা সহজ নয়। পরিবেশ বলতে আমরা যদি কেবল গৃহ পরিবেশ বুঝি বা বিদ্যালয় পরিবেশ বুঝি তাহলে ভুল করা হবে। সমাজ পরিবেশ, রাজনৈতিক আবহাওয়া সবকিছুকেই পারিবেশিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়া

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশকে প্রভাবিত করে। কাজেই সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধ করতে হলে সমাজ, বিদ্যালয়, গৃহ পরিবেশকে যথার্থরূপে স্বাস্থ্যকর করে রচনা করতে হবে। অনেক সময় অত্যন্ত সুস্থ পরিবেশের মধ্যেও দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ ছেলেমেয়েদের করতে দেখা যায়। সেজন্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী (Questionnaire)-ও অভীক্ষা (test) দিয়ে ছাত্রদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করে পূর্ব থেকে দেখে নেবেন কোন্ ছেলের অপরাধপরায়ন বা সমস্যামূলক আচরণ করার সম্ভাবনা কতটা রয়েছে। অধিকাংশ প্রাক্-দুষ্কৃত-কারীকে কোন অত্যন্ত গর্হিত অপরাধমূলক আচরণ করার পূর্বেই অভীক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধরা যায়। এ সময় থেকেই যদি যথাযথ যত্ন, পারিবেশিক প্রভাবকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও প্রয়োজন হলে প্রথম থেকেই মানসিক চিকিৎসা করা যায় তা হ'লে অপরাধপরায়ণতার কারণ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে পারে ও ব্যক্তিত্বকে সুস্থ করে তোলা যায়। কাজেই একদিকে পরিবেশকে সম্যকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার দিকে এবং এর মধ্য দিয়ে অপরাধ পরায়ণতাকে প্রতিরোধ করার প্রয়াস যেমন করতে হবে, অন্যদিকে শিশুদের উপর উপরোক্ত অভীক্ষা প্রভৃতি দিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে হবে কোন্ কোন্ ছেলের মধ্যে সুস্থ পারিবেশিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অপরাধ পরায়ণতার বীজ উপ্ত হচ্ছে। এদের ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, আক্রমণধর্মী ও প্রাক্ষোভিক আচরণে শিশুর মত অসংযত। এইসব ছেলেকে আলাদা করে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; না হলে ক্রমে এইসব ছেলে নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়া ও সমস্যামূলক আচরণ করে গৃহে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করবে ও সামগ্রিকভাবে অন্যান্য ছেলেদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা নিয়ে আসবে।

সুস্থ গৃহ-পরিবেশ :—গৃহ পরিবেশ এমন হবে যাতে শিশু নিজেকে নিরাপদ বোধ করে, পরিবেশ থাকবে শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ। বাবা মার মধ্যে শিশু দেখবে পরস্পর বুঝাপড়া, মতের মিল, তার সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি। শিশু গৃহে পাবে খেলাধুলার সুযোগ, আপন ছন্দে আনন্দের সাথে সে বড় হয়ে উঠবে। পরিবেশের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত খোলামেলা ভাব থাকবে। পরিবারে পরস্পরের সম্বন্ধ হবে মধুর ও পরস্পর বিশ্বাস নির্ভর। পিতামাতার সম্বন্ধ, পিতামাতা ও সন্তানের সম্বন্ধের মধ্যে কোথাও যেন কোন চিড় না থাকে।

প্রগাঢ় প্রীতি ও খোলা মন নিয়ে সবাই চলবে। শিশু যেন পিতামাতার নিকট থেকে ভালবাসা পায়, স্বীকৃতি পায়।

পিতামাতার আচরণ হবে সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিশুর প্রতি তাদের সুষম ভালবাসা থাকবে। অনাদর, অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন, কুশাসন, অতিরিক্ত শৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা, এর যে কোন একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং শিশুর মনের গভীরে নানাপ্রকার জটের (Complex) উদ্ভব ঘটায়। এ থেকে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

সুস্থ বিদ্যালয়-পরিবেশঃ—বিদ্যালয় হল সমাজীকরণের (Socialisation) প্রকৃষ্টতম স্থান। শিশু এ পরিবেশ থেকে যে কেবল জ্ঞান আহরণ করে তাই নয়, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রভৃতি পরস্পরের সংযোগ ও সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে সামাজিক হতেও অভ্যস্ত হয়। এই সকল সম্পর্ক যদি স্বাস্থ্যকর না হয় তা হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ ধারায় হতে পারে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষকই পিতামতার পরিবর্ত-স্বরূপ, সেই শিক্ষকের নিকট থেকে শিশু যদি যথাযথ প্রযত্ন, পরিমিত ভালবাসা ও স্বীকৃতি না পায়, তা হলে শিশুর মনে ক্ষোভ ও গভীর দুঃখের সঞ্চার হয়—এ থেকে শিক্ষক ও সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিশুর ধারণা ও প্রতিন্যাস নেতিবাচক হয়ে উঠে। কাজেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ হবে পরস্পর বিশ্বাস-ভিত্তিক ও প্রীতিপূর্ণ। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, এতে খেলাধুলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক ক্রিয়া-কাণ্ডের যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। খোলামেলা, প্রশস্ত পরিবেশ বিদ্যালয়ে রচনা করতে হবে।

পাঠক্রম, পঠন পদ্ধতি, সব কিছুই হবে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক। প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিত্বকে, তার মানস স্বাতন্ত্র্যকে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে তার বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ছাড়া বিদ্যালয়েও মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা প্রয়োগ করে কোন্ কোন্ ছেলের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তা বা সমস্যামূলক আচরণ করার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তা আবিষ্কার করা যেতে পারে। এইসব ছেলেদের জন্য পাঠক্রম আলাদারূপে নির্দ্ধারিত হওয়া সমীচীন, অর্থাৎ যে চলিত পাঠক্রমের জন্য অধিক মনযোগ, বিমূর্ত চিন্তা, প্রযত্ন অধ্যবসায় দরকার হয়, তা বাদ দিয়ে

অন্য কোন পাঠক্রম, যাতে হাতে-নাতে কাজ শেখা, শিক্ষার্থীর রুচি অনুযায়ী কিছু তৈরী করতে দেওয়া, এই রকমের কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হবে এইসব ছেলেদের ঠিকভাবে চলতে শেখানো, সামাজিক হতে সাহায্য করা এবং তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এমন কিছু শেখানো যার দ্বারা তারা উপার্জনক্ষম হতে পারে। এ সব ছেলেদের এমন বিদ্যালয়ে রাখতে হবে যেখানে সকাল থেকে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত এদের চোখে চোখে রাখা যায়। এদের বিদ্যালয়েই দুবার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, বিদ্যালয়ের যে খেলার মাঠ, তাতেই খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মাঝে মাঝে শিক্ষা-মূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব ছেলেদের বাড়ী ও পরিপার্শ্ব অবস্থার মধ্যে নানারূপ অস্বাস্থ্যকর প্রভাব কাজ করে—, সেইজন্য বিদ্যালয়কেই মূলতঃ গৃহ ও পরিপার্শ্ব অবস্থার সকল স্বাস্থ্যকর চাহিদা মেটানোর ভার নিতে হয়। এইসব ছাত্ররা যত বড় হতে থাকবে, তত তাদের প্রত্যক্ষভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এ শিক্ষা-লাভ করেই তাদের যথার্থ কর্মসংস্থান ঘটে। এই সব ছেলেদের সর্বস্তরেই তাদের আবেগ প্রকাশের সুনিয়ন্ত্রিত পথ-পন্থা (খেলা-গান) থাকা দরকার। এটা সত্য যে, বিদ্যালয়ে এইসব কর্মপ্রয়াসের অবতারণা করলেই যে ভাবী-সকল দুষ্কৃতকারীকেই, বিপথগামীকেই স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে, নিশ্চিত-ভাবে তা বলা যায় না, তবে উপরোক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলে অনেকটা যে কাজ হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ঃ—

দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে সমাজের দায়-দায়িত্ব অনেক। বস্তুতঃ সামাজিক পরিবেশ যদি অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ ও অসুস্থ থাকে, তা হলে তার প্রভাব চুঁইয়ে চুঁইয়ে গৃহ-পরিবেশ ও বিদ্যালয়-পরিবেশকেও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। কাজেই বৃহত্তরভাবে সমাজ পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করে তোলা একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে, সমাজ সংস্কার ও বৃহত্তর ভাবে সরকারের যে সব দায়-দায়িত্ব আছে তা সম্যকৃভাবে পালন করতে হবে।

(ক) শিল্পাঞ্চল ও বস্তিঅঞ্চলে যে সব পরিবার বাস করে তাদের আবাসিক অঞ্চলে পুনর্বাসন করা সমীচীন। এমন আইন প্রণীত হতে পারে

যে, যে সব পরিবারে সন্তান-সন্ততি আছে, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে আবাসিক স্থানে বাস করতে হবে। এতে সরকার এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে অল্প টাকায় সুন্দর সুন্দর বাড়ী আবাসিক পরিবেশে (শিল্পাঞ্চল থেকে দূরে) তৈরী করা যায় এবং এই অঞ্চলের আবাসিক চারিত্র-বৈশিষ্ট্য যাতে কেউ নষ্ট করতে না পারে তার জন্য আইন প্রণয়নও করা যেতে পারে।

যে সব অঞ্চল অস্বাস্থ্যকরভাবে ঘন বসতিপূর্ণ সে সব স্থানকে পরিচ্ছন্ন ও সুষম বসতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। ব্যবসা ও অপরিচ্ছন্ন শিল্পাঞ্চল ক্ষেত্রে যাতে কিশোর-কিশোরীরা অহেতুক গমনাগমন না করে, সরকারী পুলিশ সে দিকে নজর রাখবে, এবং যদি কোন সময়ে কোন ছেলে এ সব অঞ্চলে চলে আসে, পুলিশ এদের যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়ে আনবে।

খেলাধুলার জন্য পাড়ায় পাড়ায় মাঠ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পার্ক, সাঁতারকাটার পুল (Swimming pool), ক্লাব, সমাজ-কল্যাণকর ছোটখাট কাজের জন্য সমাজ সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো যেতে পারে। যেসব চলচ্চিত্র ছেলে-মেয়েদের বয়সোপযোগী নয়, অর্থাৎ যে সকল চলচ্চিত্র বা নাটকানুষ্ঠান অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মনে অকালে যৌন-বোধের সঞ্চার করে, অহেতুক ভয় প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার উদ্ভব ঘটায় সে সব অনুষ্ঠানে যাতে ছেলেমেয়েরা প্রবেশাধিকার না পায়, তার জন্য সমাজ সংস্থার ও সরকারের বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে হবে।

সমাজ-সংস্থা ও সরকারকে অনেক বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে ; জনসংখ্যা, স্থান ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে একই বিদ্যালয়ে ছাত্র বিস্ফোরণ না ঘটে। শিক্ষকদের মর্য্যাদা ও দক্ষিণা-মান এমন হবে যাতে তাঁরা সমাজে যথেষ্ট মর্য্যাদা লাভ করে এবং জীবনধারণের মানও স্বচ্ছন্দ ও উন্নত হয়—সমাজ এরূপ ব্যবস্থা করতে পারলে সুস্থ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও সত্যিকারের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা শিক্ষকতা বৃত্তিতে আকৃষ্ট হবেন এবং সুস্থ শিক্ষাদর্শ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বকে সুস্থভাবে গড়ে তোলা যাবে—সৎ নাগরিক গড়ে তোলা যাবে, পরোক্ষভাবে দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধ করা যাবে।

সুস্থ জীবন-যাপনে যেসব বাধা তা দূর করার জন্য সমাজ অগ্রণী হতে পারে—দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে, যে দারিদ্র্যের জন্য অগণিত ব্যক্তি অসুস্থ

জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। বেতন বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যের সীমা-নির্দ্ধারণ, শিক্ষা ও চিকিৎসার অবাধ সুযোগ প্রদান এবং প্রত্যেক নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির ব্যবস্থাদি করে, সাধারণের দারিদ্র্য দূর করতে হবে।

এটা ঠিক যে, এ সব ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলেই যে দুষ্ক্রিয়তা সমাজ জীবন থেকে একেবারে চলে যাবে তা নয়, তবে পরিবারে যে সমস্ত মৌলিক প্রয়োজনাদি রয়েছে তা মিটলে, পরিবার ও সমাজ-জীবন থেকে অনেক ব্যর্থতা হতাশা, অসুবিধা ও অভাব দূর করা যেতে পারে, যা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশকে অসুস্থধারায় নিয়ে যায়।

দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে :—

(ক) শিশুদের বিবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেমন শিল্প-চর্চা, সঙ্গীত-চর্চা, খেলাধুলা, যৌথ কর্ম, প্রভৃতি যার কোন-না-কোনটিতে সে আনন্দ ও যথার্থ সাফল্য দেখাতে পারে।

(খ) প্রত্যেকটি শিশুর যথার্থ শক্তি সামর্থ্য ও মানস-বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে। তাকে তার সামাজিক, বৌদ্ধিক, শৈল্পিক শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে হবে—তার মধ্যে যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক অপূর্ণতা রয়েছে তাকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকার করে নিতে হবে।

(গ) তাকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে, তার শক্তি সামর্থ্যকে তার প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে সে যত কম সম্ভব ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ও কর্ম কৌশল আয়ত্ত করতে পারে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিন্যাস ও পরিচালনা এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সমাজ-সচেতন হয়ে ওঠে ও পরস্পর মেলামেশার মধ্য দিয়ে আনন্দ ও স্ফূর্তি পায়।

(ঙ) আবেগের যাতে স্বাভাবিক বিকাশ হয় তার সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং যদি কোন ছেলেমেয়ে বাড়িতে বা শ্রেণীকক্ষে ছোট-খাটো খারাপ ব্যবহার করেও, তাকে অন্য কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে, তা এড়িয়ে যেতে হবে।

(চ) যদি কোন ছেলের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তা মূলক কোন আচরণ দেখা যায়, তার জন্য বিচলিত না হয়ে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে

এরূপ আচরণের কারণ নির্ণয় করতে হবে—সহৃদয়তার সঙ্গে তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

(ছ) গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশ থেকে এমন সব অবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হবে, তার স্বাভাবিক আচরণে অহেতুক শক্তিক্ষয় ঘটাবে অর্থাৎ অত্যধিক ভয়, পুঞ্জীভূত ক্রোধ, পদে পদে দ্বন্দ্ব, সংশয়, হতাশ বোধ প্রভৃতি ক্ষতিকর মানসিকতার উদ্ভব না ঘটে—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা যে, বিপথগামী শিশু বা কিশোরকে সুস্থ করে তুলতে হলে তাকে প্রথম আন্তরিক ভাবে ভালবাসতে হবে। যত কঠিন অপরাধই সে করুক না কেন—ভালবাসা দিয়ে তার হৃদয়-মনকে অভিসিঞ্চিত করতে হবে। অনুচ্চারিত প্রত্যাখ্যানের ভাবও শিশুর স্পর্শকাতর মন অনুভব করতে পারে, সে প্রত্যাখ্যান যত সুমিষ্ট বাক্য ও সুন্দর আচরণের মধ্য দিয়েই আসুক না কেন। যেহেতু প্রায়শঃই দুষ্কৃতকারী কিশোররা শৈশবকাল থেকেই অকৃত্রিম ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেইজন্য সামান্যতম ভালবাসার স্পর্শ, স্নেহের আপ্যায়ণও তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে—যা স্নেহ প্রীতিশূন্য হাজার রকমের নিষ্প্রাণ চিকিৎসার মধ্য দিয়েও করা সম্ভব হয় না।

Most of the recommended procedures for the prevention of delinquency or for its treatment during its early stages—are aimed at providing activities in which the child or adolescent can be successful, experiences that make him feel accepted, and outlets that are socially approved for his emotional drives. The attack upon the problem is indirect and consists essentially in substituting acceptance for rejection by means of activities that are within the established social norm but are more satisfying to the adolescent than his delinquency.

—Cole : Childhood and Adolescence.

অনুশীলনী

1. Elucidate the main causes of delinquent behaviour. How would you prevent children from developing such behaviour ?

2. How can you define problem behaviour ? Does it differ from delinquency ? If so, how ?

3. Elucidate the main causes of indiscipline in educational institutions. Mention a few remedial measures.

4. Show how the school may cause maladjusment among its pupils. Illustrate your answer.

5. Critically consider the problem of delinquency from the social, psychological and legal point of view.

6. Classify delinquency with suitable examples.

7. Discuss the role of the home in the aetiology of problem behaviour.

8. Psychologically interprete the causes of indiscipline in the school.

9. Estimate the uses of co-curricular pursuits in erradicating indiscipline from the school.

10. Evaluate the relative concern of exogenic and endogenic factors responsible for the causation of problem behaviour and delinquency.

11. Elucidate the nature of problem behaviour with appropriate illustrations and show how they should be tackled.

একাদশ অধ্যায়

মানসিক রোগের প্রকার

(Types of Mental Diseases)

দেহের রোগের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে এ সম্পর্কে এখন পর্যন্তও আমাদের ধারণা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষীণ। দেহের রোগের যেরূপ কতকগুলি সংলক্ষণ (Symptoms) আছে, মানসিক রোগেরও তেমনি কতকগুলি রোগ-লক্ষণ দেখা যায়। দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক থেকে বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, গা বমি বমি করা, শরীরের কোন অংশে ব্যথা, ক্ষুধার অভাব, অজীর্ণতা প্রভৃতি এইরকম অনেক সংলক্ষণ দেহের রোগের বেলায় দেখা যায়। মানসিক রোগের বেলায়ও এরূপ অনেক রোগ-সংলক্ষণ দেখা যায়—যেমন একা একা কথা বলা, অহেতুক হাসাকাঁদা, মাত্রাধিক অস্থির উত্তেজনা, কখনো বা অকারণে পথচারী বা প্রতিবেশীকে মারধর করতে যাওয়া, গালমন্দকরা, জিনিসপত্র ভাঙ্গাচোরা অথবা একান্তে সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ভীষণভাবে নীরব হয়ে যাওয়া। এইরকম আচার-আচরণ, বিকৃত চিন্তাধারা ও চলাফেরা থেকেই বোঝা যায় যে, ব্যক্তি অপ্রকৃতস্থ।

দেহের বিভিন্ন অংশের সুষম নিয়মতান্ত্রিক কার্য্যকারিতার অভাব হেতু দেহের রোগ ঘটে এবং ফলে ভৌতিক জগতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা সম্ভব হয় না। মনের সুষম ও সংহত ক্রিয়া পথে যদি অন্তরায় সৃষ্টি হয় তা হলে মনের রোগ দেখা দেয় ও মনের রোগের জন্য সামাজিক সম্পর্ক ঠিক ভাবে রক্ষা করে চলা সম্ভব হয় না, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্য-কর্ম ও সঙ্গতিসাধন নানাভাবে বিঘ্নিত ও বিকৃত হতে দেখা যায়।

শরীরের রোগের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে এটা আমাদের কাছে কিছুটা অবোধ্য। দেহের কোন রোগ নেই, মস্তিষ্কের কোন বিকলতা নেই, অথচ মনের রোগ হয়েছে, এও কি সম্ভব? মন মানেই আমরা ধরে নিই মস্তিষ্ক এবং এই কারণে কোন ব্যক্তির আচার-আচরণে কোন প্রকার বৈকল্য দেখলেই আমরা ধরে নেই ব্যক্তির মস্তিষ্কে কোন প্রকার বৈকল্য ঘটেছে ; আমরা খুব

কথ্য ভাষায় বলে থাকি 'ওর মাথায় স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে'—অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোন বিকলতা না হলে যেন মনের কোন রোগ ঘটতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে বহু গবেষণা প্রমাণ করেছে যে দেহস্থিত মস্তিষ্কের কোন প্রকার গাঠনিক পরিবর্তন ছাড়াই মনের বিকৃতি ও রোগ হতে পারে। মনে যার রোগ, দেহ তার সুঠাম ও নিখুঁত থাকতে পারে। দেহজ কোন কারণ ছাড়াই মনের অসুখ হতে পারে। মানসিক রোগের নিরঙ্কুশ ভাবে, দেহজ রোগ ব্যতীতও একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। যদিও মনের রোগের জন্য দেহ বা দেহের রোগহেতু মনের বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

দেহের রোগের যেরূপ প্রকারভেদ আছে, যেমন, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি মানসিক রোগেরও প্রকারভেদ আছে। সাধারণভাবে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আমরা পাগল বলে থাকি, তার আচার ব্যবহার সমাজসঙ্গতিহীন। এই সকল পাগল আখ্যায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে যে একটা অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ আছে, যে যন্ত্রণা দেহের রোগ যন্ত্রণা অপেক্ষা এতটুকু কম নয়, এ বিষয়ে সাধারণভাবে আমরা অনবহিত থাকি। দেহ রোগের সংলক্ষণ অনুযায়ী যেরূপ আমরা দেহের রোগের শ্রেণীকরণ করতে পারি, মানসিক রোগেরও সংলক্ষণ বিশেষে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। প্রধানতঃ মানসিক রোগ দুই প্রকারের ঃ

(ক) **উৎকেন্দ্রিক বা উদ্বায়ু (Neuroses)**

(খ) **উন্মাদ রোগ বা বাতুলতা (Psychoses)**

উৎকেন্দ্রিক ও উন্মাদদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট পার্থক্য প্রতীত হয়। উৎকেন্দ্রিকদের সমাজবোধ ও চেতনা প্রায় অটুট থাকে, সমাজের সাথে মোটামুটি স্বাভাবিক সঙ্গতি রেখে এরা চলতে পারে। এবং এরা যে মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ নয় এ বোধও এদের মধ্যে বর্তমান থাকে, রোগ-নিরাময়ের জন্য আত্ম-প্রয়াসও এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উন্মাদ বা বদ্ধ পাগলদের সমাজ ও বাস্তববোধ প্রায় লোপ পায়, আচার-আচরণের বাহ্যিকভাবে কোন প্রকার সঙ্গতি থাকে না, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না, এরা যে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ এ বিষয়েও তারা অজ্ঞান থাকে—রোগ-নিরঞ্জনের সামান্যতম প্রয়াসও পরিদৃষ্ট হয় না।

উৎকেন্দ্রিকতাকে (Neuroses) রোগ-সংলক্ষণ অনুযায়ী প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (ক) হিষ্টিরিয়া (Hysteria), (খ) নিউরাসথেনিয়া

(Neurasthenia), (গ) এ্যাংজাইটি স্টেট্ (Anxiety state) এবং (ঘ) সাইকাসথেনিয়া (Psychasthenia)।

হিষ্টিরিয়া :—

নিউরোসিসের যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে তার মধ্যে হিষ্টিরিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ রোগের নামের সাথে আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। মেয়েদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক এইটেই আমাদের ধারণা। 'হিষ্টিরিয়াতে ফিট' এর কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি, কেউ কেউ দেখেছি, কিন্তু এ রোগটি যে একটি মানসিক রোগ, সে বিষয়ে আমরা প্রায়ই অনবহিত। এ রোগের কারণ সম্পূর্ণভাবে মানসিক, দেহগত নয়। হিষ্টিরিয়া বলতে আমরা কেবল মুর্চ্ছা যাওয়া বুঝে থাকি। কোন কোন ক্ষেত্রে হিষ্টিরিয়া রোগে মূর্চ্ছা যায় বটে, কিন্তু প্রত্যেক হিষ্টিরিয়া রোগীই যে মূর্চ্ছা যাবে এমন কোন কথা নেই। মূর্চ্ছা ভিন্নও আরও নানাপ্রকারের রোগ-সংলক্ষণ হিষ্টিরিয়াতে দেখা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি মানসিক।

হিষ্টিরিয়া তিন প্রকারের হতে পারে :

(ক) কনভারসন্ (Conversion)
(খ) ফিক্সেসন্ (Fixation)
(গ) এ্যাংজাইটি (Anxiety)

(ক) **কনভারসন্ হিষ্টিরিয়ার** উদাহরণ, দেহের কোন অংশ যেমন হাত, পা অসাড় হয়ে পড়া (Paralysis) কখনো কখনো হাতে পায়ে ভীষণ রকমের ব্যথা, পেপ্‌টিক আলসার (Peptic Ulcer), রোগীর দেহের কোন অংশের সংবেদন্ ক্ষমতা লুপ্ত হওয়া, হঠাৎ অন্ধ বা বধির হয়ে যাওয়া। তোতলামি এমনকি বাক্‌শক্তি রহিত অবস্থাও হতে পারে। দৈহিক এ সকল উপসর্গগুলো যে সম্পূর্ণরূপে মানসিক কারণেই ঘটে থাকে তা বহুভাবে প্রমাণ সিদ্ধ। দেখা গেছে যে, যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল তার বস্তুতঃ চোখের কোন অঙ্গগত ও গঠনগত বিচ্যুতি নেই, যার সংবেদন-ক্ষমতা রহিত হল তার দেহের কোষ ও সেখানকার স্নায়ুকোষের কোন বিকৃতি ঘটেনি—এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে "প্রবল প্রক্ষোভ সংযুক্ত বাসনা দমিত (repressed) হলে সেই প্রক্ষোভ সেই বাসনাটিকে পরিত্যাগ করে অন্য উপায়ে মুক্তি পেতে চায় এবং মানসিক জগৎ ত্যাগ করে শরীরের ওপর

প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রক্ষোভ মস্তিষ্কের উচ্চ কেন্দ্রের (Cerebrum) ওপর বাধা সৃষ্টি করে বলে রোগীর সংজ্ঞালুপ্তি হয় এবং সংবেদনের অভাব দেখা দেয়।" * (ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : নিজ্র্জান মন)

(খ) **ফিক্সেসন হিষ্টিরিয়া :**—এতে দেহের যে অংশ পূর্বে কোন দৈহিক রোগে অসুস্থ ও জীর্ণ হয়ে পড়েছিল সেই অঙ্গ বা দেহের অংশ সম্পর্কে রোগী অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই অংশ কখনও কখনও অসাড় ও অকর্মন্য হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রেও দমিত প্রক্ষোভ জীর্ণ দেহাংশের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভের প্রয়াস করে। দৈহিক রোগের একটা ইতিহাস পূর্ব থেকেই এ সব ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে।

(গ) **এ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয়া :**—অহেতুক ভয় ও দুশ্চিন্তা এই প্রকার হিষ্টিরিয়ার প্রধান লক্ষণ। এই দুশ্চিন্তা এমন প্রকট ও তীক্ষ্ণ হতে পারে যে, রোগীর স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ (dissociation) দেখা দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রোগীর আপন স্বরূপ ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা নষ্ট হয়, এমনও হতে পারে যে, রোগী তার নাম, ঠিকানা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং অতীত জীবনের কথা স্মৃতিপথে আনতে পারে না। পূর্বস্মৃতি এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না ; সম্পর্ক ও চলাফেরা প্রায় স্বাভাবিকই থাকে অর্থাৎ হিষ্টিরিয়াতে যে স্মৃতিবিভ্রম দেখা যায় প্রায়শঃই তার জন্য অব্যবহিত কোন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। কখনও কখনও রোগী ঘুমের ঘোরে চলতে থাকে (Somnumbulism)—এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, ব্যক্তিত্বের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ ঘুমের ঘোরে নানাপ্রকার কাজে ব্যাপৃত হয়। লেডী ম্যাকবেথের মধ্যে এরকম একটা অবস্থা আমরা দেখতে পাই। রাজাকে হত্যা করার ফলে তার মনের মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও সুতীব্র দুশ্চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাজাকে হত্যা করার দৃশ্য তিনি মনে মনে পুনরাবৃত্তি করেছেন ও মন থেকে রক্তাক্ত দৃশ্যপট মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা করেছেন। মোটের উপর এ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয়াতে কার্যকারণ সম্পর্কহীন অত্যধিক দুশ্চিন্তা ও ভয় প্রকট থাকে। এই ভয় নানাপ্রকারের হতে পারে—যেমন নির্জন জায়গার ভয়, রোগের ভয়, উচ্চস্থান থেকে পতনের ভয় প্রভৃতি।

নিউরাসথেনিয়া (স্নায়বিক অবসাদ) :—নিউরাসথেনিয়ার প্রধান সংলক্ষণ হল আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অত্যধিক মানসিক ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা জর্জরতা। বর্তমানে

নিউরাসথেনিয়া ও এ্যাংজাইটি ষ্টেট-এ দুটি রোগকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বদাই একটা ক্লান্তির ছাপ (দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি) রোগীর চোখে মুখে দেখা যায়। একটা নিরুৎসাহ ভাব, অমনোযোগিতা এদের মধ্যে সুস্পষ্ট থাকে। যেহেতু এদের ক্লান্তির কারণ মানসিক, সেহেতু অনেক বিশ্রামের ফলেও এ ক্লান্তি দূরীভূত হয় না। আবার এ ক্লান্তি সব বিষয়েই দেখা যায় না—দেখা যাবে কোন ব্যক্তি কাজের বিষয়ে পাঁচমিনিট কথা বললে ক্লান্তি বোধ করে কিন্তু নিজের অসুস্থতার কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলেও ক্লান্তি বোধ করে না।

শারীরিক দিক থেকে কতকগুলো লক্ষণ দেখা দেয়—যেমন ঘাড় মাথা ও পিঠে সবসময় একটা ব্যথার ভাব। অজীর্ণতা ও অনিদ্রাও খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের রোগ সম্বন্ধে সর্বদা অত্যধিক সজাগ থাকে ; রোগ নিরাময়ের জন্য এক চিকিৎসকের কাছ থেকে অন্য চিকিৎসকের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। শারীরিক কোন রোগ না থাকলেও মনে মনে সর্বদা সে নিজেকে কোন-না-কোন ভাবে অসুস্থ বোধ করে। একটা বিষণ্ণ ভাব সদা মনকে ক্লিষ্ট করে। ফ্রয়েডের মতে অত্যধিক স্বমেহন অথবা কল্পনায় অস্বাভাবিক যৌন ব্যাপৃতিহেতু যে অপরাধ বোধ ও দ্বন্দ্ব, চিত্তবিক্ষেপ, বিষণ্ণতা ও অবসাদ দেখা দেয়, তাকেই বলা হয় নিউরাসথেনিয়া।

এ্যাংজাইটি ষ্টেট (উৎকণ্ঠাবস্থা) :—এই অবস্থায় রোগী সর্বদাই দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত থাকবে, কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ কিছু নির্দিষ্ট থাকবে না এবং এই দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সম্পর্ক বর্জিত হবে। যেমন—দূরদেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠতে ভয়, কোন প্রকারে ট্রেনে যদিও বা ওঠে, ওঠার পর নানাপ্রকারের ভয়, ভয় অর্থাৎ দুশ্চিন্তার বিষয়বস্তুটি সর্বদাই পট পরিবর্তন করে। এ ভয় ও দুশ্চিন্তা গন্তব্যস্থান সম্পর্কে কোন বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে নিবদ্ধ থাকে না। রোগীর মনোযোগ আকর্ষণকারী শেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভয় ও দুশ্চিন্তা ঘোরাফেরা করতে থাকে। এ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয়ায় ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ায় একটি অবান্তর অথচ নির্দিষ্ট কারণ থাকে কিন্তু এ্যাংজাইটি ষ্টেটে দুশ্চিন্তা অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে অর্থাৎ এই রূপ ভয় ও দুশ্চিন্তা ভাসমান অবস্থায় থাকে (free floating anxiety)।

ফ্রয়েডের মতে এরূপ ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ যৌনজীবনের মধ্যে নিহিত থাকে যেমন, যদি কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে মিলিত হওয়ার কথাবার্তা

বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে অথচ সেই মিলন প্রস্তাব কার্যতঃ ফলপ্রসূ না হয় তাহলে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের মধ্যেই দুশ্চিন্তা জর্জরতা দেখা দেয়; এ ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে বৈধব্য, বিবাহিত জীবনের নানাবিধ অসংগতি যৌন ইচ্ছা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে তা থেকেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা দেখা দিতে পারে। অত্যধিক পুঞ্জীভূত মানসিক উত্তেজনা স্নায়বিক ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে অবসন্নতা, দুশ্চিন্তা ও ভয় দেখা দেয়। এর সঙ্গে শারীরিক দিক থেকেও কতকগুলো লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন, বুক কাঁপা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অনিয়মতা, মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট হওয়া, হাতের তালু ঘেমে ওঠা, রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে অত্যধিক ভাবে ঘর্মাক্ত হওয়া, মুখ শুকিয়ে আসা, ক্ষুধার ভাব না থাকা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোলাইটিস (colitis) প্রভৃতি উপসর্গ ও রোগের উদ্ভব ঘটতে পারে।

সাইকাসথেনিয়া (মনদৌর্বল্য) :—

সাইকাসথেনিয়ার অন্তর্গত দুই প্রকার মনোবিকার—(ক) আবেশিক ও অনুকর্ষী বায়ু (obsessive compulsive reactions) এবং (খ) ভয় (phobias)। এই দুই প্রকার বিকৃতির যে লক্ষণ তার উৎস-কারণ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এই জন্য বর্তমানে সাইকাসথেনিয়া নামটির ব্যবহার প্রায় অপ্রচলিত।

(ক) **আবেশিক বায়ুর** প্রধান সংলক্ষণ হল অপ্রতিহত ও নিয়ত উদ্যত কতকগুলি ইচ্ছা যা কোন বিষয়ে কিছু বলতে, করতে, বা চিন্তা করতে ব্যক্তিকে সতত তাড়া করে। কোন বস্তুকে বার বার ধরার ইচ্ছা, কোন শব্দকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার উচ্চারণ করা, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ি গোনা বা শরীরের কোন অংশ যেমন চোখের পাতা, ঘাড়, হাত বা পা বারবার সঞ্চালন করা। মোটের উপর, আবেশিক বায়ু বলতে আমরা বুঝি কতকগুলো ধারণা ও চিন্তা, যে ধারণা ও চিন্তার উপর ব্যক্তি বিশেষের কোন প্রকার ঐচ্ছিক অনুশাসন কাজ করতে পারে না। এইসব চিন্তার উপস্থিতি ব্যক্তির পক্ষে যদিও অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক তবু এইসব চিন্তা তার মধ্যে বার বার আনাগোনা করতে থাকে ও একটা বিরক্তিকর চিন্তার পরগাছা যেন মনকে আঁকড়ে থাকে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, আবেশিক রোগ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। এক শ্রেণীর রোগলক্ষণ কেবল মনোজগতে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন কোন ব্যক্তির

মধ্যে একটি বিরক্তিকর চিন্তা বারবার ব্যক্তিকে বিতাড়িত করছে। ব্যক্তিটির ভগবানে হয়ত অগাধ বিশ্বাস কিন্তু তার মধ্যে ভগবানের কোন মূর্তি সম্বন্ধে এমন সব কুৎসিত চিন্তা আসতে থাকে যে সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। একজন সওদাগরী অফিসকর্মীর সর্বদাই মনে হত এই বুঝি তার সব ভুল হয়ে গেল, যোগ করতে ভুল হয়ে গেল, সেজন্য যেটা একবার যোগ করলেই চলে সেটা সে দশবার না করে কিছুতেই থাকতে পারে না। এতেও মনে হয় "বোধহয় ভুল কিছু রয়ে গেল," এইসব ব্যক্তির কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় প্রকারের আবেশিক রোগে দেখা যায় যে, ব্যক্তি কোন একটা বিশেষ কাজে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার নিযুক্ত হয়। যেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত কোন ব্যক্তি দেহের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য দিনে ছয় সাত বার স্নান করছে; বার বার স্নান করেও তার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না। শরীরের কোথাও ময়লা লেগে আছে এই আশঙ্কায় সে সর্বদা শশব্যস্ত। এই পরিচ্ছন্নতার উদবায়ু কখনও কখনও ঘরদোর বারবার লেপা-পোছা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। কেউ কেউ পথ দিয়ে যেতে যেতে সামনে যত মন্দির, মসজিদ, গীর্জা পড়বে তাতে বারবার প্রণাম করবে কিংবা বিশেষ একটা অঙ্গভঙ্গীর বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে। কেউ কেউ আবার ঘরে তালা দিয়ে, তালা দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা দেখার জন্য বারবার ফিরে এসে তালাটা টেনে টেনে পরীক্ষা করবে।

(খ) **ভয় (phobias)**—ভয়রূপ আবেগ সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। স্বাভাবিক ভয়ে সর্বদাই একটি বাস্তব কার্য্যকারণ সম্পর্ক থাকে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে ভয়ই প্রাণীকে সন্ত্রস্ত ও সতর্ক করে তোলে ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে, জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব্বকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু অস্বাভাবিক ভয় (phobia) সর্বদাই অকারণ অথবা কখনও কখনও এমন অবাস্তব কারণ বর্তমান থাকে যা স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রকারেই ভয়ের উদ্রেক করতে পারে না। এরূপ ভয়ে যারা বিপর্যস্ত তারা প্রায়শঃই ভয়ের কারণ সম্বন্ধে অবহিত থাকে না। অথচ এই অদৃশ্য কারণটিই তাদের সর্ব্বদা বিব্রত ও সন্ত্রস্ত করে রাখে, শারীরিক দিক থেকেও স্বাভাবিক ভয়ে যে সব পরিবর্তন ঘটে, যেমন হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া, দম বন্ধ হয়ে আসা,

হাত-পা ঘেমে ওঠা এমন কি মূর্চ্ছা যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ অবাস্তব ভয়ের (phobia) ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

আবেশিক ভয়ের ক্ষেত্রে (phobia) ব্যক্তির ভয়ের আপাততঃ কোন নির্দিষ্ট অবাস্তব কারণ থাকবে যেটা আমরা এ্যাংজাইটি ষ্টেটের যে ভয় তাতে দেখতে পাই না। অর্থাৎ এ্যাংজাইটি ষ্টেটের ভয়ও অবাস্তব কিন্তু এ ভয়ের কারণের কোন নির্দিষ্ট প্রকৃতি থাকে না। একে আমরা ভাসমান ভয়ও (free floating anxiety) বলতে পারি—যেমন ট্রেন ধরতে ভয়, ছেলে রাস্তায় গেলে ভয়, নতুন কোন লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে ভয়, পথ চলতে ভয় ইত্যাদি।

আবেশিক ভয় বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন, (ক) উন্মুক্ত স্থানের ভয় (Agorophobia) (খ) অন্ধকারের ভয় (Nictophobia) (গ) রোগের ভয় (Patho phobia) (ঘ) একাকীত্বের ভয় (Mono phobia) (ঙ) কোন বিশেষ জন্তু জানোয়ার বা আরশোলা জাতীয় পোকামাকড়ের ভয় (Zoo-phobia) প্রভৃতি।

"ভয় ও উৎকণ্ঠা রোগের ক্রমবিকাশের একটি ধারা আছে। এ রোগের প্রারম্ভে রোগীর মনে উৎকণ্ঠা ভেসে বেড়ায়, দিনরাত সর্বক্ষণ তুষের আগুন যেন ধূমায়িত হতে থাকে। তার মন এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খোঁজে এবং সে পথ আসে দুদিক থেকে। প্রথমতঃ ভাসমান ভয়ের ব্যাপ্তি সংকুচিত হয়ে বস্তু বিশেষের উপর ভর করে (phobia)। এই প্রক্রিয়াটিকে একটি বিশাল স্ফীতির ছোট স্ফোটকে পরিণত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভাসমান ভয় যখন বস্তুবিশেষের ভয়ে রূপান্তরিত হয় তখন মানসিক কষ্টের লাঘব হয়। দ্বিতীয়তঃ শারীরিক রোগলক্ষণের আবির্ভাব। দৈহিক রোগের আবির্ভাবে ভয়ের তীব্রতা অনেকটা কমে আসে; এমন কি অনেক ক্ষেত্রে একেবারে তিরোহিত হয় (Anxiety hysteria & Conversion hysteria)"।

সাইকোসেস (Psychoses) বা উন্মাদ রোগ :—

সাইকোসেস সাধারণতঃ দুই প্রকারের :—(ক) মনঃকারণগত (functional) (খ) দৈহিক কারণগত (organic)। নিউরোসিস বা উৎকেন্দ্রিকতা সর্বতোভাবে মনঃকারণগত কিন্তু সাইকোসিসের বেলায় দেখা যায় যে, এর কতকগুলি রোগ দেহ সঞ্জাত। মনঃকারণগত উন্মাদ রোগে (psychosis) রোগীদের রোগলক্ষণের জন্য তাদের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা

অস্বস্থতা নির্ণয় করা যায় না। অথচ এদের ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে কাজ করে না—এদের সমস্ত চিন্তা, চলাফেরা, কথন আপাত দৃষ্টিতে বাস্তব সম্পর্ক বিবর্জিত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিতে অক্ষম; ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusion), অলীকবীক্ষণ (hallucination), আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি সংলক্ষণগুলি এদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

মনোবিদগণের মতে মনের কার্য্যকলাপের বিকৃতিজনিত যে উন্মাদরোগ (Functional Psychoses) ঘটে তার সমস্যা অনেকটা উৎকেন্দ্রিক রোগের মত, উন্মাদ রোগেও রোগীরা তাদের প্রবল বিকৃত দুশ্চিন্তার হাত থেকে নানা-প্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে মুক্তির প্রয়াস করে। উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগীরা যে উপায়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে, সে সব উপায়ে উন্মাদ বা সাইকোটিকস্‌রা নিজেদের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না—কেননা তাদের মানসিক জটিলতা এত প্রবল ও প্রকট যে উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগীদের ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করার যে কৌশল-প্রয়াস তা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ বলে প্রতীত হয়। উন্মাদদের আচরণকে, আমরা মানসিক আঘাতজনিত যে প্রবল দ্বন্দ্ব ও দুশ্চিন্তা, তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার শেষ প্রয়াস বলতে পারি। যদিও উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের চেয়ে উন্মাদ-দের পরিবর্তন অনেক বেশী গুরুতর এবং গভীর, তথাপি উভয় শ্রেণীর রোগের কারণ একই, অর্থাৎ কামজ বাসনার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব।

উন্মাদ রোগে সংলক্ষণমূলক আচরণের পিছনে যে কারণ কাজ করে, তাকে সহজেই আবিষ্কার করা যায় না। উন্মাদ রোগী চিকিৎসকের সঙ্গে কোন ভাবেই সহযোগিতা করতে চায় না। তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, উৎকেন্দ্রিক রোগের সংলক্ষণের ও আচরণের মধ্যে যে অস্বাভাবিক ভয়ের ভাব থাকে উন্মাদ রোগের সংলক্ষণের মধ্য দিয়েও সেইরূপ অস্বাভাবিক ভয়ই প্রকাশ পায়। সর্বদাই একটা ধ্বংসের ভয় প্রচ্ছন্নভাবে উন্মাদদের দৃষ্টি-গোচরে ভাসে, কোন বাস্তব সমস্যাকে যথার্থভাবে পরীক্ষা করে দেখা ও তার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা তাদের মধ্যে একেবারে লোপ পায়। এদের ব্যক্তিত্বের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে, দেখলে মনে হয় যেন এরা আর আগের লোক নেই—চিন্তা, ভাবনা, চোখের চাহনি সব যেন বিশৃঙ্খল ও ভয়াচ্ছন্ন। উন্মাদদের ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এই সকল উন্মাদের আচরণ এক প্রকারের নয়। আচরণের তথা রোগ সংলক্ষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী মানসিক কারণগত উন্মাদ রোগগুলিকে নিম্নলিখিত

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) ম্যানিয়া (Mania), (২) মেলানকোলিয়া (Melancholia), ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ-সাইকোসিস্ (Manic-depressive-Psychosis), (৪) প্যারানইয়া (Paranoia), (৫) সিজোফ্রেণিয়া (Schizophrenia)।

(১) **ম্যানিয়া :—**

এ রোগের প্রধান লক্ষণ অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা, একা একা অনর্গল রোগী অবাস্তব ও অসংলগ্ন কথা বলে যায়, পূর্বের ভুলে যাওয়া অনেক কথা তার স্মৃতি পথে উঁকি দিতে থাকে। 'মনের সব বাঁধ যেন তার ভেঙ্গে যায়।' অহেতুক ও অস্থিরভাবে হাত পা ছোঁড়া, অত্যধিক অপ্রাসঙ্গিক কর্মচাঞ্চল্য, মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মারধর করতে যাওয়া, ম্যানিয়া রোগের লক্ষণ।

রোগলক্ষণের তারতম্য অনুসারে ম্যানিয়াকে আবার চারভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) হাইপো ম্যানিয়া (Hypo mania)
(খ) এ্যাকুট ম্যানিয়া (Acute mania)
(গ) ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া (Delirious mania)
(ঘ) ক্রনিক ম্যানিয়া (Chronic mania)

ম্যানিয়া যে প্রকারেরই হোক না কেন তিনটি সংলক্ষণ সকল প্রকার ম্যানিয়াতেই বর্তমান থাকে, যেমন (১) অস্থিরতা, (২) ভাবনা বিষয়ের মুহুর্মুহু পরিবর্তন (৩) পুনঃ পুনঃ অঙ্গ সঞ্চালন।

(ক) **হাইপো ম্যানিয়া** তে এই সংলক্ষণগুলো কম মাত্রায় থাকে—রোগীকে আপাতদৃষ্টিতে খুব চঞ্চল ও প্রাণবন্ত মনে হয়, কিন্তু এ রোগ যত বেড়ে যায়, রোগীর উত্তেজনা তত বাড়তে থাকে, অন্যের কাজে বিনাকারণে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নানাপ্রকার অপকৌশল অবলম্বন করে এবং একবারে অনেক কাজ করার অবাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে থাকে।

(খ) **এ্যাকুট ম্যানিয়া**—হাইপোম্যানিয়া থেকে ধীরে ধীরে এ্যাকুট ম্যানিয়া দেখা যায়। এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অস্থিরতার সাথে থাকে

নিদ্রাহীনতা ; অস্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে দেখা দেয় প্রবল ভাবাবেগ যা বিচার বুদ্ধি ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নিজেকে সর্বাপেক্ষা বড় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়, কথাবার্তা চলাফেরা অসংলগ্ন হয়ে যায়, এর সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী অলীকবীক্ষনও (hallucinations) দেখা দেয়। মোটের উপর এ অবস্থায় রোগী এমন একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, তাকে মানসিক কোন চিকিৎসাগারে সত্বর না দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(গ) **ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া**—এ্যাকুট ম্যানিয়ার মতই এর মধ্যে অস্থিরতা, অনিদ্রা দেখা দেয়। এতে তীব্রতা যেন আরও বেশী করে দেখা দেয়—স্থান কালের বোধ লুপ্ত হয়, কথাবার্তা একেবারে অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। চীৎকার করা, সবকিছু ভেঙ্গে চৌচির করার একটা নেশা যেন পেয়ে বসে, অলীকবীক্ষণ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বসবর্তী হয়ে রোগী চলতে থাকে। রোগী এ অবস্থায় আহার ও কারও পরিচর্য্যা অস্বীকার করে। দুই তিন সপ্তাহ এ রকম একটানা চলতে থাকে।

(ঘ) **ক্রনিক ম্যানিয়া**—১৯০৪ সালে স্কুট (Schoot) প্রথম এরকম রোগাবস্থার একটা বিবরণ দেন। তিনি এমন কয়েকটি এ প্রকার রোগের সংলক্ষণের কথা বলেন যা পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর জীবনে প্রলম্বিত ছিল। এরা সকলেই অত্যন্ত অস্থির, ঝগড়াটে ও দুষ্ট বুদ্ধির লোক ছিল। সর্বদাই এরা হুল্লোরের মধ্যে থাকতে চায়—যদি এতে কোন বাধা আসে, তাহ'লে এরা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অলীক-বীক্ষণ এ অবস্থায় থাকে না বটে, পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী ভ্রান্তবিশ্বাস কখনো কখনো থাকতে পারে।

শারীরিক তীব্র অসুস্থতায় যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, সে রকম শারীরিক রোগ-লক্ষণ এ অবস্থায় দেখা দিতে পারে।

(২) **মেলানকোলিয়া (Melancholia) :—**

মেলানকোলিয়াতে ম্যানিয়া রোগের ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। একটা গভীর বিষণ্ণতা, কর্মবিমুখতা এই রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোগী নিজের ওপর কোন আস্থা রাখতে পারে না এবং একটা অসহ্য পাপবোধে

যন্ত্রণা কাতর থাকে। হাজার রকমের অপরাধের জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করে, এবং এইসব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি হোক এইরূপ প্রত্যাশা করে। রোগের আধিক্য যদি খুব বেশী হয় রোগী সমস্ত প্রকার মেলামেশা ছেড়ে দিয়ে একা এককোণে থাকতে চায়। কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া রোগীর পক্ষে খুব শক্ত হয়—স্মৃতিভ্রংশতাও দেখা দিতে পারে। অলীকবীক্ষণ কখনও কখনও দেখা যায়—প্রায়শঃই রোগী শোনে যে তার (কল্পিত) পাপকার্য্যের জন্য কে যেন তাকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছে। আত্মহত্যার প্রবণতা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। অনিদ্রা ও অগ্নিমান্দ্য প্রকট হয়।

ম্যানিয়ার মত মেলানকোলিয়া রোগকেও আচরণভেদে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ—

(ক) সিম্পল্ (simple) মেলান কোলিয়া কোন প্রত্যক্ষ কিছুতে ব্যর্থতার জন্য যে অস্বাভাবিক হতাশা ও বিষণ্ণতা আসে, এ তারই ফলশ্রুতি। এক্ষেত্রে অপরাধবোধ তেমন প্রকট থাকে না কিন্তু উৎসাহহীনতা ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

(খ) অ্যাজিটেটেড মেলানকলিয়া (Agitated)—এক্ষেত্রে রোগী সর্বদাই কাজে অকাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে—অহেতুক চলাফেরার মধ্য দিয়ে নিজের বিষন্নতা জনিত যে পুঞ্জীভূত আবেগ তার মুক্তির জন্য, প্রয়াসী হয়। সে হয়ত সারাদিন ধরে একটা বিশেষ শব্দ আওড়াতে থাকে বা অকারণে পথ চলতে থাকে।

(গ) রেজিসটিভ (Registive) মেলানকোলিয়া ঃ—রোগী খেতে পরতে অস্বীকার করে এবং যখন জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয় রোগী প্রবল ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। একটা নেতিবাচক মনোভাব তাকে পেয়ে বসে।

(ঘ) মেলানকোলিয়া অ্যাট্টানিটা (Attonita)—এর বৈশিষ্ট্য হল এতে রোগীর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়। কোন স্থানে দাঁড়ালো তো রোগী দাঁড়িয়েই থাকে, আবার কোন জায়গায় বসলো তো বসেই রইলো।

(ঙ) ডিল্যুসনাল (Delusional) মেলানকোলিয়া ঃ—এতে মেলান-কোলিয়ার আর সব লক্ষণের সাথে ভ্রান্তবিশ্বাস প্রবলভাবে থাকে। অন্যান্য

লক্ষণগুলো চলে গেলেও এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস সহজে যেতে চায় না। এই ভ্রান্তবিশ্বাস নানা বিষয় নিয়ে হতে পারে। তবে প্রায়ই যেটা দেখা যায়, সেটা হলো নিজের শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে একটা অবাস্তব ধারণা (hypochondrical)।

(চ) ইনভল্যুসনাল (Involutional) মেলানকোলিয়া :—বার্দ্ধক্যের আগমনের সাথে সাথে দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়িত হতে আরম্ভ করে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা চল্লিশের পর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশের পর আরম্ভ হয়। এ সময়ে একটা বিষণ্ণতা ও হতাশার ভাব আসে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। এই অবস্থা যদি মাত্রাধিক হয়ে যায় তাহলে এই বয়সে মেলান কোলিয়া রোগের লক্ষণগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

(৩) ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (Manic Depressive Psychosis):—

ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়া রোগ দুটি অনেক সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। ম্যানিয়ার সাথে মেলানকোলিয়া বা মেলানকোলিয়া হলে সঙ্গে ম্যানিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। প্রায়শঃই দেখা যায় ম্যানিয়া রোগীর উত্তেজনা কমে গেলে ক্রমশঃ সে মেলানকোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। একটি অবস্থার অবসান হওয়ার পর আর একটি অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে পারে বা দুটি অবস্থার মধ্যকালে কিছুকালের জন্য বা কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করতে পারে। ক্রেপলিন (Kraeplin) ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়া রোগ দুটিকে একই রোগের দুটি ক্রমপর্যায় হিসাবে মনে করতেন। কেউ কেউ আবার ম্যানিয়া ও মেলান কোলিয়াকে আলাদা রোগ হিসেবে দেখেছেন।

অনেক সময় ম্যানিয়া বা মেলানকালিয়ার যে কোন একটি রোগীর মধ্যে তীব্র হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ক্রেপলিনের মতে অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একটি অবস্থা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি বিপরীত অবস্থা ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্ রোগাক্রমণের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন সবিরাম (intermittent) ও অবিরাম

(Continuous)। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে এদের প্রকারভেদ পরিস্ফুট করা যায়।
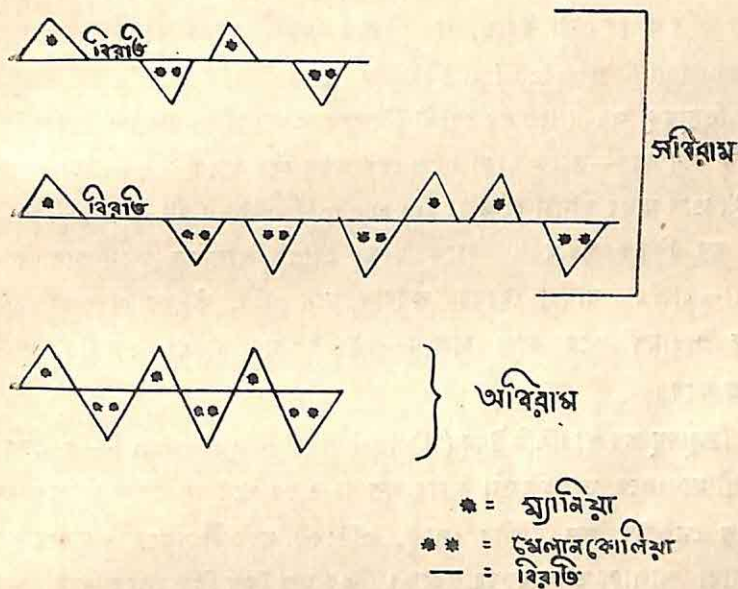
(৪) প্যারানইয়া (Paranoia):—

এ রোগের প্রধান লক্ষণ হল ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusion)। সাধারণতঃ একটু বেশী বয়সে (পঁয়ত্রিশের পর) যৌন ও কর্মজীবনের প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হ'য়ে যখন ব্যক্তি পরাজিত হয়, তখনই এ পরাজয়কে অস্বীকার করার উপায় হিসাবে অন্যরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এইরূপ ধারণায় ব্যক্তি চলতে আরম্ভ করতে থাকে। কতকগুলো দৃঢ় চিরস্থায়ী ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা নির্মিত একটা নিজস্ব জগতে রোগী বিচরণ করে। তার চিন্তা ও কাজকে এইসব অবাস্তব ধারণাগুলি প্রচ্ছন্নভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। রোগী যখন এই সব ধারণার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস করে, তখন আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত যুক্তি-নিবদ্ধ মনে হয়। বাইরে থেকে রোগীর মধ্যে বাক্য-বিন্যাসের মধ্যে বেশ একটা যুক্তিযুক্ততা আছে

বলে মনে হবে—কিন্তু যে ধারণাটিকে কেন্দ্র করে সব কিছুর অবতারণা, তাকে খুব ভাল করে খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটা অসত্য ও অবাস্তব। এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে—এর মধ্যে প্রায়ই দুটি ধারণা প্রকট হয়ে ওঠে, (১) হয় রোগী নিজেকে খুব বড় মনে করে (delusion of grandeur) অথবা (২) রোগীর ধারণা হয় সকলেই তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত চলছে (delusion of persecusion)।

ডিল্যুসন্ অব গ্র্যাণ্ডেয়রে রোগী নিজেকে একটা ভীষণ রকমের প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মনে করে—তাকে ছাড়া সমস্ত দেশ অচল হয়ে যাবে, সে একটা 'কেষ্ট বিষ্টু', তার মনের ভাবটা হচ্ছে "I am the monarch of all I survey"—সে সব কিছুর অধীশ্বর। তাকে ছাড়া দেশের শাসনযন্ত্র অচল হয়ে যেতে বাধ্য—যাদের আমরা দেশের কর্ণধার মনে করি, তাঁদের সকলেই তার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ চালান—এই রকমের ধারণা রোগীর মধ্যে কাজ করে।

ডিল্যুসন্ অব পারসিকিউসন্ (Delusion of persecusion)—এ ক্ষেত্রে রোগী মনে করে, তাকে হত্যা করার জন্য বা তাকে পথে বসবার জন্য তার সব কেড়ে নেওয়ার জন্য বাড়ীর লোক, প্রতিবেশী, সহকর্মী সকলে এক হয়ে বা আলাদা আলাদা ভাবে ষড়যন্ত্র করছে। এর জন্য কিছু কিছু লোক সর্বদা তার কাজকর্ম, চলা-ফেরার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছে। কখনো বা মনে করে, তার খাওয়ার জিনিষে বিষ জাতীয় কিছু মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে—যার বিষক্রিয়া তাকে তিলে তিলে হত্যা করছে। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে কোনও বাস্তব কারণ ছাড়াই যৌন জীবন নিয়ে নানা প্রকার অশ্লীল সন্দেহ করে থাকে। এরূপ নানাপ্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা রোগী চালিত হতে থাকে।

এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও রোগের প্রথম দিকে রোগীর অন্যান্য কাজকর্ম প্রায় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে, নিজের দায়িত্বও নিজে নিতে পারে ; মোটের উপর রোগের প্রথম আবির্ভাবে, আক্রান্ত ব্যক্তির আর সব স্বাভাবিক আচার আচরণের আড়ালে, আসল রোগটি অনেকদিন পর্য্যন্ত ধরা পড়তে চায় না ; কিন্তু এ রোগ অধিক দিন প্রলম্বিত হলে, রোগীর মধ্যে অস্থিরতা উত্তেজনার ভাব ও আক্রমণধর্মীতা প্রবল হয়ে ওঠে, হত্যা করার প্রবণতাও রোগীর মধ্যে উঁকি মারে। অলীকবীক্ষণও দেখা দেয়—যেমন

অনেক রোগী মনে করেন যে কোন ঠাকুর দেবতা তার সঙ্গে কথা বলেন, তাকে কোন আদেশ প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ দেন।

প্যারানোইয়াতে রোগীরা তাদের অধিকাংশ বুদ্ধি ও শক্তিই কোন ভ্রান্ত ধারণা সৃজনে ও যুক্তিবদ্ধতায় তাকে পরিপুষ্ট করতে প্রয়োগ করেন—বাস্তব সত্যতার দিকে তাদের কোন নজর থাকে না—রোগীর দৃষ্টিতে তা সত্য হলেই হল।

এডোলফ্ হিটলার, (Adolf Hitler), আইভান (Ivan) প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অল্পবিস্তর প্যারানইয়া রোগে ভুগেছিলেন বলে বহু মনশ্চিকিৎসক মনে করেন।

সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) ঃ—

'সিজোফ্রেনিয়া' শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে—শব্দটির দ্যোতনা অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 'Schizo' শব্দের অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া phrenia কথাটির অর্থ ব্যক্তিত্ব—এতে সমগ্র ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে চৌচির হয়ে যায়। এ রোগের প্রধান সংলক্ষণ হল যে, রোগীর বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না, আবেগের ক্রিয়াকর্ম্ম অত্যন্ত স্তিমিত হয়ে আসে। চিন্তার মধ্যে স্থবিরতা ও অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কোন উত্তাপ থাকে না, রোগী নিজেকে সকলের নিকট থেকে ধীরে ধীরে একেবারে গুটিয়ে নেয়, বাইরের সব কিছুতেই যেন একটা অনীহা ও আকর্ষণহীনতার ভাব প্রকট হয়ে উঠে। নিজের খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে ও কোন প্রকার আকর্ষণ বা ইচ্ছা থাকে না—রোগী একেবারে জড়পদার্থের মত হয়ে পড়ে—'সহস্র প্রশ্নেও তখন তার কাছ থেকে আর কোন উত্তর পাওয়া যায় না এবং তার জীবন রক্ষা করবার জন্য তাকে অস্বাভাবিক উপায়ে খাওয়াতে হয়। রোগী একই অবস্থায় অনেককাল কাটিয়ে দেয়। অলীক বীক্ষণ (Hallucinations) ও ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusions) প্রভৃতিও রোগীর মধ্যে দেখা যায়।

পূর্বে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, এই রোগ বয়ঃসন্ধিকাল থেকে আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে রোগাক্রান্ত/কিশোরের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে ; এ ধারণা থেকে পূর্বে এ রোগের নামকরণ হয়েছিল ডিমেন্সিয়া প্রিকক্স (Dementia praecox)। Dementia শব্দের অর্থ মানসিক অবনতি,

praecox এর অর্থ হল অল্পবয়সে। ব্লুইউলার (Bleuler) প্রমুখ মনোশ্চিকিৎসকরা এ ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেন—তাঁরা দেখলেন যে এ রোগ বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বে ও পরে যে কোন সময়ে হতে পারে।

রোগ-সংলক্ষণের প্রকার ভেদে সিজোফ্রেনিয়া চার প্রকারের হতে পারে :—

(ক) **সিম্পল (Simple)** :—বয়ঃসন্ধিকাল বা ঠিক এর পরে পরে এ রোগদেখা যায়। রোগীর প্রধান লক্ষণ হল সে সব বিষয়েই বিস্বাদপর ও অত্যন্ত নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। সর্ব্বদা একা একা থাকতে চায়। স্নান খাওয়া পর্য্যন্ত রোগী করতে চায় না। আত্মীয় স্বজন কেউ এসে খুব জোর না করলে রোগী যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থা থেকে নড়তে চায় না। ক্রমে কথাবার্তা ও আচার আচরণ অসংলগ্ন ও এলোমেলো হয়ে থাকে। নিজেদের খাওয়া পরা ও দায়দায়িত্বের ভার আর নিজেরা নিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অলীক বীক্ষন ও ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রায়শঃই অবর্তমান থাকে।

(খ) হেবিফ্রেনিয়া :—(Habephrenia) পুরুষদের মধ্যেই এ রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। প্রথম দিকে আক্রান্ত ব্যক্তি মাথাধরা, জ্বর জ্বর প্রভৃতি উপসর্গের কথা বলে—স্বাস্থ্যও খারাপ চলতে থাকে। সর্ববিষয় অনীহা, সকলের সংসর্গ ত্যাগ রোগীর মধ্য প্রকট হয়ে ওঠে, সামান্য সমালোচনা ও আঘাতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরিপার্শ্ব অবস্থা সম্বন্ধে কিছুদিন পর্য্যন্ত কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি থাকে, রোগী অনুভব করতে পারে যে, তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে যদিও এই পরিবর্তনের কারণ বাইরের কোন কিছুর উপর সে আরোপ করতে চায়। এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একা কথা বলে হেসে কাটিয়ে দেয়, কখনও কখনও কল্পিত কোন ব্যক্তির সাথে কথপোকথন চলতে থাকে। অলীক-বীক্ষণ এ ক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়—স্বর্গের কোন দেবদেবী রোগীর সঙ্গে কথা বলতে থাকে—কখনও কখনও নানাপ্রকারের অদ্ভুত গন্ধ তাদের নাকে এসে পৌছে, এরূপ তারা বিশ্বাস করে। আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যায়। ধীরে ধীরে রোগীর মধ্যে শিশুর মত কতকগুলো অসংলগ্ন আচরণ দেখা দেয় এবং রোগীর মধ্যে যে স্তব্ধ হতাশা সেটা হঠাৎ যেন উচ্চ হাসির মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে—ম্যালাংকোলিয়ার সাথে হেবিফ্রেনিয়ার এখানেই পার্থক্য—ম্যাংলাকোলিয়াতে যে বিষণ্নতা ও হতাশা দেখা যায় তাতে যেন ছেদ

নেই। কোন প্রকার চকিত প্রতিক্রিয়াও নেই। কিন্তু হেবিফ্রেনিয়াতে এর ব্যতিক্রম আছে।

নানা প্রকারের উদ্ভট ভ্রান্তবিশ্বাসও রোগীর মধ্যে কাজ করে যেমন সে মনে করে যে, কোন প্রেতাত্মা নিদ্রাকালে তার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে—আবার কোন রোগীর মনে হবে চারদিকের বাতাসে সে প্রেতাত্মা বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ ভাবছে তার পেটের মধ্যে একটা মৌমাছি ঢুকে গেছে এবং সেটা সেখানে ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ধীরে ধীরে তাদের চিন্তায়, বুদ্ধিতে, চলা ফেরায় প্রথম একটা অসংলগ্নতা, ও শ্লথ, পরে জড়তা রোগীর মধ্যে উচ্চকিত হয়ে ওঠে—রোগীর কোন প্রকার ভাবের আদান প্রদান পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়, একটা অপরিচ্ছন্ন স্থবিরে রোগী পরিণত হয়।

(গ) কেটাটোনিয়া (Katatonia)—এতে অনীহা, হতাশা, ও বিষাদের সাথে আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়—অনিদ্রা (insomnia) বিশেষ ভাবে এ ক্ষেত্রে দেখা যায়। তার ক্ষতি করার জন্য চক্রান্ত চলছে এই রকম ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusion of persecution) রোগীর মধ্যে কাজ করে—বা নিজে কোন ভীষণ রকমের অপরাধ করেছে এই রকম একটা বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হতে থাকে ; অলীক বীক্ষণও এ ক্ষেত্রে দেখা যায়।

এর প্রধান বৈশিষ্ট হল যে, রোগীর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরণের কাঠিন্য দেখা দেয়—এ লক্ষণটি ম্যালংকোলিয়া থেকে এ রোগটিকে পৃথক করতে সাহায্য করে। বস্তুত এ প্রকার রোগীদের মুখে চোখে ম্যালাংকোলিয়া রোগীদের মত বিষণ্ণতা ছাপের পরিবর্ত্তে মুখে চোখে একটা স্পষ্ট বিরক্তি ও কাঠিন্যের ছাপ থাকে—বিশেষ করে ঠোট দুটো মনে হবে যেন ঝুলে পড়ছে।

নেতিবাচক (Negetivism) মনোভাব এ প্রকার সিজোফ্রোনিয়ার আর একটি প্রধান সংলক্ষণ। কথা না বলা, কোন বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া, খাবার দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়ে এই নেতিবাচক মনোভাব খুব প্রকটভাবে দেখা যায়। বিশেষ কোন শব্দকে বার বার লাও এর একটা লক্ষণ। রোগী এতে কাঠের মত নিশ্চল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কোন একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকলো তো রোগী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে—এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগী বিছানার পাশে সারারাত একভাবে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিল। কখনও কখনও

দেখা যায় যে, এর একেবারে চেতন শক্তি রহিত হয়ে গেছে—একটা কিছু যদি তার হাতে বা পায়ে ফুটিয়ে দেওয়া হয়, রোগী কোন রকম সাড়া দেয় না, এঅবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টা করে না, বেদনায় তার মুখমণ্ডল একটু লাল হয়ে ওঠে মাত্র। পরানুকরণ এ সময়ে প্রবলভাবে দেখা যায়।

একটা অস্থির উত্তেজনার ভাবও কখনও কখনও এতে দেখা যায়। এর উত্তেজনা আর ম্যানিয়ার উত্তেজনা এক প্রকারের নয়। ম্যানিয়ার উত্তেজনা একটা আপাত উদ্দেশ্যমূলক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু ক্যাটাটোনিয়ার উত্তেজনা অবাস্তব, একঘেয়ে ও উদ্দেশ্যবিহীন। এ উত্তেজনা প্রায়ই প্রবল আক্রমণাত্মক এলোমেলো কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ম্যানিয়াতে কোন প্রকার অলীকবীক্ষণ থাকে না, থাকলেও খুব সামান্য। ক্যাটাটোনিয়াতে অলীকবীক্ষণ থাকে। ম্যানিয়াতে কথাবার্তায় ভাবান্তর খুব ঘন ঘন হতে থাকে। ক্যাটাটোনিয়াতে ভাবনা বিষয়ের মধ্যে কোন প্রকার সঙ্গতি থাকে না, কথাবার্তাও একেবারে অসঙ্গতি পূর্ণ থাকে। নেতিবাচক মনোভাব ক্যাটাটোনিয়াতে অত্যন্ত প্রকট থাকে, ম্যানিয়াতে নেতিবাচক মনোভাব সম্পূর্ণ অবর্তমান থাকে। এইসব পার্থক্য থেকে ম্যানিয়ার অস্থির উত্তেজনাকে ক্যাটাটেনিয়ার উত্তেজনা থেকে আলাদা ভাবে চেনা যায়।

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া (Paranoid Schizophrenia) :—

সিজোফ্রেনিয়ার অন্য সমস্ত লক্ষণের সাথে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অলীক বীক্ষণ রোগীর মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। প্রথমদিকে হতাশার মধ্যেও রোগী মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ভ্রান্তবিশ্বাস প্রায়ই নিজের সম্পর্কে নানা প্রকারের অবাস্তব বড় রকমের ধারণা (delusion of grandeur), কিংবা তার অনিষ্টকারী নানা প্রকারের ষড়যন্ত্র মূলকও হতে পারে (delusion of pesecution)। প্যারানইয়ার ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে এর পার্থক্য এই যে এখানকার ভ্রান্তবিশ্বাসগুলি খুব যুক্তি নিবদ্ধ নয়। এদের সব ভাবনা ও চিন্তা অন্য ব্যক্তিরা সব বুঝে ফেলছে এবং তাদের চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে এই রকম ভ্রান্তবিশ্বাসের দ্বারা এরা চালিত হয়ে থাকে।

যদিও সেজোফ্রেনিয়াকে রোগ লক্ষণ অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা যায় তবুও প্রায়ই একই রোগীর মধ্যে চার প্রকার সিজোফ্রেনিয়ার রোগলক্ষণগুলি

কিছু না কিছু পরিমাণে দেখা যায়। এমন কি একই রোগী এ চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ক্রমে যাচ্ছে, এরূপ দেখা যায়।

জৈবিক কারণ জনিত উন্মাদ রোগ (Organic Psychoses):—

আমরা মানসিক কারণজনিত উন্মাদরোগকে রোগলক্ষণ অনুযায়ী যেমন কতকগুলি ভাগে ভাগ করতে পারি সেইরূপভাবে জৈবিক কারণজনিত উন্মাদ রোগকে (Organic Phychosis) ভাগ করতে পারিনা। এক্ষেত্রে দেহজ রোগ-কারণটি কি প্রকারের সেই প্রকারভেদে জৈবিক উন্মাদ রোগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন (ক) জেনারেল প্যারেসিস (General Paresis), (খ) মাদক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া (Alcoholic reactions), (গ) সেনাইল ডিমেন্সিয়া (Senile Dementia)।

(ক) **জেনারেল প্যারেসিস** (General Paresis):—দীর্ঘস্থায়ী সিফিলিস রোগের দ্বারা যখন মস্তিষ্কের কোষ আক্রান্ত হয় (Brain Cell) তখনই এই উন্মাদরোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। সিফিলিস রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দু থেকে তিন বৎসরের মধ্যে মস্তিষ্ককোষে এর সংক্রামণ ঘটে এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় যেমন, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উদাসীনতা, সময়জ্ঞানহীনতা, পূর্বের আগ্রহের বিষয় সম্বন্ধে উদাসীনতা, অস্থির চিত্ততা ও অত্যধিক ভাবপ্রবণতা, স্মৃতি ভ্রংশতা, বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি রহিত হওয়া, বাচন ক্ষমতা শিথিল হওয়া প্রভৃতি।

(খ) মাদক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়াজনিত মানসিক রোগ (Alcoholie reaction):—দুশ্চিন্তা ও অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অনেক ব্যক্তি সুরাপান ও এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধ সেবন করে থাকে।

মাদকদ্রব্য স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে এবং অত্যধিক পানে ধীরে ধীরে গুরু-মস্তিষ্ককে (Cerebrum) নিস্তেজ করে ফেলে, যার ফলে বিচার বিবেচনা শক্তি ব্যক্তির লোপ পায় এবং সর্বপ্রকার পশ্চাদ্‌বর্তী (regressive) আচরণ অর্থাৎ শৈশবকালের অর্বাচীন ও চপল আচরণ ব্যক্তি করে থাকে।

বহুদিন পর্যন্ত মাদকদ্রব্য সেবনে যদি কোন ব্যক্তি রত থাকে তাহলে তিন প্রকারের বিকৃতি দেখা দিতে পারে। (ক) আচ্ছন্ন চেতনা অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া। (খ) দর্শনেন্দ্রিয়ের অলীকবীক্ষন, (গ) হাত পা কাঁপা। এইরকম অনেকদিন চলতে থাকলে ব্যক্তির স্মৃতিও আক্রান্ত হয়।

আফিং গাঁজা, কোকেন প্রভৃতি অধিক সেবনে শরীরের মধ্যে ও মস্তিষ্ককোষে যে পরিবর্তন আসে তা থেকেও নানাপ্রকারের মানসিক বিকৃতি দেখা দিতে পারে।

(গ) **সেনাইল ডিমেন্সিয়া (Senile Dementia)** :—অধিক বয়সে স্বাভাবিকভাবে দৈহিক শক্তি ও মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসে। এবং মানসিক শক্তি অনেক পরিমাণে কমে যায়। এই কমে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক মাত্রা আছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এমনভাবে কমে যায় যে, স্বাভাবিক মানসিক ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে যেমনি স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া, অস্থির চিত্ততা, অত্যধিক বিষণ্নতা, অসংলগ্ন কথাবার্তা ও ভ্রান্তবিশ্বাস এ ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

1. Discuss, with suitable illustrations, the different types of mental diseases.
2. Distinguish between psychoneunosis and psychosis.
3. Differntiate between functional and organic mental disorders.
4. What are some of the undesirable outcomes of neurasthenia, psychasthenia and hysteria ?
5. Describe any case known to you that shows any of the following symptoms : delusion, compulsion, obsession, hallucination, phobia, hyper activity or delirium.
6. Give an outline of modorn classification of the different types of mental diseases.
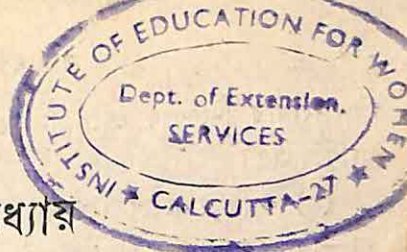
দ্বাদশ অধ্যায়

সমস্যামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার

(Specific Types of Problem Behaviour, their Specific Causes and remedies)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিশু ও কিশোরদের সেই সব আচরনকেই সমস্যা-মূলক আচরণ বলা হবে যা সমাজে বিদ্যালয়ে ও গৃহে শিক্ষক, প্রতিবেশী ও পিতামাতার নিকট শান্তি ও শৃঙ্খলা ঘটিত সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। সমস্যামূলক আচরণের মধ্যে যে গুলি বিদ্যালয়ে খুব প্রকট ভাবে দেখা দেয় ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ ও অস্বস্তির কারণ ঘটায় তাদের মধ্যে আছে গৃহ ও বিদ্যালয় থেকে পলায়ণ (Truancy), ঝগড়া বিবাদ (quarrelling) মারামারি (fighting), চুরিকরা (Stealing), মিথ্যাকথাবলা (lying) অবাধ্যহওয়া (disobediency), একগুঁয়েমি (obstinacy), এবং নেতি-বাচক মনোভাব (negativitiem) এবং ছোটখাটো যৌন অপরাধ (minor sex problem)। এ ছাড়া অবদমিত শঙ্কা পরারণ সমস্যা মূলক আচরণও আছে, যা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে গৃহে ও বিদ্যালয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে। এর মধ্যে আছে শয্যামূত্র (enuresis) ভয়াকুলতা (Nervousness) নখ কামরানো (Nailbiting) আঙ্গুল চোষা (Thumb Suckig) অত্যধিক বশংবদভাব (over submissive)।

একে একে এবার উপরোক্ত সমস্যামূলক আচরণগুলির প্রকৃতি, কারণ ও তাদের দূর করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

(১) **পলায়ণপরতা** (Tru.ncy)—পলায়ণপরতা বলতে আমরা বুঝি গৃহ থেকে না বলে কয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া ; বিদ্যালয়ের কাজ চলা কালীন, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া।

বিদ্যালয় ঘটিত কারণ ঃ—

(ক) বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা এমন নিস্প্রাণ ও অবিন্যস্ত হতে পারে যে শিক্ষার্থীরা এতে কোন উৎসাহ বোধ করে না এবং এরকম নিস্প্রাণ

শিক্ষা-ধারার নিষ্পেষণ থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যায়।

(খ) সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় কোন প্রকার আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না—শিক্ষকরা যদি গতানুগতিক ও দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য হয়, শিক্ষকের পরস্পরের সম্পর্ক যদি মধুর ও সুস্থ না হয় তা হলে বিদ্যালয়ের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রাণ সঞ্চার হয় না—শিক্ষার্থীরা কোন রূপ আকর্ষণ অনুভব করে না।

(গ) নিয়মশৃঙ্খলার দোষদুষ্টতা—যেমন শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলার জন্য উপর থেকে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি—সব সময় নিয়ম মাফিক চলার জন্য রক্ত-চক্ষু দেখানো—অথচ বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্য্য-সূচীর কোন ব্যবস্থা নেই—খোলা পরিবেশের অভাব—লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড। ছাত্রদের সবকিছুতেই কর্তৃপক্ষের সমালোচনা ও বাধা দান, শিক্ষকদের পক্ষপাত দুষ্টতা প্রভৃতি অবস্থা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় বিমুখ করে তোলে—এ পরিবেশে কোন কোন ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয় পলায়ণপর হয়ে উঠে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে যদি অধিক সংখ্যক অপরাধ পরায়ণ (গৃহ ও-গৃহ-স্থানের প্রভাবে) ছাত্র থাকে তা হলে এদের প্রভাবে, ভাল হতে পারে এমন ছেলেরাও, বিপথগামী হয়ে ওঠে এবং বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে খারাপ সিনেমা দেখা, দল করে চুরি করা ও অন্য নানা প্রকারের অসামাজিক আচরণ এদের মধ্যে দেখা দেয়।

গৃহ ঘটিত কারণ :—

পিতামাতা সন্তান সম্বন্ধে কোন প্রকার মনোযোগ দেন না—তাদের পড়া-শুনা সম্বন্ধেও কোনপ্রকার মনোযোগ বা যত্ন নেন না। বাড়ীতে পিতামাতার মধ্যে সর্বদা মতান্তর মনান্তর চলতে থাকে। পিতামাতা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত নির্মম আচরণ করে থাকে—গৃহ পরিবেশের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ও স্বতঃস্ফূর্ত্ততার বিন্দুমাত্র আভাস থাকে না। সন্তান নিজেকে প্রত্যাখ্যাত (rejected) মনে করে। এরূপ গৃহ পরিবেশের মধ্যে সন্তানের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়—পিতামাতার কলহ ও বিচ্ছেদ জনিত গৃহের মধ্যে যে চাপা অস্থিরতা ও উত্তেজনার ভাব থাকে—তা সন্তানের মধ্যে তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটি দুশ্চিন্তা জর্জরতা, উদ্বেগ ও ভয়ের ভাব নিয়ে আসে। সে কোন বিষয়ে উৎসাহ পায় না—কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারে না।

এ হেন মানসিকতা নিয়ে কোন ছেলে যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ হওয়া সত্বেও, সে তাকে গ্রহণ করতে পারে না—ভয়, উদ্বেগ দুশ্চিন্তার ভাব সর্বদা তার মনের গভীরে অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলে। পড়াশুনায় কোন মনোযোগ দিতে পারে না, বিদ্যালয়ের কোন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে ভয় পায়, পিতামাতার পরিবর্তস্বরূপ শিক্ষকদের সম্পর্কে একটা ভয় ভয় ভাব তাকে সর্বদা ঘিরে থাকে, ফলে শিক্ষকদের সর্বদা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে—সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধেই একটা অনীহা তার মধ্যে দেখা দেয়—বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।*

শিক্ষার্থীদের কারও মধ্যে যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি না থাকে, তা হলেও সে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন অনুধাবন করতে পারে না—সহপাঠীদের সাথে ভালভাবে মিশতে পারে না—বিদ্যালয় তার কাছে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে তারা বাঁচে। বুদ্ধির স্বল্পতাও পলায়ণপরতার একটা কারণ হতে পারে।

ক্লাসে কোন ছেলের বুদ্ধি যদি স্বাভাবিক থেকে অনেক বেশী হয় তাহলেও ক্লাসে যা পড়ানো হবে তা অল্পসময়ের মধ্যেই সে শিখে ফেলবে এবং বাকী সময়টা বিদ্যালয়ে যদি সহপাঠক্রমিক কোন কিছুর ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সে সেটা নষ্ট করে—বিদ্যালয় তার কাছে নিরর্থক মনে হয় ও বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যভাবে সময় কাটানো সে শ্রেয়ঃ মনে করে।

প্রতিকার (Remedies) :—(১) একদিকে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত ও হৃদয়গ্রাহী হতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক সকলের কাছ থেকে শিক্ষার্থী অকৃত্রিম স্নেহ প্রযত্ন পাবে—প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, বুদ্ধি মেজাজ, বিশেষ শক্তি ও তার বিভিন্ন সমস্যা যথাযথভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন—এবং ছাত্রকেও যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে হবে যাতে তার মধ্যে 'আত্মশ্রদ্ধা' জাগে—নিজের সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা সঙ্গতিপূর্ণ সুদৃঢ় হতে হবে। খেলাধুলা, সাহিত্য ও শিল্পচর্চা, বক্তৃতা, শিক্ষা-মূলক ভ্রমণ, যৌথ সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা, হাতেনাতে পাঠ্য বিষয় বস্তু থেকে কোন কোন জিনিস তৈরী করা, প্রাচীর-পত্র প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ সহ-পাঠক্রমিক কার্য্য কলাপের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়

পরিবেশকে শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা পরিপূরণের কেন্দ্র-স্থল হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

(২) গৃহ-পরিবেশে পিতামাতাকে শিশুর মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পড়াশুনা সম্বন্ধে যত্নশীল ও মনেযোগী হতে হবে, তার অগ্রগতি কতটা হচ্ছে না হচ্ছে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুকে যথাযথ স্নেহপ্রীতি, উৎসাহ, প্রসংশা সময় বিশেষে দিতে হবে। গৃহে পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি উদাসীন হন বা নির্ম্মম হন যাতে সন্তান নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করতে পারে, এরকম অবস্থাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব সমধিক ও গভীর। এরকম শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ আরও বেশী দৃষ্টি দেবেন, আরও বেশী যত্নবান হবেন, যাতে প্রত্যাখ্যান জনিত যে উদ্বেগ, ক্ষোভ ও নিরাপত্তা বোধের অভাব, তা থেকে শিশু ও কিশোর মন শিক্ষক শিতিকার স্নেহ বারিতে অভিসিঞ্চিত হতে পারে, যাতে শিশু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষকও আছেন, অন্ততঃ এমন একজনও আছেন যিনি তার সুখ-দুঃখের অংশীদার, যিনি তার জন্য সদা উদগ্রীব ও উৎসাহী এবং যাঁর উপর সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপহাস করা, লজ্জা দেওয়া ও পারিবারিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্রূপ করা যতদূর সম্ভব বন্ধ করতে হবে। এসব শিশু ও কিশোরদের পুঞ্জীভূত আবেগ মুক্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা দরকার। খেলাধুলা সঙ্গীত-চর্চ্চা চিত্রাঙ্কন, ছোট ছোট জিনিষ-পত্র নিয়ে কাজ করা, প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত আবেগ-মুক্তি কিছুটা ঘটতে পারে। এছাড়া শিক্ষকের সাথে ছাত্র যদি তার অসুবিধা ও সমস্যার কথা খোলাখুলিভাবে বলতে পারে, তার জীবনের আবেগ পুঞ্জীত ঘটনার কথা শিক্ষককে বন্ধুর মত বলতে পারে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে যথার্থ অনুবেদন ছাত্র অনুভব করে, তাহলে তার অবচেতন মনের যে সমস্যা ও দ্বন্দ্ব, যা পরোক্ষভাবে তাকে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যেতে উদ্বেলিত করে, তার সুরাহা হতে পারে।

ঝগড়া ও মারামারি করা (quarreling & fighting) :—

বিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র দেখা যায় যারা সর্বদা মারামারি, ঝগড়া-বিবাদে রত থাকে—সামান্য সূত্র পেলেই কারো না কারো সঙ্গে ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করে দেয়। কেউ কেউ আছে যারা কথা কাটাকাটি থেকে

কোনরকম দ্বিধা না করে সরাসরি প্রচণ্ড মারধরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা শ্রেণীকক্ষের, সামগ্রিক ভাবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করে। গৃহ পরিবেশেও এরা ভাই-বোনদের সাথে অনবরত ঝগড়া-বিবাদ করে, প্রতিবেশী খেলার সঙ্গীদের সাথেও ঝগড়া মারামারি করে থাকে।

কারণ—নিরাপত্তাবোধের অভাব। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যদি ভাল না হয়, প্রায়ই যদি সে অসুখ বিসুখে ভোগে, তা'হলে মানসিক দিক থেকে আবেগ-গত গণ্ডগোল তার মধ্যে পরিলক্ষিত হতে পারে—এরূপ গণ্ডগোল তিনভাবে আসতে পারে। প্রথমতঃ অন্যান্যদের তুলনায় সে নিজেকে হীন মনে করে—অন্যরা সাবলীল ভাবে যে কাজ করতে পারে, সে তা করতে পারে না বলে তার মধ্যে একটা হীনমন্যতা দেখা দেয়। তা ছাড়া ব্যক্তি যদি বিকলাঙ্গ বা অতি-মাত্রায় বেঁটে হয় বা শারীরিক কোন খুঁত থাকে, তা হলেও তার মধ্যে একটা হীনমন্যতারভাব দেখা দেয়—সে নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অনুভব করে, সামান্য সমালোচনায় আহত হয় ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—নিয়ত সমালোচনা, নিরুৎসাহতা, সকলের অবজ্ঞা কখনো কখনো এসব ব্যক্তিদের মরিয়া করে তোলে। ওদের সহ্য শক্তি অত্যন্ত কমে যায়—হঠাৎ রেগে যায় এবং ঝগড়া বিবাদে এমন কি মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া এমন অনেক ছোঁয়াচে রোগ আছে যা শিশুকে সকলের কাছ থেকে দূরে কোন চিকিৎসাগারে সরিয়ে রাখে। মা বাবার সাথে তার কাঙ্খিত যোগাযাগ থাকে না—ফলে মনের গভীরে একটা দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই অনিচ্ছাকৃত গৃহ-বিচ্যুতি ও দূরত্ব এবং তার অনুপস্থিতিতে যদি কোন নূতন ভাই-বোন পরিবারে এসে পড়ে, তা হলে সে যে প্রত্যাখ্যাত এ ভাবটা তার মধ্যে আরও উচ্চকিত হয়ে ওঠে। এ থেকে তার মধ্যে একটা ভীষণ রকমের ক্ষোভ হয়—ভিতরে ভিতরে বাবা মা'র প্রতি ক্ষোভ ও রাগ দেখা দেয়। সামান্য কারণে রেগে ওঠে, একটা আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী গড়ে ওঠে—প্রত্যাখ্যানজনিত যে ক্ষোভ, তার প্রতিশোধ নেয় বিদ্যালয়ে, সহপাঠীদের সাথে মারামারি করে। সব কিছুকে একটা আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে দেখে।

গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে যদি খেলাধুলা ও অন্যান্য আনন্দপ্রদায়ী উপকরণ, যেমন বেতার, শিশুদের পাঠোপযোগী গল্পের বই প্রভৃতি না থাকে, গৃহপরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশ যদি সুন্দর ও খোলামেলা না হয়, মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, তার শক্তি সামর্থ্য, কর্মপ্রয়াস

যদি উৎসাহিত না হয়, যদি সে পরিবারে কোন স্বীকৃতি না পায় তা হলেও তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়—তার এই মানসিক অতৃপ্তি তাকে পরিবার, বিদ্যালয় ও বৃহত্তরভাবে সমাজবিধি ও কর্তৃপক্ষের উপর বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলে; পুঞ্জীভূত ক্ষোভে, সামান্য কারণে ফেটে পড়ে। গৃহে ভাইবোন, পিতামাতা; বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদে এমন কি মারধরে এরা লিপ্ত হয়।

মোটের উপর 'বদ্ধ-পরিবেশ' যে পরিবেশ শিশুর মধ্যে অত্যধিক দুশ্চিন্তার উদ্রেক ঘটায়, সেই পরিবেশই শিশুর মধ্যে অতিমাত্রায় ক্রোধের সঞ্চার করে এবং সেই ক্রোধেরই স্ফুরণ ঘটে ঝগড়া বিবাদ, মারামারি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।[1]

যে সব পিতামাতার নিজেদের মধ্যেই নিরাপত্তাবোধের অভাব রয়েছে, যে সব পিতামাতা অত্যন্ত আত্মসর্বস্ব ও স্বার্থপর, তারা প্রায়শঃ তাদের সন্তানদের প্রতি তাদের দায়িত্বপালনে কোন দৃষ্টি দেন না। গভীর ভালবাসার উত্তাপও সন্তানরা এদের কাছ থেকে অনুভব করে না। যাদের মধ্যে আক্রমণাত্মকভাব (aggressive) বেশী [বংশগতিতে প্রাপ্ত—নালীশূন্য গ্রন্থির (endocrene glands) কার্য্যকারিতার জন্য], তাদের জন্য পিতামাতার যত্ন ভালবাসা আরও বেশী প্রয়োজন—এই সব শিশুরা বিকাশ-পর্য্যায়ে যদি পিতামাতার কাছ থেকে, অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তি ও শিক্ষকদের কাছ

---

1. Anxiety, to Horney, was a complex pattern suffused with fear anger and a characteristic series of thoughts, for example, I am helpless.

...Situational events of various kinds can serve to elicit anxiety : the behaviour of other people (Existentialists) ; certain kinds of behaviour emitted by others, such as rejection, hostility, punishment (Adler, Horney, Sullivan). Ford H. Donald & Urbon B. High. System of psycho therapy. A comperative study.

From the very begining, Freud observed that negative affect ("painful affect") seemed to play a central role in behaviour disorder. Fear, anxiety, shame and psychic pain were specified (1895, p 3). Later he included hate or aggression ; the currently popular terms among psychologists are anger, hostility, and guilt (1919). Through out his formulations, anxiety (the "affect of fright) played the most crucial role. Fear is simply anxiety directed toward an external event of which the person is aware. At first, anxiety was interpreted as a manifestation of behaviour disorder, but in his later reformations he considered it to be the primary antecedent, that is, the chief cause.

থেকে স্নেহ প্রযত্ন না পায় তা হলে এরা আরও আক্রমণধর্ম্মী হয়ে ওঠে। পিতামাতা ও শিক্ষকগণ যদি শিশুদের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ পথে অনবরত প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করে, তাদের প্রত্যেকটি কাজকে যেমন বন্ধুচয়নে, কোন ক্রীড়ায় যোগদানে, পাঠক্রম নির্বাচনে বিরূপ সমালোচনা করে, তাদের সময়োচিত স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে উদাসীন থাকে, তা হলেও শিশুদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মানসিকতার উদ্ভব হয়। গৃহে পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভালবাসা ও আদর আপ্যায়ণ প্রদর্শনে যদি সমদর্শী না হন তা হলে, যে সব সন্তানরা অপেক্ষাকৃত অনাদৃত ও অবহেলিত থাকে, তাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীর উদ্রেক করে—তারা 'ভাগ্যবান ভাইবোনদের' ঈর্ষা করে ও তাদের সাথে মারামারি ও ঝগড়া করে থাকে। বিদ্যালয়েও শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের প্রতি স্নেহ প্রীতিদানে ও সহানুভূতি প্রদর্শনে সমদর্শী না হন তা হলে কিছু সংখ্যক ছাত্র একদিকে অসমদর্শী শিক্ষকদের সম্বন্ধে ও অন্য দিকে 'ভাগ্যবান সহপাঠী'দের সম্বন্ধে বীতরাগ ও ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। শিক্ষকদের অপমান করা—ছাত্রদের সাথে ঝগড়া বিবাদ ও মারধর করা তাদের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নয়।[১]

এর অন্য দিকও আছে। পিতামাতা সন্তানকে যদি অতি আদর দিয়ে, 'যখন যা চাই, তখন তাই পাই' এরকম অভ্যাসের সৃষ্টি করে থাকেন, তা হ'লে, বিদ্যালয়ে ও গৃহের বাইরে, খেলার মাঠে, বন্ধুদের সাথে চলতে গিয়ে, সে 'যখন যা চাই তখন তাই পাই'—এরকমটা না হলেই রেগে যায়; বন্ধুবান্ধবের সাথে, বিবাদ আরম্ভ করে দেয়, বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সাথে, ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করে, শিক্ষকদেরও অশ্রদ্ধা অপমান করতে ছাড়ে না।

প্রতিকার—

(১) গৃহ-পরিবেশ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ হতে হবে। যথাযথ নিয়ম শৃঙ্খলা

---

1. Lack of consistency in the treatment of a child is considered by some psychiatrists to be more harmful than treatment that is consistently harsh or unjust. Parents who resist the child's natural, and admirable, desires to grow up may arouse hostility, even though the resistence is well-intentioned as a protective measure. Interference with the choice of companions, laughing at immature choices of activities or possessions and criticism of athletic, social, or academic interests are ways of generating hostile feelings.

—Bernard W. Harold Mental Hygiene for Class room teacher.

গৃহ জীবন যাত্রায় বিরাজ করবে। মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে, বিশেষ করে স্নেহ প্রীতি, উৎসাহও আত্মস্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শারীরিক দিক থেকে যাতে কোন অসুস্থতা না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—বিদ্যালয় থেকে প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিকিৎসক দিয়ে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ও চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষার্থীর শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গৃহে ও বিদ্যালয়ে যত্ন নিতে হবে।

(২) খেলাধূলা, মুষ্টিযুদ্ধ, পর্বতারোহণ, গ্রামোন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণকর কর্ম ও শিল্প কর্ম প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীকে আনন্দকর সৃজন ধর্মী কর্মধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(৩) প্রতিযোগিতামূলক সৃষ্টিধর্মী কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আক্রমণধর্মিতার উদ্গতি সাধন করতে হবে—এর মধ্য দিয়ে শিশু নিজের শক্তি দিয়ে কিছু সৃষ্টি করতে পারছে ভেবে আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে উঠবে—সমাজ স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা সুস্থ হয়ে উঠবে—আত্মবিশ্বাস-হীনতা ও হীনমন্যতাজনিত যে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী তা দূর হবে।

(৪) কোন শিশুর মধ্যে সে পিতামাতা বা শিক্ষক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, এ বোধ যেন না আসে—এ দিক থেকে পিতামাতার আন্তরিক স্নেহ প্রযত্ন, শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও যত্ন অপরিহার্য্য।

(৫) শিক্ষার্থী ঝগড়া মারামারি এরূপভাবে কেন করে তার কারণ যথাযথ ভাবে খুঁজে দেখবার জন্য প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীকে মনশ্চিকৎসকের

The fundamental cause of aggression lies in feelings of insecurity, and specialists agree that redirection of the behaviour is much better than any attempt to repress it"—Norma E. Cutts and Nicnolas Moseley, Practical School Discipline and Mental Hygiene, Boston: Houghton Miffni Company, 181, P. 143.

Aggression may actually be stimulated by repressive discipline. The insecurity generated by threats and fear of consequences manifests itself in fighting quarrelsomeness and destraction when the individual is not under the immediate supervision of the feared person. Since such out bursts seem to challenge the authority and prestige of the teacher, the natural response on his part is one of hostility. This, however, merely aggnavates the situation. If becomes oblious, then, that the recommended attitude must be one of understanding, friendliness, and patience. Bernard, W. Harold: Mental Hygiene for class room Teachers.

নিকট নিয়ে যেতে হবে ও মনঃস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা দিয়ে, তার বিকাশ পর্য্যায়ের ইতিহাস, গৃহ পরিবেশের ও বিদ্যালয় পরিবেশের খুঁটিনাটি তথ্য প্রভৃতি জেনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) গঠনমূলক কাজের নেতৃত্ব দিতে হবে—পরীক্ষা মূলকভাবে শ্রেণী কক্ষের নেতৃত্ব দিয়ে, খেলা ধূলার জিনিসপত্রের দায়িত্ব দিয়ে দেখতে হবে। যখনই সে সামান্যতম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য তার আচরণে রাখবে তখনই তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

চুরিকরা (Stealing) : বিদ্যালয়ে আমরা এমন অনেক ছাত্র দেখি যাদের অভ্যাস সহপাঠীদের কলম, বই, পেন্সিল, ছাতা, টিফিন বাক্স প্রভৃতি চুরি করা। অনেক সময় এ চুরি করা কেবল বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, পাড়া প্রতিবেশীর জিনিসপত্র, সরকারী সম্পত্তি যেমন রাস্তায় লাইট পোষ্ট থেকে বাল্ব চুরি করা, বিদ্যুৎ তার প্রভৃতি নিয়ে নেওয়া, রেলগাড়ীর কামরা থেকে বাল্ব ও তার চুরি করা প্রভৃতির মধ্যেও প্রসারিত হয়। বাড়ীতে বাবার পকেট থেকে টাকা নিয়ে নেওয়া, কলম, ঘড়ি চুরি করে বাইরে বিক্রি করে দেওয়া, কখনো কখনো মা-বোনদের অলঙ্কারও চুরি করে বাইরে বিক্রয় করা প্রভৃতিও দেখা যায়।

এর মধ্যে অপরাধের লঘুত্ব গুরুত্ব আছে। যেমন বিদ্যালয় থেকে সহপাঠীর বই না বলে নিয়ে নেওয়া, বাড়ি থেকে দুটি, চারটি পয়সা না বলে নিয়ে নেওয়া, আর রেল কামরা থেকে বাল্ব চুরি করা, বাড়ি থেকে সোনার অলংকারাদি নিয়ে নেওয়া এক প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ নয়—ছেলের সমস্যার দিক থেকে, মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এর গুরুত্বের হের ফের আছে।

কারণ—কারণ বিশ্লেষণও বাইরের বা উপর স্তর থেকে আরম্ভ করে ভিতরের ও গভীর স্তরের কারণ খুঁজে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ আমরা বাইরের কারণ খুঁজে দেখবো।

বাহ্যিক কারণ—

(ক) মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যে আর্থিক সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন তা যদি গৃহে না থাকে, এবং এর সঙ্গে গৃহপরিবেশে পিতামাতার আত্মিক অনুশাসন যদি যথার্থ ও সুদৃঢ় না থাকে—তাদের আচার আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পরদ্রব্য হরণ দোষদুষ্ট বলে বিবেচিত না হয় তাহলে সেই পরিবারের যে সব শিশু

বড় হয়ে ওঠে তাদের কারও কারও মধ্যে চুরি করার অনেক নজির দেখতে পাওয়া যায়।

(খ) অসৎ সংসর্গ—বন্ধুবান্ধব যদি চুরি করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে অনেক সময় সংসর্গদোষে কেউ কেউ চুরি করায় প্রবৃত্ত হতে পারে।

(গ) অসুস্থ গৃহপরিবেশ—(১) বাড়িতে যদি সর্বদা ঝগড়া বিবাদ বর্তমান (মানসিক কারণ) থাকে, মাতাপিতার মধ্যে সর্বদা মতান্তর ও মনান্তর, বিবাদ-বিসম্বাদ, উত্তেজনা ও অশান্তি চলতে থাকে, তাহলে এরূপ পরিবেশে শিশুরা নিজেদিগকে নিরাশ্রয় বোধ করে—নিরাপত্তাবোধের অভাব (sense of insecurity) দেখা দেয়। অবচেতন মনের এই নিরাপত্তাবোধের অভাবের প্রকাশ অনেক সময় অপহরণের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে।

(২) কোন শিশু যদি জন্মকাল থেকে বাধা বন্ধহীনভাবে যা চায় তাই পায় তা হলে এহেন ব্যক্তি পরবর্তীকালে চুরি করে হলেও, নিজের সাধ মেটাতে চেষ্টা করে।

(৩) গৃহে যে শিশু অত্যন্ত কঠোর কর্কশ নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে প্রায় বিধ্বস্ত, নিরত সমালোচনা ও উপহাসে সদা বিব্রত বা যে শিশু বাড়িতে পিতামাতার আচার আচরণ ও হাভভাব থেকে অনুভব করে যে সে বাড়িতে ঠিক স্বাগত য় এমন শিশু, যারা তার এই অসহনীয় অপমান ও মানসিক যন্ত্রণার জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিনিসপত্র চুরি করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে। এরূপ আচরণ শিশু কিন্তু মনের গভীর ইচ্ছার দ্বারা তাড়া খেয়ে করে। এরূপ করে সে ভিতরের যে যন্ত্রণা তা থেকে হয়ত—কিছুক্ষণের জন্যও মুক্তি পায়। কেবল সজ্ঞানে চেতন মনের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে ছেলের এই আচরণকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং সেইজন্য কেবল 'চুরি করা পাপ' এমন উপদেশ দিয়েও এমন ছেলেকে চুরি করা থেকে বিরত করা যাবে না।

যে সব বস্তু ব্যক্তি অপহরণ করে থাকে, তার সাথে তার অবচেতন মনের একটা যোগ থাকে। বস্তুগুলি হচ্ছে তার অতৃপ্ত বাসনার প্রতীক—সেই বস্তুগুলিকে যে কোন উপায়ে পেয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সে অবচেতন বাসনাকে রূপকের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করার প্রয়াস করে।

তাছাড়া গৃহপরিবেশের অসুস্থতার জন্য, যেসব ছেলের অহং সত্তা (Ego) ঠিকভাবে গড়ে ওঠে না—তারা খুব সহজেই সুখের ও আরামের তাড়নায় অত্যন্ত কম আয়াসে সুখদায়ক কিছু পেয়ে ফেলার জন্য প্রয়াসী হয়ে ওঠে—

কোন কিছু অর্জন করার ধৈর্য্য এদের মানসিকতায় মধ্যে গড়ে ওঠে না। ফলে এরা কোন মূল্য না দিয়ে আরাম আর আয়াসের পিছনে ছুটতে থাকে।[১]

সুস্থ-ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য মা'র প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করে, কেননা শৈশবে শিশু মা'র উপর একান্তভাবে নির্ভর করে, মা'র সাথে যদি শিশুর সুস্থ ও সুদৃঢ় সম্বন্ধ গড়ে না ওঠে, তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুস্থ ধারায় গড়ে উঠতে পারে না, তার অহংসত্তা যথাযথ রূপে সৃষ্টি হয় না।

পিতামাতা ও গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিদের উপর যে অবদমিত ক্রোধ আছে, যে ক্রোধের জন্ম হয় পিতামাতার নিষেধে কোন কাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপ্রাপনে, সে ক্রোধেরই প্রকাশ ঘটে বাইরে যা কিছু নিষিদ্ধ তার অনুষ্ঠান করে। যেমন যেখানে লেখা থাকবে 'ধূমপান করা নিষিদ্ধ', সেখানে বেশী করে ধূমপান করা। প্রায়শঃই যে কাজটা এ রকম তাড়না থেকে অনুষ্ঠিত হয় তা পিতা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিকৃত কোন কাজের (যৌন ইচ্ছা প্রসূত) প্রতীক। কাজেই ঐরূপ কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, দুটি অবরুদ্ধ ইচ্ছার মুক্তি ঘটে—একটি হল অবদমিত অতৃপ্ত কাঙ্ক্ষিত বাসনাকে, যাকে চরিতার্থ করার পথে পিতার ধিক্কার ও নিষেধ প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছিল, পরিতৃপ্ত করার অপপ্রয়াস, অপরটি হল যে পিতার জন্য তার বাসনা অপরিতৃপ্ত রয়েছে, তাকে অগ্রাহ্য করা। স্টেকেল প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকদের মতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুরি করার (Kleptomania) এটাই হল গভীর কারণ। যে বস্তুটি চুরি করা হয় তা হল অবচেতন ভাবে কাঙ্ক্ষিত যৌন বস্তুরই প্রতীক এবং এই প্রতীকের মধ্য দিয়ে শৈশবে যে যৌন

---

1. "The ego of the problem child is still under the dominance of the pleasure principle and that for this reason impulses are acted out more easily than with a personality whose ego is governed by the reality principle" (Aichhorn, 1925). A problem child is the outcome of interacting environmental factors that lead to a disturbance in early instinct modification and object relationships. Owing to the child's absolute dependence on the mother, any factor which interferes with the establishment of a firm mother-child relationship and with consistent handling of a firm mother-child relationship and with consistent handling of primitive instructive drives will hinder the process of ego development. Separations for any length of time before the age of three, lack of interest or lack of time on the mother's side, 'personality defects in the mother which make her inconsistent during the periods of feeding, weaning and the training for cleanliness, all may lead to a disturbance in ego development,—Friedlander, 1945.

ইচ্ছা চরিতার্থ হওয়ার পথে পিতামাতার নিষেধাজ্ঞা ছিল তাও প্রতিফলিত হচ্ছে। ফ্রয়েড্ ও ফ্রয়েডের অনুগামীরা যদিও এই অবদমিত ইচ্ছাকে যৌন ইচ্ছা বলে অভিহিত করেছেন, McDougall প্রমুখ মনোবিদ্গণের মতে আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ও চাহিদাই এতে কাজ করে। ফ্রয়েড ও তার অনুগামীগণ যে পরিস্থিতিতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় তার নাম দিয়েছেন ঈডিপাস গূঢ়ৈষা (Œdipus Complex); অর্থাৎ এ পরিস্থিতিতে ছেলের মাকে পাওয়ার ইচ্ছা, পিতার দ্বারা প্রতিহত হয়, পিতাকে ছেলে মা'কে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। (Dr. Frink is a good Freudian and therefore, when he writes of rebellion against the father, he has in mind the Œdipus complex and implies that the son's rebellion against the father's authority is an expression of the repressed hatred and jealousy towards his father which are supposed by all good Freudians to be present in all men in the form of Œdipus complex. Frink is, then, following the Freudian rule or prejudice in suggesting a sexual root to the neurotic symptom. But, if we recognise, as we must, that the impulse to self assertion is rooted in an instinct entirely distinct from the sexual, then the compulsion is entirely intelligible on the "priciples of any sexual implication". McDougall W : An Outline of Abnormal Psychology.

The mania for doing things forbidden which so generally attacks boys or young men when they first go away from home to school or College, is really a breaking through of the impulses to rebellion against the father which hitherto had been better repressed, but now begin to find outlet by displacing themselves to almost anything that is prohibited. Often the thing done represents in a symbolic way, some specific act forbidden or condemned by their father (usually a sexual one) and thus two sorts of impulses find a common outlet. According to Stekel and others, kleptomania has this origin. The thing stolen is usually symbolic of some sexual thing unconsciously wished for, and which in childhood the authority of one of the parents stood in the way of attaining. The stealing thus simultaneously expresses through displacement, the desire for the thing or experience in question and the rebellion against the parent whose influence or authority originally interfered with its fulfilment."—Stekel.

প্রতিকার—চুরি করার অভ্যাস প্রথম দিকেই নজর দেওয়া উচিত। এ চুরি করা কারও কারও ক্ষেত্রে একটা সাময়িক বিচ্যুতি, এর পেছনে গভীর কোন মানসিক তাৎপর্য্য নেই। কারও হয়ত বয়স কম থাকায় ও বুদ্ধির অপরিণতি হেতু, কারও কিছু না বলে নেওয়াটা যে একটা অপরাধ এ বোধই হয় না। কেউ কেউ হয়ত সহপাঠীদের সাথে কৌতুক করার জন্য তার প্রিয় কোন বস্তু সাময়িকভাবে অপহরণ করল। কেউ হয়ত পিতামাতার আর্থিক দৈন্য থাকায় পড়ার বই কিনে দিতে পারছে না, সামনে পরীক্ষা, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য, কারও বই হয়ত না বলেই নিয়ে নিল, বা অন্য মূল্যবান কোন বস্তু সাময়িক লোভের বশে চুরি করল। এ ধরনের অপরাধ মারাত্মক কিছু নয়, অর্থাৎ ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা বা জটিলতা এর জন্য দায়ী নয়, বা বলা যায়, এ ধরনের আচরণের জন্য গভীর কোন মানসিক কারণ নেই।

যথাযথ ভালবাসা, সহানুভূতি দিয়ে এবং দারিদ্র্য ক্লিষ্ট শিশুকে তার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে এ ধরনের অপহরণ-অপরাধ দূর করা যায়। তবে গোড়া থেকেই এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন—অনেক দিন পর্য্যন্ত এরূপ চলতে থাকলে অবশেষে এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে এবং দণ্ডনীয় দুষ্ক্রিয়তার রূপ নিতে পারে।

কিন্তু গভীর মানসিক কারণে যে অপহরণ অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তা থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হলে, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে সুস্থ-ধারায় হয় সেদিকে নজর রেখে আমাদের গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ রচনা করতে হবে।

(১) শিশুর মৌলিক চাহিদার পূরণ।

(২) শিশুর অহংসত্তা যাতে যথার্থভাবে বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করে তার জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকগণ শিশুকে যথাযথভাবে স্নেহপ্রীতিতে সিঞ্চিত করবেন—তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদাকে যথাযথভাবে মেটাবেন।

(৩) আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদাকে সৃজনধর্মী প্রতিযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে সাহায্য করতে হবে। পাঠে ও অন্যান্য বিষয়ে যার যার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী যাতে পারদর্শিতা লাভ করতে পারে ও স্বীকৃতি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ জন্য গৃহে ও বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি শিশুর দিকে মনোযোগ দিতে হবে, তাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্যকে পর্য্যবেক্ষণ ও অভীক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্যকরূপে জানতে হবে এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা অনুযায়ী তার জন্য যথার্থ নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়ে

তাকে চালিত করতে হবে—বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, বিতর্কসভা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা ভিন্নও তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে ও তাদের সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়।

(৪) গৃহ পরিবেশে পিতামাতার সম্পর্ক সুস্থ হতে হবে, গৃহে যথাযথ শৃঙ্খলা থাকবে। বিদ্যালয় জীবনেও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করতে হবে। ছন্নছাড়া ও উচ্ছৃঙ্খল পরিবারের শিশুরা সৎআচরণাদর্শ খুঁজে পায় না—কি ভাবে চলবে এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

(৫) পিতামাতার ও শিক্ষকদের জীবন ও আচরণাদর্শে নির্লোভ ও নিস্বার্থপরতা থাকবে, তাদের ব্যক্তিত্ব সংহত হওয়া সমীচীন।

(৬) Kleptomaniaর লক্ষণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চিকিৎসকের নিকট গিয়ে ব্যক্তির অবচেতন মনের ইচ্ছা ও দ্বন্দ্বের স্বরূপকে যথাযথভাবে জেনে তার প্রতিকার করতে হবে।

মিথ্যাকথন (Lying) :—

নীতিবোধ মিথ্যাকথনকে কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেয় না। একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মিথ্যাকথনে অভ্যস্ত হয় তাহলে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সংহতি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জাগে। সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি মিথ্যাকথনকে প্রশ্রয় দেয় না। মোটের উপর মিথ্যা কথা বলা ব্যক্তিত্বের সংহতি অভাবেরই একটা লক্ষণ। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই কি মিথ্যা কথা বলা দোষযুক্ত? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময় তথাকথিত মিথ্যা কথা বলে থাকে। কিন্তু তাই বলে তারা একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করছে এমন মনে করার কোন হেতু নেই। কল্পনার পাখা মেলে তারা যখন নভোচারী হয়ে ওঠে, তখন কত কল্পনাকেই না তারা রঙ্গীন ভাষায় প্রকাশ করে—সত্য মিথ্যার সীমারেখা তখন তার কাছে অজ্ঞাত।

কোন কোন ছেলেমেয়েকে দেখা যাবে, ভয়ে মিথ্যা কথা বলছে, শাস্তির ভয়ে, আশ্রয়হীনতার ভয়ে, অনবরত কারণে অকারণে মিথ্যাকথা বলে যাচ্ছে। কেউবা আবার নিজের হীনমন্যতাকে (inferiority) ঢাকার জন্য, অহেতুক বাহাদুরী নেওয়ার লোভে নিজের সম্বন্ধে নানারূপ বানানো গল্প ফেঁদে বসে। এমনও দেখা যায় যে নিজে নানারূপ অন্যায় কাজ করছে, কিন্তু তার

সমস্ত দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছে এবং তা করতে গিয়ে বেশ বুদ্ধি খরচ করে ঘটনাগুলোকে নিজের মত সাজিয়ে গুছিয়ে বলে যাচ্ছে। এর বিপরীত অবস্থাও হতে দেখা যায়—যেমন, কোন ব্যক্তি নিজে কোন অন্যায় করেনি, অপরের দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে শাস্তি পাওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলছে। এ সব মিথ্যাকথনই কিন্তু ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতার দিক থেকে সমানভাবে আশঙ্কাজনক নয়। ছোট ছেলেদের কল্পনা বিলাসী মিথ্যাকথন আর নিজের হীনতাবোধকে ঢাকার জন্য মিথ্যাকথা বলা মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। হীনমন্যতাবোধ, নিরাপত্তার অভাব, ভয়, অত্যধিক অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্তকরার জন্য যে মিথ্যাকথন তা অসুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কাজেই এরূপ মিথ্যাকথন বিদ্যালয়ে বা গৃহে কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখা গেলে কেবল শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা 'মিথ্যা কথা বলা অন্যায়' এরূপ নীতিবাক্য শুনিয়ে এদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনা যাবে না। এদের ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতিকে পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংস্কার করে, প্রয়োজন হলে, মানসিক চিকিৎসা করে সারিয়ে না তোলা পর্য্যন্ত এরূপক্ষেত্রে মিথ্যাকথন বন্ধ করা যায় না।

কারণ :—

(১) **মৌলিক চাহিদার অপূরণ :**—আমরা পূর্বেই বলেছি মিথ্যা কথা বললেই যে শিশুর মানসিক অসুস্থতা হয়েছে বা মানসিক কোন বিকৃতি আছে এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। অনেক শিশু খেলার ছলে মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা ভান করে, যা হতে চায় অথচ হওয়ার সামর্থ্য নেই, তা মনে মনে বলে যেন সে তাই হয়ে যায়। এ রকম মিথ্যাকথনের একটা মাত্রা আছে, কিন্তু এ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বুঝতে হবে শিশু বাস্তব জীবনে তার কাঙ্ক্ষিত অনেক কিছু পাচ্ছে না—তার মৌলিক চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে। বাস্তব জীবনে কিছুই নেই, ভেবে ভেবে মিথ্যা অলীক জগতের আশ্রয় নেয়—সে 'সোনার হরিণের' কথা বলে আর ভেবে নিজের না পাওয়ার দুঃখকে মোচন করার প্রয়াস করে। এরূপ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া সমীচীন। বাস্তব জীবনে তার কোন্ আকাঙ্ক্ষাটি অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, সে জীবনে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা দরকার।

(২) **ভয় :**—গৃহে বা বিদ্যালয়ে 'লঘু পাপে গুরুদণ্ডের' যদি প্রচলন থাকে, তাহলে সে সব বাড়ীর ছেলেমেয়েরা নিজেকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে

ফেলে। প্রতি কাজে সমালোচনা, পদে পদে বাধা, নিষ্ঠুর শাস্তির ভয়—এমন গৃহ পরিবেশে শিশুরা ভয়ে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে।

(৩) **প্রত্যাখ্যান, পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চনা** ঃ—গৃহে প্রত্যাখ্যাত শিশুরা যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিজেকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার নানারূপ অপপ্রয়াস করতে থাকে—অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মিথ্যা কথা বলে। সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা ও নিজেকে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস সকল শিশুর মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখা যায়, কিন্তু এরূপ প্রয়াস যদি অস্বাভাবিক উপায়ে ও মাত্রাধিক হয় তাহলে বুঝতে হবে যে শিশুর মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে।

(৪) **অবদমিত ইচ্ছার পূরণ** ঃ—অনেক ইচ্ছাই শিশুরা বাস্তব জীবনে পূরণ করতে পারে না। সে সব ইচ্ছা পূরণে এরা এমন সব গালগল্প তৈরী করে বন্ধুবান্ধবকে এমনভাবে বলে যেন সব সত্য কথা বলছে। যেমন একটি ছেলে বাবাকে একটা ঘুড়ি কিনে দিতে বলল। বাবা তাকে ঘুড়ি কিনে কিছুতেই দিল না। ঘুড়ি উড়াবার ইচ্ছা তার অপূর্ণ রয়ে গেল। সে ঘরে বসে, পাড়ার ছেলেদের ঘুড়ি উড়ানো দেখে আর সে যদি একটা ঘুড়ি পেত তাহলে তাকে কিভাবে উড়াতো—এমনি কতকথা তার মনে আসে। স্কুলে গিয়ে সে তার বন্ধুদের একটা গল্প ফেঁদে বসে। সে কতকগুলো ঘুড়ি কিনল, কেমন রঙীন সুতো দিয়ে রং বেরঙের ঘুড়ি উড়ালো—কটা ঘুড়ি কেটে দিল ইত্যাদি। ফ্রয়েড-এর মতে অবদমিত ইচ্ছারা প্রায়শঃই যৌনজ। মিথ্যাকথনের পিছনে থাকে অপূর্ণ যৌন ইচ্ছা।

শারমান্ মিথ্যাকথনের কারণ সর্বদাই যে যৌনজ অবদমিত ইচ্ছার পূরণ-প্রয়াস এ কথা মেনে নেন নি, তবে এটা স্বীকার করেছেন যে অপহরণ ও মিথ্যা-কথন এ দুইএর কারণ এক। এই দুই উপায়েই অবদমিত ইচ্ছাজনিত যে দ্বন্দ্ব তার সমাধানের অপপ্রয়াস ঘটে থাকে।

(৫) **হীনতাবোধ** ঃ—পিতামাতার ভালবাসা ও যত্ন থেকে বঞ্চনা, তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এমন অনুভূতি শিশুর মধ্যে যদি আসে তাহলে তারা নিজেদের হীনবোধ করে। এছাড়া দেহগত কোন কারণে বা সামাজিক বা আর্থিক কারণে কোন শিশু যদি নিম্ন স্তরীয় প্রতিপন্ন হয় তাহলেও শিশুর মধ্যে

হীনমন্যতা আসে। এ হীনমন্যতা থেকে মুক্তিলাভের অপপ্রয়াস মিথ্যাকথনের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে।

(৬) **অস্বাভাবিক পাপবোধ (Guilt sense)** ঃ—নির্জ্ঞান মনে যদি কোন পাপ-বোধ প্রবল থাকে, তাহলে সে পাপস্খালনের জন্য ব্যক্তি সর্বদাই পথ খোঁজে। সে যে অপরাধ করেনি, তার জন্যও শাস্তি পেতে চায়। অন্য ব্যক্তি যে অপরাধ করেছে সেটা সে করেছে বলে মিথ্যাভাবে প্রচার করে ও তার জন্য শাস্তি পেতে চায়।

(৭) **অনুকরণ** ঃ—গৃহে ও বিদ্যালয়ে যখন শিশুরা দেখে যে পিতামাতা বা শিক্ষকগণ যে সব কথা বলেন বা যে সব প্রতিজ্ঞা করেন তার কোনটাই মানেন না, পিতামাতা তার ছেলেমেয়েদের কাছে এটা দেবেন সেটা দেবেন বলে অনেক কথা বলেন কিন্তু তার একটাও রক্ষা করেন না—এরূপ উদাহরণ যদি ছেলেমেয়েদের সামনে রাখা হয়, তাহলে ছেলেমেয়েরাও তার অনুকরণ করে। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের পুলিশের ভয়, জুজুর ভয় ও নানাবিষয়ে ভয় দেখিয়ে কোন কিছু থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় কিন্তু পরে ছেলেমেয়েরা দেখে যে, যে সব বিষয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল তার সবগুলিই মিথ্যা ভয় দেখানো। কার্য হাসিলের জন্য বাবা মা মিথ্যাকথা বলেন এটা ছেলেমেয়েরা যদি দেখে ও বুঝে তাহলে তারা এর অনুকরণ করতে পারে।

প্রতিকার—

(ক) গৃহে ও বিদ্যালয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন। পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান যথাযথ স্নেহ প্রীতি পাবে তাদের সাথে শিশু খোলাখুলি মেলামেশা করতে যাতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে ও গৃহ পরিবেশে এমন কোন ভাব থাকবে না যাতে শিশু সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। তাদের নিরাপত্তা বোধ যেন কোন ভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়। পিতামাতাকে সহৃদয় ও সুবিবেচক হতে হবে—লঘু পাপে গুরু দণ্ড যাতে কোন সময় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।[১]

---

1. Punishment that is unjust or used too frequently arouses fear in the child, which expresses itself in different ways according to temperament. Fear develops lying and decit and these show in a number of ways, both in normal and in problem children and delinquents. Binjamin, Z.: The young child & his parents.

(খ) ছেলেমেয়েদের কল্পনা বিলাসকে গল্প বলে ও তাদের কাছ থেকে গল্প শুনে কাজে লাগাতে হবে।

(গ) পিতামাতা ও শিক্ষকদের সর্বদা সত্য কথা বলে গৃহে ও বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।[1]

(ঘ) মিথ্যাকথনের কারণ যদি নির্জ্ঞান মনে নিহিত থাকে, তাহলে পরিবেশ পরিবর্তন ও মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) গৃহে ও বিদ্যালয়ে আনন্দকর পরিবেশ রচনা করতে হবে, প্রত্যেকটি শিশুকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করে তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে—খেলাধূলা ও অন্যান্য সহ পাঠক্রমিক বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। শিশুর মধ্যে যাতে অহেতুক হীনমন্যতা না আসে সেদিকে পিতামাতা ও শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি ও নেতিবাচক মনোভাব (Disobedience, Obstinacy and Negativism) :—

অনেক ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে গৃহে পিতামাতা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবাধ্য হয়ে চলা একটা নিত্য ঘটনা। এরকম অবস্থা কদাচিৎ কোন কারণে হল, এমন নয়। ভালমন্দ বিচার না করে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত এরা নিয়ে নেয়, তাদের সিদ্ধান্ত সর্বদাই পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও কোন অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশের বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তি যতই অনুরোধ উপরোধ করুক না কেন, যতই ভয় দেখাক, কিছুতেই এদের 'না' থেকে নড়ানো যায় না। পিতামাতা ও শিক্ষকদের কোন নির্দেশই এরা মানবে না এরকম একটা পণ করে যেন এরা চলে। যেখানে যত বিধি নিষেধ, যত আইন কানুন সব ভেঙ্গে ফেলতে এরা যেন মুখিয়ে থাকে। যদি বা কাজে তা প্রকাশ নাও করতে পারে, মুখে, হাভভাবে তা নিয়ত প্রকাশ করতে থাকে। প্রথম যে ছেলে অবাধ্য থাকে, পরে সেই একগুঁয়ে হয়ে উঠে। অবাধ্যতা ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠে—

1. Inconsistency of treatment is responsible for much trouble and disobedience because the child is in a state of uncertainty as to what we expect from him. Benjamin, Z.: The young child and his parents.

নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যে কিছুটা সক্রিয়তা কাজ করে। কেবল অবাধ্যতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার ভাগই বেশী, একগুঁয়েমিতে নিষ্ক্রিয়তা অনেক কমে যায়, এতে সক্রিয় মনোভাব কিছুটা আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, নেতিবাচকতায় ব্যক্তির মধ্যে সক্রিয় ও প্রকাশমান অবাধ্যতা দেখা দেয়। অবাধ্যতা ও একগুয়েমি যখন একত্রিত হয় তখনই তা নেতিবাচকতায় পর্য্যবসিত হয়।

কোন ব্যক্তি বা অবস্থাকে যদি কোন ছেলের পছন্দ না হয় তা হলে সে স্থান থেকে সে নীরবে সরে যেতে পারে। আবার কোন কোন ছেলের মধ্যে দেখা যায় একটা বিদ্রোহের মনোভাব—যাকে তার ভাল লাগল না, তার কাছ থেকে কেবল নীরবে সরে যাওয়া নয়, তাকে যে তার ভাল লাগছে না, সেটা তার আচরণের ভঙ্গিমা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেবে। বাইরের দাবী-দাওয়াকে, ব্যক্তি যখন সক্রিয়ভাবে বিপরীতমুখী কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে, বিদ্রোহাত্মক মনোভাব নিয়ে প্রত্যাখ্যান করে, তখনই আমরা তাকে নেতিবাচক মনোভাব বলে চিহ্নিত করি।

কারণ ঃ—

(ক) গৃহে ও বিদ্যালয়ে অতিশাসন, আরোপিতশৃঙ্খলা ও নির্মম শাস্তির প্রকোপ।

(খ) শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিটি কাজে বাধাদান ও অহেতুক সমালোচনা।

(গ) পিতামাতার নির্দয় আচরণ, সন্তান সম্পর্কে একটা প্রত্যাখ্যানের মনোভাব, গৃহে বিমাতার অবস্থান ও সন্তান প্রতিপালনে চরম উদাসীনতা।

(ঘ) কখনো কখনো অতি আদরে সন্তানের অহংবোধকে অবাস্তবোচিতরূপে ফাঁপিয়ে তোলা—'ধরাকে সরা জ্ঞান' করার মনোভাবের সৃষ্টি—এ থেকে যে যা বলছে সব তুড়ি দিয়ে অগ্রাহ্য করা। 'আমার চেয়ে বেশী আর কেউ বোঝে না' এ রকম একটা মনোভাব নিয়ে সব কিছু বিচার করা ও চলা।

(ঙ) বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব—প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করা—শিক্ষা নির্দেশনার ব্যবস্থা না থাকা।

(চ) বিদ্যালয়ে কুশাসন—অত্যধিক শৃঙ্খলা জর্জরতা—স্বতঃস্ফূর্তভাবের অভাব।

(ছ) খেলা-ধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা না থাকা। আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদার পরিমিত পরিতৃপ্তি শিক্ষার্থীদের না হলে--অন্য বিকৃত উপায়ে এ চাহিদার পরিতৃপ্তির পথ এরা খোঁজে—অপরকে অগ্রাহ্য করে, নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস করে।

নেতিবাচক মনোভাব সর্বাবস্থায়ই সমস্যামূলক আচরণের পর্য্যায়ে পড়ে না, বিপথগামিতাও সূচিত করে না। শিশুর বিকাশ পর্যায়ের কোন কোন সময়ে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন, দেড় বৎসর বয়স থেকে এরকম আরম্ভ হয়, তিন বৎসর বয়সে এ রকম অবস্থার একটা চরম পর্য্যায় আসে এবং চার বৎসর বয়স থেকে নেতি মনোভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এ সময়ে শিশুর জীবনে আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা তীক্ষ্ণভাবে কাজ করে—সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতা থেকে ধীরে ধীরে আত্ম-নির্ভর হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হলেও চলতে থাকে। কোন কিছুর সম্পূর্ণই এরা এক বাক্যে মেনে নিতে চায় না—আবার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপ্রতুলতার জন্য না মেনেও পারে না।

নবযুবকালেও এরকমটা দেখা যায়। নবযুবকযুবতীরা (adolescents) কারো অনুজ্ঞা বা অনুরোধও এক বাক্যে গ্রহণ করতে নারাজ—সব মতকেই নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়, বিদ্যালয়ে ও গৃহে দিন-লিপির প্রতিটি পর্বের যথার্থতা মূল্যায়ণ করার প্রয়াস করে। এ রকম অবস্থা নবযুবকালে কিছুটা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক নবযুবকযুবতীর মধ্যে এরূপ মনোভাব মাত্রাধিক দেখা যায়—এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিপথগামিতার লক্ষণ সূচিত করে। যে কোন অবস্থাতেই নেতিবাচক মনোভাব পরিবেশের প্রতি একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া যখন বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চলে না অর্থাৎ মাত্রাধিক ও নিয়ত নেতিবাচক মনোভাব, অবাধ্যতা কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, তখন সেটা অপসঙ্গতিমূলক আচরণের একটা প্রকার মাত্র। শৈশব কালে ও নবযুবকালের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা যদি নির্মমভাবে পদদলিত হয়, তাহলে এ থেকে ঘোরতর অবাধ্যতা ও নেতিবাচকতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়। এ সব ক্ষেত্রে প্রতিকারের ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজন।

"When withdrawing is shown as active refusal, stubbornness, contradictory attitudes, and rebellion against external demands it is negativism." Shaffer Shoben : The Psychology of Adjustment, p 198.

প্রতিকার :—

(ক) পিতামাতার আচার আচরণে ও মনোভঙ্গীতে এমন একটা পরিমিতি বোধ ও সংযম থাকবে যে, তাঁরা শিশুকে অতিশাসন, নিয়ত বাঁধনেও রাখবেন না, আবার 'যা চাই তাই পাই', এরকম একটা পরিবেশেরও সৃষ্টি করবেন না।

(খ) পিতামাতা গৃহ কাজে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করবেন—ছোট ছোট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের টেনে আনবেন—গৃহে দিন-লিপির প্রণয়নে ছেলেমেয়েদের মতামত চাইবেন। কখনো কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয়েও তাদের মতামত নিতে পারেন। নিরর্থক অফলপ্রসূ সমালোচনায় পিতামাতা ছেলেমেয়েদের জর্জরিত করবেন না। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যেন পারম্পর্য্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(গ) পিতামাতার সম্পর্ক স্নিগ্ধ ও আশ্রয়দায়ী হবে—সন্তান নিরাপদ বোধ করবে। গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যথোচিত মনোযোগ দেবেন—তাদের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে সদা সজাগ থাকবেন।

(ঘ) সন্তানের বয়স অনুযায়ী পিতামাতা তার কাছে সাফল্য প্রত্যাশা করবেন—যে বয়সে যা হবার নয় বা যার যা হবার নয় তাকে তাই জোর করে করার প্রয়াস যেন কোন প্রকারে না করা হয়। (এতে শিশুর মধ্যে পিতামাতা সম্পর্কে গভীর অনীহা ও বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠে।) বিদ্যালয়ে শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে—এর জন্য শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র সম্বন্ধে মনোযোগী হবেন,—ক্রমযোগী সর্বাত্মক-লিপি বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রাখা হবে। শিক্ষা-নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) পিতামাতার প্রত্যাখ্যানজনিত, দৈহিক অস্বাস্থ্য বা শারীরিক কোন বিকৃতির জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতার ভাব দেখা দেয় (যার প্রকাশ অন্যকে অমান্য করে প্রকাশ পেতে পারে), তা হ'লে, কালক্ষেপ না করে মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া সমীচীন হবে।

যৌন-দুষ্কৃতি (Sex-offences) :—

নবযুবকালে যৌন-চেতনার উন্মেষ হয়—শারীরিক নানা পরিবর্তন, বিশেষ করে যৌন ও অন্যান্য নালীবিহীন গ্রন্থির কার্য্য-কারণের ফলে ব্যক্তির শরীরে ও মনে যৌনতার আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটে। নূতন উন্মাদনা জীবনে বাঁধভাঙ্গা

(ছ) খেলা-ধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা না থাকা। আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদার পরিমিত পরিতৃপ্তি শিক্ষার্থীদের না হলে--অন্য বিকৃত উপায়ে এ চাহিদার পরিতৃপ্তির পথ এরা খোঁজে—অপরকে অগ্রাহ্য করে, নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস করে।

নেতিবাচক মনোভাব সর্বাবস্থায়ই সমস্যামূলক আচরণের পর্য্যায়ে পড়ে না, বিপথগামিতাও সূচিত করে না। শিশুর বিকাশ পর্যায়ের কোন কোন সময়ে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন, দেড় বৎসর বয়স থেকে এরকম আরম্ভ হয়, তিন বৎসর বয়সে এ রকম অবস্থার একটা চরম পর্য্যায় আসে এবং চার বৎসর বয়স থেকে নেতি মনোভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এ সময়ে শিশুর জীবনে আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা তীক্ষ্ণভাবে কাজ করে—সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতা থেকে ধীরে ধীরে আত্ম-নির্ভর হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হলেও চলতে থাকে। কোন কিছুর সম্পূর্ণই এরা এক বাক্যে মেনে নিতে চায় না—আবার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপ্রতুলতার জন্য না মেনেও পারে না।

নবযুবকালেও এরকমটা দেখা যায়। নবযুবকযুবতীরা (adolescents) কারো অনুজ্ঞা বা অনুরোধও এক বাক্যে গ্রহণ করতে নারাজ—সব মতকেই নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়, বিদ্যালয়ে ও গৃহে দিন-লিপির প্রতিটি পর্বের যথার্থতা মূল্যায়ণ করার প্রয়াস করে। এ রকম অবস্থা নবযুবকালে কিছুটা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক নবযুবকযুবতীর মধ্যে এরূপ মনোভাব মাত্রাধিক দেখা যায়—এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিপথগামিতার লক্ষণ সূচিত করে। যে কোন অবস্থাতেই নেতিবাচক মনোভাব পরিবেশের প্রতি একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া যখন বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চলে না অর্থাৎ মাত্রাধিক ও নিয়ত নেতিবাচক মনোভাব, অবাধ্যতা কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, তখন সেটা অপসঙ্গতিমূলক আচরণের একটা প্রকার মাত্র। শৈশব কালে ও নবযুবকালের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা যদি নির্মমভাবে পদদলিত হয়, তাহলে এ থেকে ঘোরতর অবাধ্যতা ও নেতিবাচকতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়। এ সব ক্ষেত্রে প্রতিকারের ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজন।

"When withdrawing is shown as active refusal, stubbornness, contradictory attitudes, and rebellion against external demands it is negativism." Shaffer Shoben : The Psychology of Adjustment, p 198.

প্রতিকার :—

(ক) পিতামাতার আচার আচরণে ও মনোভঙ্গীতে এমন একটা পরিমিতি বোধ ও সংযম থাকবে যে, তাঁরা শিশুকে অতিশাসন, নিয়ত বাঁধনেও রাখবেন না, আবার 'যা চাই তাই পাই', এরকম একটা পরিবেশেরও সৃষ্টি করবেন না।

(খ) পিতামাতা গৃহ কাজে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করবেন—ছোট ছোট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের টেনে আনবেন—গৃহে দিন-লিপির প্রণয়নে ছেলেমেয়েদের মতামত চাইবেন। কখনো কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয়েও তাদের মতামত নিতে পারেন। নিরর্থক অফলপ্রসূ সমালোচনায় পিতামাতা ছেলেমেয়েদের জর্জরিত করবেন না। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যেন পারম্পর্য্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(গ) পিতামাতার সম্পর্ক স্নিগ্ধ ও আশ্রয়দায়ী হবে—সন্তান নিরাপদ বোধ করবে। গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যথোচিত মনোযোগ দেবেন—তাদের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে সদা সজাগ থাকবেন।

(ঘ) সন্তানের বয়স অনুযায়ী পিতামাতা তার কাছে সাফল্য প্রত্যাশা করবেন—যে বয়সে যা হবার নয় বা যার যা হবার নয় তাকে তাই জোর করে করার প্রয়াস যেন কোন প্রকারে না করা হয়। (এতে শিশুর মধ্যে পিতামাতা সম্পর্কে গভীর অনীহা ও বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠে।) বিদ্যালয়ে শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে—এর জন্য শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র সম্বন্ধে মনোযোগী হবেন,—ক্রমযোগী সর্বাত্মক-লিপি বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রাখা হবে। শিক্ষা-নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) পিতামাতার প্রত্যাখ্যানজনিত, দৈহিক অস্বাস্থ্য বা শারীরিক কোন বিকৃতির জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতার ভাব দেখা দেয় (যার প্রকাশ অন্যকে অমান্য করে প্রকাশ পেতে পারে), তা হ'লে, কালক্ষেপ না করে মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া সমীচীন হবে।

যৌন-দুষ্কৃতি (Sex-offences) :—

নবযুবকালে যৌন-চেতনার উন্মেষ হয়—শারীরিক নানা পরিবর্তন, বিশেষ করে যৌন ও অন্যান্য নালীবিহীন গ্রন্থির কার্য্য-কারণের ফলে ব্যক্তির শরীরে ও মনে যৌনতার আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটে। নূতন উন্মাদনা জীবনে বাঁধভাঙ্গা

চঞ্চলতা নিয়ে আসে। এরূপ পরিবর্তন নবযুবকালে স্বাভাবিক পরিবর্তন ও পরিণতি। সংযম ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতা নিয়ে, নব যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরের প্রতি শালীনতা ও মর্য্যাদার ভাব নিয়ে যদি চলে, যদি নব যুবক যুবতীরা খেলাধূলা, শিল্প-চর্চা, সংগঠনমূলক কাজ, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে তৎপর হয় ও সেই সঙ্গে গৃহে ও বিদ্যালয়ে আনন্দকর ও পবিত্র পরিবেশ বিরাজ করে, তা হলে যৌন-বিকৃতি আসার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমে যায়।

যৌন-বিকৃতি নানা রূপ নিতে পারে। অত্যধিক স্বমেহন, বলাৎকার, শ্লীলতা হানির চেষ্টা করা, অশ্লীল ছবি গোপনে সংগ্রহ করা, বার-বণিতার সংসর্গ করা, নারীত্বের অবমাননা, স্ত্রী পুরুষকে আবার পুরুষ স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করে আঘাত করে কামার্ততা চরিতার্থ করা, কখনো বা স্ত্রীর দ্বারা নিজেকে আহত করে-লাঞ্ছিত করে যৌন সুখ অনুভব করা প্রভৃতি বিকৃতি যৌন-বিকৃতি ও দুষ্ক্রিয়তার মধ্যে দেখা যায়।

কারণ :—

যৌন-দুষ্ক্রিয়তার কারণ কেবল ব্যক্তির যৌন-জীবনের মধ্যেই সীমায়িত থাকে না। সমগ্র জীবনাচরণ, সমগ্রভাবে ব্যক্তির পরিবেশ এতে কাজ করে—যৌন-জীবন সমগ্র জীবনধারণ ও ধারণারই একটা দিক। কাজেই, যৌবনাগমে যৌন-দুষ্ক্রিয়তার কারণ শৈশব বা কৈশোরে থাকতে পারে। মোটের উপর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক পর্য্যায়ে যদি কোন বিকৃত প্রভাব কাজ করে তাহলে ব্যক্তিত্বে যে বিকৃতি আসে তারই প্রকাশ যৌন-বিকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে।

(ক) গৃহ পরিবেশে শৃঙ্খলার ও আত্মিক অনুশাসনের অভাব।

(খ) পিতামাতার জীবনাদর্শে সংযম ও শুচিতার অভাব।

(গ) পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চনা।

(ঘ) বৈজ্ঞানিক যৌন-শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা না থাকা।

(ঙ) নির্মল আনন্দ লাভের গৃহে ও বিদ্যালয়ে কোন সুযোগ না থাকা।

(চ) নিয়ত দৈহিক অসুস্থতার জন্য বিকাশ বৃদ্ধি রোধ হলে ব্যক্তি যদি তার শক্তি-সামর্থ্যকে গঠনাত্মক কাজে নিয়োগ করতে না পারে, সামাজিক মেলামেশায় কোন স্ফূর্তি না থাকে, তাহলেও ব্যক্তির মধ্যে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এ থেকে নানাপ্রকার যৌন বিকৃতি আসতে পারে।

(ছ) বাল্যকালে ও কৈশোরে ছেলেমেয়েরা যদি বাবা মা'র সাথে স্থানাভাবের জন্য একই ঘরে থাকে ও একই শয্যায় শয়ন করে এবং স্পর্শকাতর মনের উপর যদি কখনো বাবা মা'র যৌন-ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা আঘাত করে, তা হলে ব্যক্তির মধ্যে যৌন-কৌতূহল বহুগুণিত হয়, বাবা মা'র সম্বন্ধে ধারণায় চিড় খায় এবং যৌন বিষয়ে ও অনান্য বিষয়ে বাবা মা'র উপদেশনামা সম্বন্ধে বিশ্বাস পূর্বের মত আর কার্যকরী থাকতে চায় না। এ ছাড়া, শৈশবে বা কৈশোরে এরূপ অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তীকালে নানাপ্রকার উন্মায়ু (Neuroses) রোগও হতে পারে।

(জ) অনেক মৃদু সমরতির (Homosexuality) কারণ হল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুস্থভাবে মেলামেশার কোনপ্রকার সুযোগ না থাকা। এ সব ক্ষেত্রে ছেলেরা ছেলেদের ও মেয়েরা মেয়েদের সম্বন্ধে পরস্পর অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ করে—কথোপকথন, এক সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরার মধ্যে কামজ উত্তেজনাও প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। এরূপ উত্তেজনা বাহ্যিক কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ না পেলেও নিয়ত সমলিঙ্গ মেলামেশার ফলে ক্রমে এরূপ যৌন-তাড়ন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কোন প্রকারে যদি সমরতি চরিতার্থ হবার মত অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তা হলে পরে এরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকতে পারে; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে ইতর-কামে (hterosexuality) অনীহা প্রকট হতে দেখা যায়।

(ঝ) পারিবারিক অসুস্থ পরিবেশ, যেখানে নিয়ত দ্বন্দ্ব, চিৎকার, মারধর ও হুল্লোড় চলতে থাকে, যেখানে পিতামাতার কোন স্থির আচরণাদর্শ নেই, সে সব পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে না—বিবেক সত্তা (যা মূলতঃ শৈশবকালে পিতামাতার মানস অবয়ব ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রথিত হয়ে সৃষ্ট হয়) অপুষ্ট থাকে, পরিণামে ব্যক্তি সুখান্বেষণে ছুটতে থাকে, বিশেষ করে নবযুবকালে যখন যৌন-চেতনার স্ফূরণ ঘটে, তখন তা বাঁধ ভাঙ্গা উদ্বেলতায় ব্যক্তিকে উদভ্রান্ত করে তোলে, বিকৃত পথে যৌন সুখ প্রাপণে ছুটিয়ে নেয়। তাছাড়া এ সময়ে যৌন কৌতূহলও বহুগুণিত হয়। নবযুবক যুবতীর যৌন কৌতূহল যদি পিতামাতা, শিক্ষক বা অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা সুস্থ পথে নিয়ন্ত্রিত না হয়, যদি যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ও যৌন-জীবনের সাথে সুস্থ পারিবারিক জীবন, সংস্কৃত মহত্তর জীবনের সন্নিবেশ কোথায় এ বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থা করা না হয়, তা

হলেও যৌন-অপরাধ নানাপথে এ বয়সে ঘটতে পারে। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে, "মানুষের কাম কয়েকটি স্তরের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করে যৌবন সমাগমে যৌনস্তরে উপস্থিত হয়। ইডিপাস ভালবাসা মানুষের জীবনে এইরূপ একটি স্তর। এই স্তরে পুরুষ-শিশু মাতাকে এবং মেয়ে-শিশু পিতাকে অবলম্বন করে আপনার ভালবাসা চরিতার্থ করে। ইডিপাস ভালবাসার গুরুত্ব মানুষের জীবনে অত্যন্ত বেশী। এই স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষকে একদিন যেতে হয় কিন্তু যৌবন সমাগমের পূর্বে এর সম্পূর্ণ তিরোধান প্রয়োজন, নতুবা আমাদের মানসিক জগতে একটা বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা। ইডিপাস ভালবাসা পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্বে কতকগুলি ধাপের মধ্য দিয়ে যায়। প্রথম দশায় মাতার উপরের ভালবাসা মাতৃস্থানীয়া অন্যান্য স্ত্রীলোক, যথা—কাকী, মামী, পিসী প্রভৃতির উপর বিন্যস্ত হয়ে পড়ে; দ্বিতীয় দশায় আপনার ভগ্নী অথবা ভগ্নী স্থানীয়া অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হয়। সর্বশেষে আপনার পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে মানুষ অনাত্মীয়া স্ত্রীলোককে ভালবাসতে সমর্থ হয়। এই ধাপগুলির প্রভাব যদি মানুষ যৌবন সমাগমের পূর্বে অতিক্রম করতে না পারে, তাহলে **অজাচার** (incest) সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"[১] * (এ সম্বন্ধে বিশদভাবে নির্জ্ঞান মন ও 'লিবিডো'র ক্রমবিকাশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।) ইডিপাস স্তরের সুস্থ অতিক্রমণ নির্ভর করে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সুস্থ সম্পর্কের উপর। পিতামাতার সম্পর্ক যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার প্রতিফলন শিশুর যৌনবিকাশে পড়ে, বিশেষ করে ইডিপাস স্তরে এর সবিশেষ প্রভাব কাজ করে। কাজেই ফ্রয়েডীয় মতে যৌন-শক্তির বিকাশ পর্যায়ের সুস্থতা অসুস্থতার উপর যৌন-জীবনের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে। যৌন বিকৃতির কারণও শৈশবকালীন ও কৈশোরকালীন যৌন-মানস শক্তির (libido) স্বাভাবিক প্রবহমানতার উপর নির্ভর করে। কোন পর্যায়ে এর সংবন্ধন (fixation) ব্যক্তিত্বকে বিপর্যস্ত করে—যৌন জীবনে ও যৌন মানসিকতার মধ্যে নানারূপ বিকৃতি আসে। এ ছাড়া পরিবার-সম্পর্কের অসুস্থতার জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা, দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ প্রভৃতি অসুস্থ আবেগের প্রকোপ হয়, তা হলে ব্যক্তি বিকৃত উপায়ে যৌন পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে এ সকল আবেগ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে।

১। ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ঃ নির্জ্ঞান মন।

প্রতিকার :—

(ক) যৌন-বিকৃতির প্রতিকার করতে হলে প্রথম কাজ হবে শিশুর ব্যক্তিত্বকে সুস্থভাবে গড়ে তোলার সকলপ্রকার উপাদান পরিবেশে সন্নিবেশিত করা। হীনমন্যতা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি অসুস্থ মানসিকতার হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতির জন্য শিশু যৌন-তৃপ্তির পথ খোঁজে। কাজেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এ সব অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার যাতে উদ্ভব না হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য শিশুর সকল মৌলিক চাহিদা যাতে পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—পিতামাতার সম্বন্ধ যাতে মধুর ও সচ্ছন্দ হয়, পিতামাতা যাতে শিশুর প্রতি, নবযুবকালে যুবক যুবতীদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) যৌন-শিক্ষার প্রবর্ত্তন—গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দান করবেন, যাতে একদিকে যৌন বিষয়ের শরীরবৃত্তগত জ্ঞান, অন্যদিকে যৌন-মানস শক্তির সার্থক উদ্‌গতির মধ্য দিয়ে কিভাবে সফল ও সংস্কৃত জীবনের প্রস্ফুটন ছেলেমেয়েদের হতে পারে সে বিষয়ে তারা সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারে। বিকৃত পথে যৌন কৌতূহল যাতে ছেলেমেয়েরা মেটাতে উদ্যত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এর জন্য যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন আরও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরীয় শিশুদের মধ্যেও যৌন বিষয়ে কৌতূহল আরম্ভ হয়। ছেলে ও মেয়েরা জৈবিক অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে—বিশেষ করে মূত্রত্যাগ বিষয়ের মাধ্যমে; এছাড়া শিশুরা অনেক সময় নিজেদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করে ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করতে পারে—আঙ্গুল চুষেও এরকমের সুখ তারা পেয়ে থাকে। এ সকল কৌতূহল ও ক্রিয়াকাণ্ড শিশুর আত্ম-অবগতির চাহিদা থেকে উৎসারিত—তার দেহের, দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে তার যে স্বাভাবিক কৌতূহল, সেই কৌতূহলই যৌন বিষয়ে অবগতির জন্য তাকে প্রবুদ্ধ করে। এরূপ স্বাভাবিক আত্ম-অবগতির কৌতূহল ও সংশ্লিষ্ট যৌন কৌতূহল অস্বাভাবিক ও খারাপ কিছু নয়—লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন এ বয়সে একাকী না থাকে—বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের মধ্যে রেখে শিশুকে যৌন বিষয়ে অত্যধিক ভাবিত ও স্বমেহন প্রভৃতি রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। নিরস একাকীত্ব ব্যক্তিকে প্রায়শঃই স্বমেহন প্রভৃতি ক্রিয়ায় প্ররোচিত করে।

(গ) গৃহ ও বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, যৌথ-ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-চর্চ্চা, সঙ্গীত-চর্চ্চা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক বিষয়ের অবতারণা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর মন আনন্দে ভরপুর থাকে—সার্থকভাবে যৌন-শক্তির উদ্গমন হতে পারে।

(ঘ) কোন্ বয়সে যৌনাচরণের কতটুকু স্বাভাবিক, কোন্ পর্য্যায় অতিক্রম করলে বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা আসে সে সম্বন্ধে নবযুবকযুবতীদের অবহিত করে তুলতে হবে, যাতে অহেতুক লজ্জা, পাপবোধ ও এ থেকে হীনমন্যতা এদের মধ্যে দেখা না দেয়। এই লজ্জা ও পাপবোধ জনিত যে যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, ব্যক্তি আরও বিকৃত যৌনাচারণে নিজেকে নিয়োগ করতে পারে—যা করে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে আবার কঠোরভাবে ধিক্কার দিতে থাকে—এ যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে হাল্কা করার জন্য পুনরায় অবৈধ যৌনাচারণে নিজেকে লিপ্ত করে—এরকম ভাবে আচরণের একটা চক্রগতি চলতে থাকে। কাজেই স্বাভাবিক যৌন-বিষয়ের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়, ঘৃণা ও পাপবোধ যাতে ব্যক্তির মানস-ভূমিতে রোপিত ও গ্রথিত না হয়, সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটের উপর যৌন শক্তির অবদমন নয়—এর উদ্গমন (Sublimation) যৌন সুস্থতা আনয়নের প্রকৃষ্টতম ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়।

(ঙ) পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তি, যাঁদের তরুণরা আদর্শ হিসাবে অনুকরণ করে থাকে, তাঁদের জীবন যেন মিতাচারে পূত থাকে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে যেন ব্যভিচারিতা, অশালীনতা ও কপটতা না থাকে।

(চ) গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ যেন উজ্জ্বলকান্তি কল্যাণময় হয়—যৌন-সুখ থেকেও যে জীবনে আরও গভীর ও মহত্তর সুখ ও আনন্দ আছে, সে জ্ঞানে ও অনুভূতিতে প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে উদ্দীপ্ত হয় সেরকম পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে।

(ছ) দৈহিক অস্বাস্থ্য ও বিকৃতি থেকে বা মানসিক কোন দ্বন্দ্ব জর্জরতা থেকে যে বিকৃত যৌনাচরণ দেখা যায় তা নিরসনের জন্য যথাসময়ে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র বা মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দৈহিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে—কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে যে মানস-জটের (Complex) উদ্ভব হয়েছে তাকে নিরসন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে পরিবেশান্তর

ঘটিয়ে অর্থাৎ ব্যাক্তিকে অসুস্থ পরিবেশ থেকে সুস্থ পরিবেশে (Correctional home) আনয়ন করে নূতন উগদতি সহায়ক আচরণ ছাঁদ সৃষ্টি করে তার পূর্বতন বিকৃত যৌনাচরণের ছাঁদ (bond) ভেঙে ফেলতে হবে।

(জ) পিতামাতা ও তার ছেলেমেয়েরা একটা বয়সের পর যাতে একই ঘরে ও একই শয্যায় শয়ন না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

চাপা ও শঙ্কাপরায়ণ সমস্যামূলক আচরণের প্রকার ঃ—

বিশদভাবে এর কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা—

(ক) *শয্যামূত্র* (Enuresis)—

শিশু জন্মাবার পর তার মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে কোন সংযমবোধ থাকে না—স্থানকাল বিষয়ে তার কোন চৈতন্য থাকে না। ধীরে ধীরে শিশুর পরিপাক (maturation) ক্রিয়ার প্রভাবে তার স্নায়ুতন্ত্র পরিণতির দিকে যেতে থাকে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ক্রিয়াকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়েও স্বাভাবিকভাবে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে যেখানে সেখানে যখন তখন সে আর মলমূত্র পরিত্যাগ করে না। কেবল পরিপাক ক্রিয়াই নয়, এ বিষয়েও পিতামাতার শিক্ষা (Toilet Training) শিশুকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে। সাধারণতঃ তিন থেকে সাড়ে তিন বৎসর পর ছেলেমেয়েরা আর বিছানায় প্রস্রাব করে না। এ বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কালেভদ্রে যদি ছেলেমেয়েরা দু-একবার বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে, তাহলে সেটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে করার নেই। শারীরিক কোন কারণে যেমন পাইলিটিস্ (Pyelitis), মূত্রাশয়ে (Kidney) কোন প্রকার দূষিত বস্তুর সংক্রামণের জন্য, সুষুম্না-কাণ্ডের (Spinal Cord) কোন রোগ বা বিকৃতির (Spinalbifida) জন্য, মূত্রাশয়ের ক্রিয়াতে যে বিকৃতি ঘটে, তার ফলে যদি এরূপ কোন ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করে তাহলে আমরা তাকে শয্যামূত্র (Enuresis) রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে করবো না। প্রকৃত পক্ষে শয্যামূত্র রোগে আক্রান্ত ছেলে বা মেয়ের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে অটুট থাকে—তাদের মূত্রাশয়ের কোন প্রকার গাঠনিক বিকৃতি বা বিচ্যুতি দেখা যায় না। অধিকাংশ শয্যামূত্র রোগীর ক্ষেত্রে দৈহিক কোন বিকলতা থাকে না।

কারণ ঃ—

(ক) অধিকাংশ পরিবারেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিছানায় প্রস্রাব করার জন্য ছেলেমেয়েদের শাসন করা হয়; শিশুরা যখন রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করে দেয় তখন মা'রা স্বভাবতঃই বিরক্তি প্রকাশ করে, কখনও কখনও স্পষ্টভাবে কখনও অস্পষ্টভাবে এ বিরক্তি মা প্রকাশ করে, শিশু তার তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা দিয়ে যত অস্পষ্টভাবেই হোক, এর তাৎপর্য বুঝতে পারে, শিশু অলসভাবে তা রোধের প্রয়াসও হয়ত করে, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তখনও এমন নয় যে সে এ বিষয়ে সফলকাম হবে। মা'রা ঘড়ি ধরে ছেলে মেয়েদের প্রস্রাব করান। এ থেকে তাদের মধ্যে একটা অভ্যাস তৈরী হয়ে যায়। সময় মত নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্রাবাদি না করলে কেবল মা-ই নয়, বাড়ির সকলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং এর জন্য শাসন তর্জনও হয়; ফলে ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরে সময়মত প্রস্রাব করার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

মা যদি শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ থাকেন বা নিজের ব্যক্তিত্বের অসুস্থতার জন্য নিজের মানসিক সমস্যা নিয়ে যদি জর্জ্জরিত থাকেন, সন্তানদের সম্বন্ধে তাহলে এ অবস্থা তাঁকে উদাসীন করে তোলে, কখনো কখনো বা সন্তান সম্পর্কে একটা ক্রোধ ও প্রত্যাখ্যানের ভাব মনে প্রচ্ছন্নভাবে নিয়ে আসে, এরকম অবস্থায় সন্তানরা মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে কোন শিক্ষালাভ করে না; এ শিক্ষার অভাবে বয়স অনেকটা বেড়ে গেলেও (ছয়/সাত বৎসর কখনও বারো তেরো, কখনও তারও পরে) তারা বিছানায় প্রস্রাব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মা'র নিজেরই এ বদভ্যাস রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমরা যে এ দোষ দেখতে পাই তার কারণ ছেলেমেয়েরা নিজেরা নয়—পারিবেশিক কারণ। বিশেষ করে মা'ই এর জন্য প্রায় সম্পূর্ণ দায়ী।

(খ) **পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান**—কোন শিশু যদি অনুভব করে যে সে বাবা মা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, বিশেষ করে মা কর্তৃক, তাহলে এর প্রতিশোধ হিসাবে, শিশু অচেতনভাবে এ পথ অবলম্বন করতে পারে। ঘুম থেকে উঠেই রাত্রে বিছানায় যাওয়া অবধি কোন ছেলে যদি অনবরত বাড়িতে বাবা মা কর্তৃক সমালোচনার কষাঘাতে জর্জ্জরিত হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে গিয়ে প্রতিপদে বাধা পায় তা হলে শিশু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, শারীরিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তার লোপ পায়। এমনি অবস্থায় ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে—বিছানায় প্রস্রাব করার জন্য মা তাকে আবার চতুর্দিক

থেকে লাঞ্ছিত করে এর ফলে সে আরও খেই হারিয়ে ফেলে। বাবা এসব বিষয়ে মা'র পক্ষ নিয়ে ছেলেকে আক্রমণ করে বা নীরব থাকে। এর ফলে বাবা মা সম্বন্ধে ছেলের একটা ক্ষোভ জন্মে। এর প্রতিবাদ করার পথও সে খোঁজে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিধিবদ্ধ নিয়ম চূর্ণ করা, প্রভৃতি অশালীন আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বিছানায় প্রস্রাব করা এ রকম আচরণেরই একটা প্রকার, কেননা এ রকম আচরণ করলে ছেলে জানে যে, মাকে খাটতে হবে এবং তার বিরক্তির উদ্রেক করতে পারবে।

(গ) পিতামাতা যদি সন্তানকে স্নেহ ভালবাসা সুষমভাবে না দেন, সন্তান যদি নিজেকে স্নেহ পিপাসিত মনে করে; যদি পরিবারে সৎমা থাকে, নূতন কোন ভাই বা বোন জন্মালে মা'র মনোযোগ যদি অন্যত্র সরে যায়, তাহলে, শিশু স্নেহ-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ওঠে। এমনি অবস্থায় মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, মা'র মনকে তার দিকে ফেরাবার জন্য বিকৃত আচরণ করে থাকে— বিছানায় প্রস্রাব করা এমনিতর আচরণেরই একটি। এক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি অবচেতনভাবে কাজ করে। মা'র পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, তার উদাসীনতা ও প্রত্যাখ্যানের জন্য মাকে সে তেমন করে পাচ্ছে না। মাকে আরও গভীর ভাবে পেতে চাই এমন সব ইচ্ছাকে সে ধীরে ধীরে অবদমিত করে। এ অনুভূতিকে সে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে পারে না, পাছে বাবা তাকে শাস্তি দেয়। এই সব কারণে সে অন্য উপায়ে মা'র মনোযোগ আকর্ষণ করার নানারূপ পরোক্ষ ও বিকৃত কৌশল অবলম্বন করে। এর মধ্যে শৈশবকালীন পশ্চাৎগামীতা কাজ (regression) করে।*

---

* (From a case study)

The enuresis, was a deliberate conscious act and was done to take revenge on the parents, particularly on the mother, for their unkind treatment of him. This type of enuresis can be classified as revenge enuresis. (Pearson, G. H. J., Emotional disorders of children. PP44)

In some cases the child knows that his wetting is done consciously as a spiteful action against the parents. He expresses his revenge in this way because he is either afraid or unable to express it otherwise. In others, the child may be unconscious of the fact that he feels spiteful toward his parents and that his enuresis is a spiteful reaction. Here there has been regression to the anal sadistic stage of development, the clinical syndrome being one of obsessional neruosis with enuresis as the presenting symptom.

Pearson, G. H. J. Emotional disorders of child ren. P 44.

(ঘ) শয্যায় প্রস্রাবকরা এংজাইটি হিষ্টিরিয়ারও একটা সংলক্ষণ হতে পারে। গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে শয্যামূত্র রোগ দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার :—

(ক) সন্তান যাতে পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ প্রযত্ন পায় সে দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) সন্তান যাতে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ পথে অহেতুক বাধা ও সমালোচনার সম্মুখীন না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(গ) মলমূত্র ত্যাগ বিষয়ে মা সন্তানদের যথাযথরূপে শিক্ষিত করে তুলবেন।

(ঘ) গৃহ পরিবেশে নিয়মশৃঙ্খলা সকলে মেনে চলবে।

(ঙ) ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি উদ্রেককারী পরিবেশ থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে।

(চ) বাবা মা সম্বন্ধে যদি অবচেতন মানসে ভয় ঘৃণা সম্পৃক্ত 'জটের' সৃষ্টি হয় তাহলে তা দূর করার জন্য মনঃসমীক্ষকের প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে হবে, দরকার হলে পরিবেশান্তরও করতে হতে পারে।

সহজে আকুল বা ভীত হওয়া (Nervousness) :—

একটি ভীরু ছেলের মধ্যে নিম্নলিখিত সংলক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়—

(ক) প্রাক্ষোভিক অস্থিরতা (Emotional instability)

(খ) সবকিছু অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করা।

(গ) অবিন্যস্ত ও এলোমেলো চলাফেরা।

(ঘ) অনিদ্রা ; দুঃস্বপ্নের জন্য প্রায়ই ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া ও এর জন্য হজমের গণ্ডোগোল হওয়া।

(ঙ) সামান্য গণ্ডোগোলে, জন সমাগমে, তীক্ষ্ণ আলোতে ভীত চকিত হয়ে পড়া।

(চ) অমনোযোগিতা।

(ছ) এরা স্থির হয়ে বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না,

শান্ত স্থির পরিবেশেও অস্থিরতা দেখায়। নিয়ত দাঁতে নখ কাটা, হাত ঘসা, আঙুল চোষা প্রভৃতি নানা প্রকারের অঙ্গ-ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

কারণ[১] :—

(ক) পিতামাতা কর্তৃক সন্তানের মৌলিক চাহিদা বিষয়ে উদাসীন থাকা এবং এর জন্য সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও দুশ্চিন্তা।

(খ) পিতামাতার দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা ; তাঁদের সবকিছু আঁকড়ে রাখার চেষ্টা, সন্তানদের সব বিষয়ে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখার ইচ্ছা এবং সামান্য বিষয়ে অতি সাবধানতা বা অতি যত্নবান হওয়া—পিতামাতার এরূপ মনোভঙ্গী ও আচরণ সন্তানের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ব্যাহত করে, তাদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ নিয়ে আসে, এরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে—এরা অতি ভীরু; অতি লাজুক, অতি বংশবদ অকেজো ছেলেতে পর্যবসিত হয়।

(গ) বংশধারা প্রাপ্ত শারীরিক গঠন—ক্ষীণ ও দুর্বল দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মালে অনেক সময় ভীরুতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তা ও ভয়াকুল হওয়ার কারণ মানসিক।

(ঘ) মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভৌতিক পরিবেশের প্রভাব—

(১) অতি শৈশবে অপ্রতুল রৌদ্র ও মুক্ত বায়ু পরবর্তীকালে নানারূপ দৈহিক বিকৃতি নিয়ে আসে—এ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যেরও হানি হয়।

(২) সুষম খাদ্য ও প্রশান্ত প্রলম্বিত নিদ্রার অভাব।

(৩) কর্মকাল ও কর্মবিরতির মধ্যে সমতার অভাব।

(৪) চোখ, কান প্রভৃতি অঙ্গের কোন অসুস্থতা।

(৫) নালীবিহীন গ্রন্থির বিশেষ করে থাইরোয়েড্ গ্রন্থির অপ্রতুল কার্যকারিতা।

(৬) ভীরু প্রকৃতির পিতামাতাকে অনুকরণ করে অনেক সময় ছেলে-মেয়েরা ভীরু প্রকৃতির হয়ে যায়—দুশ্চিন্তাপরায়ণ ভীরু প্রকৃতির পিতামাতার

---

[১] It is a non-adjustive reaction to unsolved personal conflicts. The conflicts of a nervous person arouse persistent visceral tensions. Lacking any definite outlets, either in direct action or in defense mechanisms he continues to be stirred up by his emotional tension and hence to make diffused responses.

Shaffer L. F., Shoben, E, J. The psychology of Adjustment. pp. 301.

উপস্থিতি অনুচ্চারিতভাবে সন্তানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সন্তানদেরও ভীরু করে ফেলতে পারে।

(চ) পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ, পিতা মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়,—অত্যন্ত দুশ্চিন্তাপরায়ণ মা, মাত্রাধিক কর্তৃত্বাভিলাষী পিতামাতা, পিতামাতার বিবাহিত জীবনে অসঙ্গতি ও তজ্জনিত পরিবারে অশান্তি ও অস্থিরতা, প্রভৃতি অবস্থা সন্তানের প্রাক্ক্ষোভিক জীবনে নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে—এ অবস্থায় লালিত হয়ে ছেলেমেয়েরা সবকাজে ব্যর্থতার ভয়ে, অতিমাত্রিক বিবেকের কড়া নির্দেশনায় সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে—খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত অনীহা দেখা দেয়।

প্রতিকার :—

(ক) পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক সুস্থ ও মধুর হওয়া সমীচীন।

(খ) পারিবারিক পরিবেশ এমন শান্ত ও সুবিন্যস্ত হবে যে, কোন সময়েই অহেতুক ভয় উদ্রেককারী কোন ঘটনা কোন স্থান থেকে ঘটবে না।

(গ) জন্মগত দৈহিক গঠনের জন্য যদি স্নায়বিক অবসাদ দেখা দেয়, তাহলে গোড়া থেকেই দৈহিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সবিশেষ সচেষ্ট হতে হবে এবং এদেরকে উৎসাহ ও ভরসা দিয়ে সর্বদা চাঙ্গা রাখতে হবে—এদের ক্ষেত্রে পারিবেশিক প্রভাবকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কোন প্রকারে যাতে প্রতিকূল প্রভাব পরিবেশে না আসে সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঘ) যে সব পরিবারে দুশ্চিন্তাজর্জ্জর ভয়াকুল পিতামাতা আছে, তাদের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়ে প্রতিপালিত হলে, স্বভাবতঃ ছেলেমেয়েরাও দুশ্চিন্তা-জর্জ্জর ভয়াকুল হয়ে ওঠে—সেইজন্য এ সব ছেলেমেয়েকে সুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য ভিন্ন সুস্থ পরিবেশে (Home) স্থানান্তর করা সমীচীন।

দিবাস্বপ্নচারিতা (Day Dreaming) :—

দিবাস্বপ্নচারিতা মাত্রই অপসঙ্গতির লক্ষণ নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছু না কিছু স্বপ্নচারিতা আছে, বাস্তব যা দিতে পারে না তা স্বপ্নে পেয়ে কে না ক্ষণিকের তরেও জীবনের না পাওয়াকে ভরে তুলতে চায়! কিন্তু কেউ যদি

কেবল স্বপনচারীই হয়—বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে কেবল স্বপ্নাবিষ্ট হয়েই যদি কেউ কালাতিপাত করে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই অপসঙ্গতির একটা সংলক্ষণ। বাস্তবের সাথে সার্থক সঙ্গতি সাধনে অপারগ হলেই কোন ব্যক্তি স্বপ্ন-জনিত আশ্রয় নেয়।

অধিক দিবাস্বপ্নচারিতা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। ব্যক্তি নিজেকে ধীরে ধীরে সমস্ত কর্মপ্রয়াস থেকে গুটিয়ে নেয়; সব কাজেই একটা অমনোযোগিতা দেখা দেয়; সামান্য কারণে বিব্রত বোধ করে। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা ও হতাশা যত প্রবল হয়, তত স্বপ্নচারিতা প্রকট হতে থাকে। স্বপ্নচারিতায় ব্যক্তি যত মশগুল হয়ে থাকে, তত তার মধ্যে অপসঙ্গতির সংলক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি এরূপ স্বপ্নচারিতা দেখা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এর সম্বন্ধে শিক্ষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, কেননা কেবল অত্যধিক স্বপ্নচারিতা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে ব্যক্তির মধ্যে গভীর কোন মানসিক বিকৃতি বাসা বাঁধছে।

কারণ ঃ—

(ক) মৌলিক চাহিদার অপূরণ।

(খ) পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চনা।

(গ) প্রত্যাখ্যান—বিশেষ করে পরিবারে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা।

(ঘ) নবযুবকালে প্রেম ভালবাসা বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা।

(ঙ) প্রতিযোগিতামূলক কাজে বার বার পরাজিত হওয়া।

(চ) অতি উচ্চাভিলাষী পিতামাতা যদি ছেলের মেধা ও রুচি প্রবণতার দিকে কোন লক্ষ্য না রেখে, ছেলেকে তাদের মত করে জোর করে গড়ে তুলতে চায়, তাহলে ছেলের মধ্যে স্বভাবতঃ যে ব্যর্থতা ও হতাশা আসে, তাতে সে আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে সব কিছু থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স্বপ্নচারিতায় ভর করে।

প্রতিকার ঃ—

(ক) মৌলিক চাহিদায় পরিপূরণ।

(খ) গৃহে ও বিদ্যালয়ে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হয় সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিদান।

(গ) গৃহে ও বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের অস্তিত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এরূপ একটা বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়—সেরূপ ভাবে গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশকে নির্মাণ করতে হবে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী আপন শক্তি-সামর্থ্য ও রুচির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে।

(ঙ) কল্পনা ও স্বপ্নচারিতা এক নয়। গঠনাত্মক চিন্তা ও কল্পনা, মানস-সীমার ব্যাপ্তিতে সাহায্য করে। শিশুর এরূপ কল্পনা শক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এর জন্য সৃজনধর্মী কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে যেতে হবে যাতে শিশু আপন ছন্দে নূতন কিছু সৃষ্টি করে আনন্দ লাভ করে।

(চ) খেলাধুলা ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন যৌথ কর্ম-কাণ্ডে যাতে শিক্ষার্থী যোগদান করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আত্ম-সঙ্কোচন (Withdrawal) :—

দিবাস্বপ্নচারিতা রূপ সংলক্ষণ প্রায়শঃই আত্ম-সঙ্কোচনের একটা প্রকাশ। অপসঙ্গতির এটা একটা অগোচর পদ্ধতি—পরিবেশের সাথে সঙ্গতি সাধনের অক্ষমতা নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে, এ সব লক্ষণ যত স্পষ্ট হয় তত ব্যক্তির অপসঙ্গতির প্রকার, এর কারণ নির্ণয় সহজ হয়, ও ব্যক্তিত্বের সমস্যামুক্তির (Problem Personality) সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আত্ম-সঙ্কোচন রূপ সংলক্ষণ যেখানে থাকে, সেখানে ভিতরে ভিতরে ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক ক্ষতিকারক সমস্যা থাকলেও বাইরে থেকে তা সচরাচর ধরা যায় না।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে যদি অমনোযোগিতা, অবাধ্যতা, মিথ্যাকথন, ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ প্রভৃতি সংকোচনপূর্ণ আচরণ সহজেই শিক্ষকদের দৃষ্টি পথে আসে; কেননা এ সকল আচরণ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এ সকল সমস্যামূলক আচরণ থেকেও আত্ম-সঙ্কোচনমূলক আচরণ অধিক ক্ষতিকারক। গোচর সংলক্ষণপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়ে বিকৃত উপায়ে হলেও মানসিক দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণাজর্জ্জরিত যে শক্তি তার প্রকাশ ঘটে, কিন্তু আত্ম-সঙ্কোচনমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত যে আবেগ জর্জ্জরতা তার মুক্তির কোন অবকাশ থাকে না। ফলে এ থেকে ব্যক্তিত্বের ভাঙ্গন আরও ঘনীভূত হয় ও হঠাৎ একদিন সমূহ বিপদ নিয়ে এর বিস্ফোরণ

ঘটে। তাছাড়া গোচর সংলক্ষণমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তবুও বা পরিবেশের সাথে কোন প্রকারে সঙ্গতি বিধানের প্রয়াস করে, ব্যর্থতা ও হতাশার বিরুদ্ধে যথার্থ না হলেও, সংগ্রাম করে। এরূপ অবস্থায় পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট থেকে যদি বন্ধুত্ব ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ শিশু পায় ও যথাযথ নির্দেশনা পায়, তা হলে বিপথগামী শিশু ভাল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে শিশু নিজেকে কেবল সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিতে চায় তার মধ্যে একটা পরাজিতের মনোভাব কাজ করে, তার মধ্যে ভাল বা মন্দ হওয়ার কোন প্রয়াসই থাকে না—পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে সেটা সার্থক ভাবেই হোক বা বিকৃত ভাবেই হোক, চলার কোন প্রকার চেষ্টাই থাকে না।

কারণ :—

(ক) পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান বা শিশু যদি পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত বোধ করে।

(খ) নিষ্ঠুর আচরণ—প্রতিপদে ছেলেমেয়েদের চলা ফেরায় বাধা দেওয়া ও সমালোচনা।

(গ) বিমাতার নির্দয় আচরণ।

(ঘ) দৈহিক কোন খুঁতের জন্য হীনমন্যতা বোধ।

প্রতিকার :—

স্বপ্নচারিতা নিরোধে যে সব প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

———
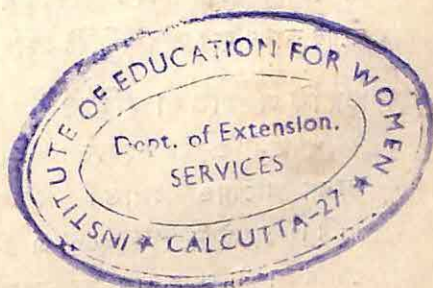
ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও ক্রোধ-এর প্রতিকার

(How to deal with fear and anger in children)

শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক ভয় বা ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায় ঝগড়াবিবাদ, বিছানায় প্রস্রাব করা, নখকামড়ানো, রাত্রে বিভীষিকা দেখা, ঘুমের ঘোরে পথ চলা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি সংলক্ষণ মূলক আচরণের মধ্য দিয়ে। ভয় দুপ্রকারের হতে পারে—একটা সম্পূর্ণ আত্মগত (subjective) অপরটি বস্তুগত (objective)। বস্তুগত ভয়ের কারণ হিসাবে সর্বদাই কোন না কোন গোচর কারণ বর্তমান থাকে। শিশুরা স্বভাবতঃই গভীর দূরত্ব, অন্ধকার বা সুউচ্চ পর্বতা চূড়া দেখে ভয় পায়। এরূপ ভয়ের কারণ এই যে, এইসব কারণ বা অবস্থা কোন না কোনরূপে শিশুর অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে। সকল মানব শিশুর মধ্যেই এরূপ অবস্থায় আতঙ্কের উদ্রেক হয়—এরূপ অবস্থা অস্বাভাবিক কোন লক্ষণ নয়। এরূপ ভয়ের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরূপ ভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে, কেননা এরূপ ভয় ব্যক্তিকে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করে। কিন্তু আত্মগত ভয়ের (subjective fear) বস্তুগত কোন কারণ থাকে না। ব্যক্তি যা থেকে ভয় পায়, তা থেকে স্বাভাবিকভাবে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কিন্তু আপন মানসিক জটিলতা ও বিকৃতির জন্য ব্যক্তি অকারণে ভয় পেয়ে থাকে, যে কোন জিনিষ দেখে বা যে কোন অবস্থা থেকে যে কোন সময়ে সে ভয় পেয়ে থাকে। এ ভয় ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তাপরায়ণতা রোগের উদ্রেক করতে পারে।

এরূপ আত্মগত ভয়ের কারণ সাধারণতঃ ব্যক্তির শৈশবকালীন কোন অবস্থা বা ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে, বিশেষ একটি কোন ঘটনাই যে এরূপ ভয়ের কারণ হবে তার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ নেই।

ভয় কি সহজাত না অর্জ্জিত ?

পলায়নী প্রবৃত্তি সহজাত। এর সঙ্গেই ভয়রূপ আবেগ জড়িত। কাজেই ভয়রূপ আবেগও সহজাত। কিন্তু কোন্ বস্তু দেখে ভয় পাব সেটা আমরা শিখি। ওয়াট্সন্ (Watson) এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত আক্রমণধর্মী, যারা আত্মবিশ্বাসহীনতায় সর্বদা ভুগছে

যারা অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কোন নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যারা ভয় পায়। তাদের প্রত্যেকেরই প্রায় শৈশবকালীন কোন বদ্ধমূল ভয় থাকে—এ ভয়ই পরবর্তী কালে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ওয়াটসন্ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে জন্মকালে শিশুদের দুটি অবস্থা থেকে ভয়ের উদ্রেক হয়। এদুটি অবস্থা হল (ক) হঠাৎ জোরে কোন শব্দ (খ) আশ্রয়চ্যুতি। সর্পভয়, অন্ধকারকে ভয়, অগ্নিভয় প্রভৃতি জন্মগত নয় —পরবর্তীকালে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে এরূপ বিষয়ে ভয় পাওয়াটা শিশু শেখে।

ভয়ের সংবন্ধন ঃ—

ভয়কে সংবন্ধন (Conditioning) বা অসংবন্ধন (re-conditionig) করা যায়। শিশুর অনেক বস্তু-ভয়ই বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভয়-উদ্রেককারী বস্তুর সাথে পূর্বজীবনে কোন ভীতিকর অবস্থার সন্নিবেশ ঘটেছে। শিশুরা বিদ্যুৎ চমকানো দেখে ভয় পায় না, কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে বজ্রপাতের জন্য যে বিপুল শব্দ হয় তাকে তারা ভয় করে। সেইরকম অধিকাংশ শিশুই অন্ধকারকে ভয় পায় না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে অস্তিত্ববিপন্নকারী কোন অবস্থার যদি উদ্রেক হয় ও সেইরূপ কোন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যদি শিশু অতিক্রম করে, তাহলে পরে সে, অন্ধকার মাত্রেই ভয় পায়।

এ বিষয়ে ওয়াটসন্ (Watson J. B.) একটি শিশুকে খরগোষ ও খরগোষ জাতীয় বস্তুকে ভয় পাওয়ার বিষয়ে সংবন্ধ করেছিলেন। শিশুটি প্রথম খরগোষটির সাথে আপন মনে খেলা করত—এরকম বেশ কিছুদিন চলার পর' সে যেই খরগোষটি নিয়ে খেলা করতে আরম্ভ করত তখনই তার মাথার কাছে একটা প্রচণ্ড জোরে শব্দ করা হতে থাকল। এরকম কিছুদিন চলার পর যে শিশু পূর্বে কেবল প্রচণ্ড শব্দকে ভয় পেত, সে এখন এককালীন খেলার সাথী ও আনন্দের খোরাক খরগোষটিকে দেখে ভয় পেতে আরম্ভ করল। পরে প্রচণ্ড শব্দের আর দরকার হল না, খরগোষটিকে দেখেই বা অবশেষে খরগোষজাতীয় কিছু দেখেই সে ভয় পেতে আরম্ভ করল।

শৈশব কালের সাধারণ ভয় :—

মেরী ছাডুরিক (Mary Chadurik) তার "Difficulties of child Development" বইএ শিশুদের নিম্নলিখিত ভয়ের কথা বলেন :

(ক) একা একা থাকার ভয়
(খ) অন্ধকারের ভয়
(গ) অপরিচিত প্রাণীর ভয়
(ঘ) শহরে কুকুরের ভয়
(ঙ) গ্রামে গরু ও ষাঁড়ের ভয়
(চ) সর্প ভয়
(ছ) জোরে শব্দ
(জ) হঠাৎ কোন জিনিস ফেটে যাওয়ার ভয়
(ঝ) অগ্নি ভয়
(ঞ) জলাশয়, যেখানে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেরূপ জলাশয়ে ভয়।
(ট) বজ্রবিদ্যুৎকে ভয়
(ঠ) ইঁদুরকে ভয়
(ড) কোন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়।
(ঢ) ভূত প্রেতের ভয়।

উপরোক্ত সকল ভয় বিষয়েই কোন প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন—কিছুটা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতানির্ভর। কিন্তু জোরে শব্দ করার জন্য যে ভয় সেটা জন্মগত। জোরে শব্দ, আশ্রয়চ্যুতি প্রভৃতি অবস্থার সাথে যখন অন্যান্য অবস্থার অনুষঙ্গ ঘটে, তখন শেষোক্ত অবস্থা থেকেও ভয়ের উদ্রেক হয়।

ভয় দেখানো :—

শিশুদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ যে তাদের বড়রা নানা বিষয়ে অহেতুক ভয় দেখান। অবিবেচক, ধৈর্য্যহীন ব্যক্তিরাই এ হেন উপায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বশে রাখার চেষ্টা করেন। 'এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়, না ঘুমুলে অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা দৈত্য এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে'—'তুমি এক্ষুনি পড়তে বস, নইলে পুলিস এসে তোমাকে থানায় নিয়ে যাবে'—এমনি নানা প্রকারের ভয় দেখিয়ে শিশুদের কাজ করাবার বা বশে

আনার চেষ্টা করা হয়। কখনও কখনও অন্ধকার ঘরে শাস্তিস্বরূপ তালা দিয়ে আটকে রাখা হয়, আর বাইরে থেকে ছেলেকে শাসানো হয় বাঘ আসছে, সাপ আসছে ইত্যাদি বলে। শিশু বড়দের এসব কথা বিশ্বাস করে ও ভয়ে জর্জ্জরিত হতে থাকে। পরবর্ত্তীকালে সে যখন বিদ্যালয়ে বা অন্যকোন নতুন পরিবেশে যায়, তার সবকিছু সম্বন্ধেই একটা ভয়-ভয় ভাব থাকে।

এ রকম ভয়ের ভাব যদি শিশুর মনে গ্রথিত হয়ে যায়, তাহলে ছেলের মধ্যে একটা নিরাপত্তাহীনতার ভাব দেখা যায়; সারাজীবন তার মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা ও শঙ্কার ভাব কাজ করে। পরবর্ত্তী জীবনের বহু অহেতুক ভয়ের কারণ পিতামাতা ও অভিভাবকদের শৈশবকালীন ভয় দেখানোর মধ্যে নিহিত থাকে। বিছানায় প্রস্রাব করা, অল্প কারণে ভয়, শঙ্কিত দুশ্চিন্তার ভাব, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ শিশুকে ভয় দেখানোর জন্য হতে পারে।

অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে এমন কোন অবস্থার ভয় হওয়া স্বাভাবিক। পারিবেশিক শক্তির সাথে যুঝতে হলে ও তার সাথে যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার কমতি ব্যক্তি অনুভব করলেই, ব্যক্তির মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হয়। এই শক্তি-স্বল্পতা শৈশবে অধিক থাকে—কিন্তু শিশু যখনই এই স্বল্পতা সম্বন্ধে সজাগ হয় তখনই তার মধ্যে ভয় আসে। ভৌতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য যেরূপ ইন্দ্রিয় ও দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, সামাজিক সঙ্গতি রক্ষার জন্য মানসিক বোঝাপড়া প্রয়োজন। এই সঙ্গতি সাধনের অক্ষমতা বিষয়ে যখনই ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবগত হয় তখনই তার মধ্যে ভয় আসে। পূর্বেই বলা হয়েছে এরূপ ভয় বাস্তব কারণের জন্য হতে পারে, আবার কাল্পনিক কারণের জন্যও হতে পারে।

প্রথম দিকে শিশুর ভয় বস্তুগতই থাকে, চার পাঁচ বৎসর বয়স থেকে কাল্পনিক ভয় দেখা যায়। এই কাল্পনিক ভয়ের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তববিবর্জ্জিত কোন মিথ্যা জ্ঞান। দশ বারো বৎসরে, শিশুদের বাস্তব অবস্থা থেকে কাল্পনিক অবস্থা বা বস্তুই বেশী করে ভয়ের উদ্রেক করে। দশমাথা বিশিষ্ট সাপ, কালো কুচকুচে পোনেরোটা হাতবিশিষ্ট একটা রাক্ষস এই সব কাল্পনিক অদ্ভুত বস্তু থেকে এই বয়সে শিশুদের ভয় হয়। এ ছাড়া বজ্র বিদ্যুৎ, সিনেমা ও গল্পে জানা কোন ভয়ের চরিত্র থেকেও এ বয়সের শিশুদের মধ্যে ভয় আসতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে ভয়ের কারন কেবল মাত্র ভৌতিক পরিবেশে থাকে না, সামাজিক পরিবেশের উদ্দীপকও ভয় উৎপাদনে সমান ভাবে কাজ করে—নিন্দা, সমালোচনা, সকলের কাছে হেয় হয়ে যেতে পারে এমন কোন কাজ তার ভয়ের কারণ হয়।

"পূর্বকালে মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা অস্বাভাবিক ভয়ের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক ক্লেশের নজির দিতেন। অনেকে বিশ্বাস করতেন রোগে শোকে ক্লিষ্ট মনে অবসাদবশতঃ ছেলেবেলার শাসনজনিত ভয় আবার ভেসে ওঠে। কারও বিশ্বাস, নানা প্রকার শারীরিক রোগ থেকে উৎকণ্ঠা রোগের সৃষ্টি হয়। একথা অবশ্য সত্য, অনেক সময় উৎকণ্ঠা রোগীর দেহে রোগও থাকে প্রচুর, কিন্তু তাই বলে শারীরিক রোগের জন্য উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় এ কথা বলা চলে না।

উৎকণ্ঠা রোগীর দৈহিক চিহ্নকে Conversion symptom বলে, অর্থাৎ মনের ভয় এইরূপ ক্ষেত্রে শারীরিক চিহ্নে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন উৎকণ্ঠার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দাম প্রচেষ্টা।

নবজাত শিশুর বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে প্রবল উদ্দীপনা সহ্য করতে হয়, তার তুল্য কোন অভিজ্ঞতা মাতৃজঠরে থাকা কালে সে লাভ করে না। সর্বপ্রথম তাকে শ্বাস নিতে হয় এবং মাতৃদেহ থেকে ছিন্ন হওয়ার ফলে তার হৃৎপিণ্ডের কম্পন নূতন ধমনীর মধ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করার জন্য দ্রুত কাজ করাতে হয়। তা ছাড়া বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে তার চর্ম সর্বপ্রথম শৈত্য ও উষ্ণতার তারতম্য অনুভব করে। শিশুর এই অভিজ্ঞতাগুলি ভয়ের সহিত জড়িত হয়ে যায়, এজন্য ভয়ের সময় বুক ধুক্‌ধুক্ করে, শ্বাসকষ্ট হয় এবং চর্মে কম্পন ও শৈত্যকম্পন উষ্ণতা অনুভূত হয়।" *

শৈশবকালে নানা প্রকারের ভয় থাকে। জন্মক্ষণ থেকেই ভয় আসে। কি[illegible] ভয় নানা ভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অন্ধকারকে ভয় :—

শিশুর অন্ধকারকে ভয় পাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। (ক) রাত্রির অন্ধকারে অনেক চুরি খুন অপরাধ ঘটেছে, অনেক বীভৎসতা ঘটেছে এরকম গল্প বড়দের কাছ থেকে সে হয়ত শুনেছে। (খ) তা ছাড়া অন্ধকার

* ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী : নির্জ্ঞান মন।

সম্বন্ধে শিশুর সুপ্ত ভয় অনেকটা বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত। রাত্রির অন্ধকারে আলোক বর্ত্তিকা জ্বালবার যখন পথ জানত না তখন সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অন্ধকারে কত আপদ-বিপদই না মানুষের উপর দিয়ে গিয়েছে—সেই অন্ধকারের মধ্যে অনাগত দিনের কত বিপদ-গহ্বরই না লুকায়িত থাকত—মানুষ তা আলোর অভাবে জানাতেও পারত না। সেই অন্ধকারের ভীতি আজও যেন মানুষের সংস্কারের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। সহস্র বৎসর রাত্রিতে অন্ধকারে কাটাবার পর, মানুষ প্রথম রাত্রির অন্ধকারে আলো জ্বালাতে শিখেছিল। রাত্রির অন্ধকার সেইজন্যই যেন শিশুর মানস-ভূমিতে এখনও বিপদ-সঙ্কেতের নিশানা। অনেক মনোবিদের মতে আমাদের অবচেতন মানসে রাত্রির অন্ধকার এখনও ভয়ের বিষয়।

(গ) কোন শিশু যদি রাত্রিতে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পায়—তার মধ্যে ভয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো প্রকট হয়ে ওঠে—যেমন ঘেমে যাওয়া, বুক কাঁপা, গলা শুকিয়ে আসা প্রভৃতি, তা হলেও অন্ধকার ঘরে সে একা ঘুমুতে যেতে ভয় পাবে।

(ঘ) যদি কোন শিশুর শারীরিক অসুস্থতা যেমন অজীর্ণতা, টন্‌সিলের রোগ প্রভৃতি থাকে, তাহলে তার নিদ্রা ব্যাহত হয় এবং নানাপ্রকার দুঃস্বপ্ন সে দেখে থাকে। অবশ্য কেবল শারীরিক অসুস্থতার জন্যই যে এরূপ স্বপ্ন শিশু দেখে থাকে তা নয়, মানসিক কারণও এর সঙ্গে কাজ করে।

(ঙ) ঘুমুতে যাওয়ার আগে যদি শিশুদের ভয়ের গল্প শুনানো হয়, যদি তাদের বন্য জন্তু জানোয়ারের, চুরি ডাকাতি খুন খারাপির গল্প বলা হয়, তা হলেও তাদের মধ্যে অন্ধকার সম্বন্ধে একটা ভয়-ভয় ভাব তৈরী হয়।

(চ) আর একটা কারণে শিশুদের অন্ধকার সম্বন্ধে ভয়ের উদ্রেক হয়। কোন শিশু যদি তার পিতামাতার সঙ্গে একই শয়ন কক্ষে শয়ন করে, এবং পিতামাতার ঘনিষ্ঠ শয়ন-সম্বন্ধ যদি রাত্রির অন্ধকারে প্রত্যক্ষ করে বা অনুমানও করে তাহলে শিশুর মধ্যে পিতামাতা সম্বন্ধে একদিকে যেমন বিতৃষ্ণা ও ভয়ের উদ্রেক হয়, অন্যদিকে অন্ধকারকেও তারা ভয় পায়। শৈশবকালীন এরূপ অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে নানা প্রকার মানসিক রোগের উদ্রেক ঘটাতে পারে এবং বয়ঃপ্রাপ্তিকালে যৌন-জীবন সম্বন্ধে একটা অসুস্থ প্রতিন্যাসের সৃষ্টি হয়।

অন্ধকারের ভয় দূর করার উপায়ঃ—

(ক) কোন বস্তু বা অবস্থা থেকে শিশুর মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হয়েছে সেটা খুঁজে দেখতে হবে এবং সে অবস্থা শিশুর জীবনাভিজ্ঞতায় যাতে ফিরে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস করতে হবে।

(খ) শিশুকে নিয়ে অন্ধকার ঘরে কিংবা বাইরে অন্ধকারে যেতে হবে। 'ভয় পেয়ো না'—এ ধরণের কথা যতটা সম্ভব কম বলতে হবে। ভয়ের কথার অবতারণা না করাই শ্রেয়ঃ।

(গ) রাত্রির স্নিগ্ধতা, রাত্রির বিশ্রাম অবকাশ, রাত্রির ফুলের সৌরভ, রাত্রির চন্দ্রালোক, নক্ষত্রক্ষচিত নিশীথ অম্বর, এ সব বিষয়ে শিশুকে সচেতন করে তোলা। রাত্রির অন্ধকারকে শিশু ভয় না পেয়ে যেন তার সৌন্দর্য ও শান্তি-সুধা গ্রহণ করায় সক্ষম হয়ে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঘ) শিশু যদি তার শয়ন ঘরে কোন মৃদু আলো পেলে খুশী হয় তাহলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আলো দেওয়ার সাথে ভয় দূর করার যে কোন সম্পর্ক আছে তা যেন শিশু কোন প্রকারে বুঝতে না পারে।

(ঙ) শিশু যদি প্রত্যাশা করে যে শয়ন পূর্বে তার বাবা বা মা কেউ তার শয্যাপাশে কিছুক্ষণের জন্য থাকুক তাহলে সে ব্যবস্থা যেন কয়েক দিনের জন্য করা হয়।

নিরাপত্তার অভাব থেকে ভয়ঃ—

(১) নিরাপত্তা বোধের অভাব শিশুর মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা থেকে আসতে পারে। দৈহিক শক্তির স্বল্পতাই হোক আর মানসিক শক্তির স্বল্পতাই হোক, শক্তি স্বল্পতার জন্য যদি শিশু পরিবারের অন্যান্য সমবয়সী শিশু ও খেলার সহচরদের সাথে পড়াশুনা বা খেলাধূলায় পেরে না ওঠে, তাহলে তার মধ্যে একটা হীনমন্যতার ভাব আসে। একদল শিশুর মধ্যে মানসিক গঠনের ভিন্নতার জন্য, এ অবস্থায় অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়, এ দুশ্চিন্তার বশে এরা এদের শক্তি সামর্থ্যের মাত্রার বাইরে কাজ করতে আরম্ভ করে ও পরিণামে একটা অত্যন্ত অস্থির সভয় ক্লান্তি এদের মধ্যে দেখা দেয়। কোন কোন শিশুকে ব্যর্থতার ভয় এমনভাবে পেয়ে বসে যে সে আর কোন প্রয়াসই করতে পারে না। কেউ বা আবার নিজের শক্তি সামর্থ্য দিয়ে যখন প্রতিযোগিতায় অন্যকে পরাভূত করতে

পারবে না বুঝতে পারে, তখন ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে বাজী মাৎ করার চেষ্টা করে।

(২) অত্যধিক সমালোচনা, কারণে অকারণে উপহাস, সর্বদা শিশুর চলা ফেরায় কেবল দোষ ত্রুটি ধরার চেষ্টা, এ সকল অবস্থা শিশুকে প্রায়শঃই মিথ্যা কথা বলতে, অবাধ্য হওয়া, ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়া, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া, দাতে নখ খোটা প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে আসে। এ সকল উপসর্গের মূল নিরাপত্তাহীনতা জনিত ভয়।

(৩) বাবা মা যদি নিরত শাস্তিস্বরূপ সন্তানকে পরিত্যাগ করার ভয় দেখায় তাহলে সন্তানের নিরাপত্তার অভাববোধ প্রকট হয়ে ওঠে এবং এ থেকে অস্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক হয়।

(৪) কঠোর ও ঘন ঘন শাস্তি শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে আসে এ থেকেও শিশুর মধ্যে অস্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক হয়।

(৫) উপস্থচ্ছেদ গূঢ়ৈষা (Castration Complex)

যৌন মানস শক্তি-প্রবাহ (Psycho-sexual Energy or Libido) ও বিকাশের কতকগুলি পর্য্যায় আছে। ফ্রএড্ (Freud) এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন। ব্যক্তিত্বগঠনের সাথে যৌন মানস শক্তি বিকাশের একটা বিশেষ সংযোগ আছে। ফ্রএডের মতে অত্যধিক ভয়, নানাপ্রকার মানস-বিকৃতি ও জটিলতা যৌন-মানস শক্তির বিকাশ-বিকৃতি থেকে উদ্ভুত হয়। যৌন-মানস শক্তির বিভিন্ন বিকাশ পর্য্যায়ের মধ্যে ইডিপস্ পর্য্যায় অস্বাভাবিক ভয় সৃষ্টির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

যখন শিশুর যৌন-মানস শক্তি-প্রবাহ আত্ম-কাম পর্যায় অতিক্রম করে বাইরের কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসতে আরম্ভ করে, তখন তার কাছে তার মা'ই একান্ত কাছে থাকে—মাকে সে একান্তভাবে আপনার করে ভালবাসতে চায়—পেতে চায়। মা'কে সে তখন ভালবাসার জন হিসেবে চয়ন করে। মা-ই হ'ল তার কাছে ভালবাসার প্রথম চয়ণ। শিশু মা'র উপর তার সম্পূর্ণ আধিপত্য রাখতে চায়—মা'ও তাকে, কেবল তাকেই ভালবাসুক এরূপ একান্তভাবে চায়। কিন্তু সৈ দেখে যে মা তার অধিকারে নেই—মা অপর একজনের অধিকারে। শিশুর বয়স এ পর্য্যায়ে যদিও মাত্র ছ'বছরের তবু অগোচরে তার মনে অনুরণিত হয় যে মা বাবার অধিকারে আছেন।

ফ্রএডের মতে মা'য়ের প্রতি শিশুর যে ভালবাসা তার মধ্যে প্রছন্ন অথচ তীক্ষ্ণ যৌনাকাঙ্ক্ষা কাজ করে, মাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার ব্যাপারে পিতাকে বাধাস্বরূপ মনে করে, পিতাকে ঘৃণা করে, এমন কি তাকে হত্যা করে দূরে ঠেলে দিতেও যেন তার কুণ্ঠা থাকে না। এইসব ইচ্ছা অনিচ্ছা শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। শিশুর এই সব ইচ্ছার কথা তার মনের গভীরে অর্থাৎ নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়। যৌন-মানসশক্তির এরূপ বিকাশ স্ফূর্তিকে ইডিপস্ (Oedipus) পর্য্যায় বলা হয়। এ সংক্রান্ত যে মানস জটের উদ্ভব হয় তাকেই বলা হয় ইডিপস্ গূঢ়ৈষা (Oedipus complex)।

বয়ঃপ্রাপ্তিকালে এ সকল ইচ্ছার মুখ আর দেখা যায় না, দেখলেও চেনা যায় না, শৈশবকালীন এ সকল ইচ্ছা-অভিজ্ঞতার স্মৃতি অবদমিত (repressed) হয়। শিশুদের মধ্যে ইডিপস্ জটের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

সমাজে অজাচার (incest) কঠোর শাস্তির বিষয়। শাস্তির অবতারণা যখন আছে তখন এটা মনে করা যেতে পারে যে এরূপ ইচ্ছাও মানব-মনে আছে। অজাচার ইচ্ছার অস্তিত্ব যদি মানব মনে একেবারে নাই থাকত তাহলে শাস্তির কথা আসত না।

শিশু বাবাকে সরিয়ে দিয়ে মাকে ভালবাসতে চায়, পেতে চায়। বাবা তার একান্ত করে পাওয়া মা'র উপর হাত চাপড়াতে আসে বলে, বাবাকে শিশু ঘৃণা করে। এই অধিকারের লড়াইএ শিশু যে বাবাকে ঘৃণা করে এর জন্য তার বাবা তাকে শাস্তি দিতে পারে। এ ভয় শিশুর মনে কাজ করে —শাস্তি হিসাবে বাবা তার উপস্থচ্ছেদ (castration) করতে পারেন। এ আশঙ্কা তাকে ভয় জর্জ্জর করে তোলে। এ ভয় অনেকের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকরূপে প্রকট হয়ে ওঠে। শিশুর জন্মাবার পরই শ্বাস প্রশ্বাসের যে কষ্ট হয়, তা থেকে উৎকণ্ঠার জন্ম হয়। শিশুকে মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত করার সময় এ উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায় এবং ইডিপস্ পর্য্যায়ে উপস্থচ্ছেদ ভয়ের সময় এ উৎকণ্ঠা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ ভয় পরবর্তীকালে যে কোন নূতন সমস্যা ও অবস্থার সম্মুখীন হওয়ায় প্রক্ষিপ্ত হতে পারে। castration complex বা উপস্থচ্ছেদ গূঢ়ৈষার ফলে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্বন্ধে ভয়, সংস্থার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভয়, সামগ্রিকভাবে গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয়কে ভয় প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

(৬) পিতামাতার অত্যধিক দুশ্চিন্তা:

সন্তান সম্পর্কে অত্যধিক দুশ্চিন্তা সন্তানদেরও অত্যধিক দুশ্চিন্তাপরায়ণ ও ভয়াকুল করে তোলে। সন্তানসম্পর্কে অস্বাভাবিক ভয়াকুলতা, সামান্য কারণে সন্তান সম্পর্কে হৈ চৈ করা, শিশুর স্পর্শকাতর মনে উত্তেজনা ও আন্দোলনের সৃষ্টি করে। সব বিষয়ের মধ্যেই একটা অনিশ্চয়তা ও বিপদের ছায়া এ হেন শিশুরা দেখতে পায়।

অমূলক ভয় দূর করার উপায় :—

(ক) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভয়ের উদ্রেক শিশুর মধ্যে ঘটতে পারে এমন অবস্থার অবতারণা যাতে কোন প্রকারে না ঘটে সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি কোন বিষয়ে শিশুর মধ্যে ভয়ের ভাব এসে পড়ে তা হলে কারণ বিশ্লেষণ করে, তা দূর করার সকল প্রকার প্রয়াস করতে হবে।

(খ) শিশুর মধ্যে যাতে লজ্জা বা অহেতুক পাপবোধের স্ফুরণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, লজ্জা বা ভয় দেখিয়ে ভয়ের মূল উৎপাটন করা যায় না, এবং এতে বিপরীত ফল হয়।

(গ) শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে—পিতামাতার সাথে তার সম্পর্ক যাতে শ্রদ্ধাপূর্ণ অথচ খোলামেলা হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বাড়ীতে এমন কোন আলোচনা ও ইঙ্গিত থাকবে না যা অল্পেতেই শিশুকে ভয়াকুল করে তোলে। শিশুর স্বাভাবিক গতিতে যেন নিয়ত বাধা দেওয়া না হয়, অতি শাসন, নির্মমতা বা শিশুর প্রতি উদাসীনতা এর কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়।

(ঘ) হঠাৎ যদি কোন শিশু অন্ধকারে যেতে ভয় পায়, বাড়ীতে বা বাগানে একা যেতে ভয় পায়, তাহলে বুঝতে হবে যে সে তার সঙ্গী-সাথী, বাবা-মা এদের কাছ থেকে ভীতিপ্রদ কোন কাহিনী শুনেছে। শিশুরা প্রায়শঃই বাবা মাকে তাদের ভীতিপ্রদ কাহিনীর কথা বলে মনকে হাল্কা করতে চায়, ভয়ের কারণকে যথার্থভাবে যাচাই করে নিতে চায়—এ সময় বাবা মা যদি যথার্থরূপে সহৃদয় হন, যদি তাঁরা এ সময়ে শিশুকে সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে ভয়ের অমূলকতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেন, জ্ঞান দিতে পারেন, তাহলে শিশুদের অমূলক ভয় বহুল পরিমাণে তিরোহিত হতে পারে।

এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কোন শিশুর মধ্যে যদি ভয় দানা বাঁধে

এবং তা নিত্য সহচর হয়, তা হলে তা শিশুর বিকাশ ও কর্মশক্তিকে পঙ্গু করে ফেলে। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিঘ্নিত করে।

(ঙ) অনেক সময়ে শিশু ভয়ের সঠিক কারণ সম্বন্ধে অনবহিত থাকে, সে ঠিক বুঝতে পারে না, কী কারণে তার মধ্যে সর্বদা ভয়-ভয় ভাব থাকে। এসব ক্ষেত্রে মুক্ত-অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে শিশুকে দিয়ে যদি গভীর মনের কথা বলানো যায়, তাহলে ভয়ের সঠিক কারণটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং এ সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করলে শিশুর ভয় দূর হয়ে যেতে পারে।

(চ) সাপেক্ষ পুনঃ প্রত্যাবর্তক্রিয়ার (Reconditioning) অবতারণা করে শিশুর অমূলক ভয় দূর করা যেতে পারে। আবেগ যে প্রত্যাবর্ত ক্রিয়া সাপেক্ষ, তা ওয়াটান্ (watson) পরীক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পদ্ধতিতে যে অবস্থা শিশুর মধ্যে ভয় আনে, সেই অবস্থাকে তার কাছে যদি সুখদায়ক করে তোলা যায় তাহলে তার ভয় কেটে যায়। কোন ছেলের অঙ্কশাস্ত্রে অনুরাগ আছে, বুৎপত্তি লাভের ক্ষমতাও সাধারণ থেকে অনেক বেশী। কিন্তু তাকে যে শিক্ষক অঙ্ক শেখান, তিনি অত্যন্ত বদরাগী ও অসহিষ্ণু, সামান্য ভুল ত্রুটিতেই ছেলেকে কঠোর শাস্তি দেন, এরূপ কিছুদিন চলার পর দেখা গেল ছেলেটির অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে একটা ভয়ের ভাব এসেছে। সে কোন অঙ্ক বই দেখলে, অঙ্ক বিষয়ের কোন কিছুর অবতারণা ঘটলেই ভয় পেতে থাকে। এখানে তার ভয়ের কারণ অঙ্ক-শিক্ষক। পরে শিক্ষক যদি অত্যন্ত বিবেচনার সাথে, অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে ছেলের সাথে আচরণ করেন, সে শিক্ষক নিজে ছাত্রের সাথে মিলেমিশে অঙ্ক কষেন, একবার না পারলেও বা সামান্য ভুল ত্রুটি করলে বার বার তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন তাহলে এরকম কিছুদিন চলতে থাকলে, ছেলেটির শিক্ষক সম্বন্ধে ভয় ধীরে ধীরে কেটে যায়। অঙ্ক বিষয়ে তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও শক্তি ও ফিরে আসবে—অঙ্ককে সে আর ভয় পাবে না।

(ছ) কোন বিশেষ পরিবেশ যদি ভয়ের কারণ হয় তা হলে পরিবেশান্তর, অর্থাৎ যে পরিবেশে পূর্বের ভয়ের কারণ থাকবে না, এরকম পরিবেশে শিশুকে স্থানান্তর করে কিছুদিন রাখলে, তার ভয়ের সংবন্ধন ঘুচে যেতে পারে। বেশ কিছুদিন নতুন পরিবেশে থেকে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসের অবতারণা হলে পুরানো অবস্থা আর ভয়ের সঞ্চার করতে পারে না।

———

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শিশুদের ক্রোধ ও তার নিয়ন্ত্রণ

(How to deal with anger in children)

নবজাতক শিশুর মধ্যে তিনটি প্রধান প্রক্ষোভ দেখা যায়। এ তিনটি প্রক্ষোভ হল (১) রাগ' (২) ভয় (৩) ক্রোধ। শিশুর মৌলিক চাহিদা প্রাপণে যদি কেউ বাধার সৃষ্টি করে তা হলে শিশুর ক্রোধের উদ্রেক হয়। তার স্বস্তি ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় যদি ক্রমাগত বাধা দেওয়া হয়, তার স্বাভাবিক ইচ্ছা যদি অকারণে কেউ কেবল দাবিয়ে দিতে থাকে তা হলে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়—যে ব্যক্তি এরূপ বাধার সৃষ্টি করে বা যে অবস্থার জন্য তার আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি ঘটে সেরূপ ব্যক্তি বা অবস্থার প্রতিও তার ক্রোধের সঞ্চার হয়।

পিতামাতার উদাসীনতা, তাদের অবিবেচনাপূর্ণ ক্রুর আচরণ, কথায় কথায় শাস্তি, তাদের স্বার্থপরতা, অনান্তরিকতা সন্তানের মধ্যে ক্ষোভ ও চাপা ক্রোধের সঞ্চার করে। পিতামাতা যদি মুখে খুব বড় বড় আদর্শের কথা বলে, কিন্তু জীবনাচরণে ঠিক বিপরীতমুখী হয়, তাহলেও শিশুদের পিতামাতা সম্বন্ধে খারাপ ধারণা হয়, তাদের সম্বন্ধে একটা চাপা রাগের উদ্রেক হয়। ওড্ ওয়ার্থ (Wood worth) এর মতে রাগের কারণ হল শিশুর প্রতিকাজে নিয়ত বাধা সৃষ্টি করা ও তাকে বিরক্ত করা।

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যদি স্বাভাবিক না হয়, যদি শিশু নিয়ত রোগে ভোগে, এবং এর জন্য নিদ্রা ব্যবস্থা যদি অবিন্যস্ত হয়, অজীর্ণতায় যদি শিশু ভোগে তার খেলাধূলা বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাফল্য সব কিছু ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকে। তাহলেও তার মধ্যে একদিকে হতাশা অন্যদিকে এর সঙ্গে একটা চাপা ক্রোধের সঞ্চার হয়। অল্পেতেই এরা রেগে যায়—শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ শিশুরা সর্বদাই মানসিক দিক থেকে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে।

কোন্ শিশু অধিক রোগী হবে এবং কোন্ শিশু হবে না শারীরিক গঠন দিয়েও তা অনেক পরিমানে নিয়ন্ত্রিত হয়—নালী-বিহীন গ্রন্থি (Endocrine glands) রস ব্যক্তির মেজাজগত গঠন অনেক পরিমানে নির্দ্ধারিত করে। এ্যাডরিনালিন গ্রন্থির রস নিঃসরণ যাদের মধ্যে বেশী তারা কিছুটা তেজস্বী হয়। মেজাজের দিক থেকে শান্ত ধীরে স্থির প্রকৃতির হবে, না কিছুটা অস্থির ও উত্তেজিত প্রকৃতির হবে তা অনেক পরিমানে এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির রস নিঃসরণের গতি প্রকৃতি থেকে নির্দ্ধারিত হয়ে যায়।

এ ছাড়া, শিশু যদি এমন গৃহ-পরিবেশে প্রতিপালিত হয় যেখানে ঝগড়া বিবাদ, মারধর একটা নিত্যকালের ঘটনা, যেখানে পিতামাতা নিজেরাই অত্যন্ত অসংযত প্রকৃতির ও অল্পেতেই অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে, সেখানে শিশুরাও পিতামাতার দেখাদেখি এরূপ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শিশু যদি গৃহে অত্যন্ত আদর পায় এবং সব কিছুতেই নিজের সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত অমূলক উচ্চমানী ধারণা পিতামাতা করিয়ে দেয়, তাহলে বিদ্যালয়ে সামান্য সমালোচনার সম্মুখীন হলে সে রেগে যায়। পিতামাতা যদি সন্তানের নিকট তার সামর্থ অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করে এবং পিতামাতার অভিপ্রেত মানে শিশু সার্থকতা না দেখাতে পারলে কঠোর সমালোচনা করেন, তা হলে শিশুর মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয়।

পিতামাতার মধ্যে অহরহ কলহ পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে, এরূপ পরিবেশে যদি কোন শিশু বড় হয় তা হলে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়, উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপূর্ণ পরিবেশে আত্ম-সংযম শিক্ষার কোন অবকাশ থাকে না ; ফলে শিশুর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

পিতামাতা যদি সন্তানদের সম্পর্কে সমদৃষ্টি সম্পন্ন না হন, তাঁরা সকল সন্তানকেই যদি সমান স্নেহ-প্রীতি না দেন, তা হলে যাকে অবহেলা করা হচ্ছে, যাকে অন্যান্য ভাইবোনের তুলনায় সর্বদা বিরূপ সমালোচনা করা হচ্ছে তার মধ্যে পিতামাতা সম্বন্ধে ক্রোধের সঞ্চার হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কেউ কথা বললে বা যথাযথ ভালবাসা না পেলে, যেদিকে নবযুবকযুবতীর শক্তি ও রুচি রয়েছে সেদিকে পরিচালিত না হলে বা তা স্ফূরণের কোন সুযোগ না পেলে, তাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়। এ ছাড়া আত্মস্বীকৃতি, পরিবারে ও সমাজে যথাযথ স্থান, এ সকল চাহিদার সম্যক্ পরিতৃপ্তি না ঘটলেও এ বয়সে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

আরও একটু বড় হলে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আপন সামর্থ্য ও অভিলাষের মধ্যে যত ব্যবধান আবিষ্কৃত হতে থাকে, তত হতাশা ও তার সঙ্গে ক্রোধের উদ্রেক ঘটতে থাকে।

শিশুদের রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিরীক্ষা—

৭ মাস থেকে ৭ বৎসর দশমাস বয়সের পঁয়তাল্লিশটি শিশুর মা, তাদের শিশুদের উষ্মা প্রকাশের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রকার, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের

গুডেনাফের (Goodneough) নির্দেশনায়, পর্যবেক্ষণ করেন ও এর দিনলিপি রক্ষা করেন। তিনভাগের দুভাগ মা'রাই একমাসের কোন কোন ক্ষেত্রে তারও বেশী সময়ের, কেউ কেউ বা চারমাস ধরে এর দিনলিপি রক্ষা করেন। শিশুদের সেই সব সময়েই রাগের অভিব্যক্তি ঘটে যখন তারা একাকী বা সঙ্গী সাথীদের সাথে খেলা করে, যখন বিছানায় শুতে যায়, যখন পোষাক পরিচ্ছদ পরে বা ছাড়ে, খাবার সময় এবং যখন একেবারে কিছু করে না।

শিশু যখন শয্যায় থাকে, শিশু যখন স্নান করে কিংবা বিছানায় যায় শিশু যখন তার সঙ্গীসাথীদের সাথে খেলা করে, যখন পোষাক পরিচ্ছদ পরে এবং যখন তার দাঁত মেজে দেওয়া হয় বা চুল আচড়ানো হয়, এ সময়ে রাগ করলে তার প্রকাশকাল তিন মিনিটেরও কম থাকে।

ব্রিজ (Bridges) শিশুদের মধ্যে ক্রোধের কারণ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, শিশুদের গতিপথ অবরুদ্ধ হলে ঘুমুতে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে, হাতমুখ ধোওয়া, স্নান করার জন্য, বিশেষ কোন খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে, চুল পরিপাটি করা, দাঁত মাজা, নির্দিষ্ট দিন-তালিকার কর্মসূচীতে হঠাৎ পরিবর্তন হওয়া, শিশুর কাঙ্ক্ষিত কোন ক্রিয়াকলাপে বাধা দেওয়া—এই সব কারণে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়। শিশু কোন কাজে যখন অযাচিতভাবে কারও কাছ থেকে বিশেষ করে পিতামাতার কাছ থেকে কোন সাহায্য পায় বা কোন কিছু করতে গিয়ে ব্যর্থতা, আপন ইচ্ছার কথা আপনজনের কাছে বলতে না পারে, অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, খেলার সাথীদের সাথে মতবিরোধ হয় কখনও, শারীরিক অস্থুস্থতায় ভোগে, তখন ক্রোধের উদ্রেক হয়ে থাকে।

বাঁধাধরা ছকে চলার বিষয়ে সবচেয়ে ক্রোধের কারণ ঘটে শৈশবাবস্থা থেকে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত। সামাজিক সম্পর্ক, বাঁধাধরা ছকে চলা, শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, এক বৎসরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে চারভাগের তিনভাগ রাগের কারণ। সামাজিক মেলামেশা, কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্ব, বাঁধাধরা ছকে চলা, এক দুই এবং তিন বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে চারভাগের তিনভাগ কারণ। মোটামুটিভাবে চার থেকে সাত বৎসরের শিশুদের মধ্যে, তিন ভাগের দুভাগ রাগের জন্য পূর্বোক্ত কারণগুলির দায়ী।

শিশুদের বয়ঃক্রম অনুসারে রাগের বহিঃপ্রকাশের পার্থক্য ঃ

শিশুদের বয়ঃক্রম অনুসারে গৃহের ও বিদ্যালয়ের আচরণ ও শিক্ষাধারা অনুসারে রাগের প্রকাশের তারতম্য ঘটে। রাগের প্রকাশ-পর্য্যায় রয়েছে।

একেবারে শৈশবে শিশুর রাগ যে ভাবে প্রকাশ পায়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রোধের অভিব্যক্তিই ভিন্নভাবে ও কিঞ্চিৎ সংযতভাবে ঘটতে দেখা যায়। শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের পরিপক্কতার (Maturation) সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুকে ক্রোধ প্রকাশে সংযত হতে শেখানো হয়। তার জীবনের অনুরাগের বস্তুনিচয় ধীরে ধীরে বেড়ে যায়, বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে তার বিভিন্ন বিষয়ে অভিনিবেশের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে নানা বিষয়ে তার আবেগ-সংযোগ ঘটে, ক্রোধের প্রকাশও শৈশবকালীন প্রকাশ-পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতর ও সংস্কৃত হয়। বিভিন্ন দিকে মনোযোগ দেওয়ায় ও তা থেকে রস-গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, একটি বিশেষ কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে বাধার সম্মুখীন হলেও, বিষয়ান্তরে গিয়ে আনন্দ গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় পূর্বে একটি বিষয়ে বাধা পাওয়ায় যেরূপ রাগ হত এখন আর সেরূপ হয় না।

প্রথম দুই/তিন বৎসর শিশুর ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে, হাত-পা ছোঁড়া, কান্নাকাটি, মেঝেতে গড়াগড়ি খাওয়া, খেতে বসে না খাওয়া, কামড়ানো, লাফালাফি করা, কখনও বা মুখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকা, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা প্রভৃতি ক্রিয়া কাজের মধ্য দিয়ে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে, ক্রমে তা মৌখিক নেতিবাচকতা অর্থাৎ কোন নির্দেশকে সরাসরি অমান্য করা, ভীতি প্রদর্শন, মুখে মুখে তর্ক করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হতে থাকে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটলে, ক্রোধের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দৈহিক প্রকাশ ক্রমে মৌখিক প্রকাশে ব্যক্ত হতে থাকে।

গুডেনাফ (Goodenough) বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ক্রোধের প্রকাশেরও তারতম্য ঘটে, তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখেছিলেন এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের শতকরা ৯০ জনের ক্রোধের প্রকাশ সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত ও শক্তির প্রকাশ একেবারে এলোমেলো, এবং চার বৎসর বয়স্ক শিশুদের শতকরা মাত্র ৪০ জনের মধ্যে এরূপ ক্রোধপ্রকাশ ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। মৌখিক ও হাত পা দিয়ে বাধা প্রদান, এক বৎসরের শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু চার ও তার পরবর্তী বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রোধ প্রকাশের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ আচরণই এরূপ হয়ে থাকে। প্রতিশোধ-মূলক ক্রোধ প্রকাশ চার বৎসর ও তদুর্দ্ধ বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমস্ত ক্রোধমূলক আচরণের চার ভাগের এক ভাগ আচরণে প্রকাশ পায়।

রাগ প্রকাশের পৌনঃপুনিকতাও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

এ বিষয়েও গুডেনাফ (Goodenough) পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর নিরীক্ষা মতে, দুই বৎসর বয়সে রাগের প্রকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী ঘটে, অর্থাৎ ১ বৎসর থেকে আরম্ভ করে দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত ঘন ঘন শিশু রাগের প্রকাশ করে থাকে।

বদমেজাজ (Temper Tantrums)—রাগের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রকাশকেই বদ্‌মেজাজ বা Temper Tantrums বলে। দুই থেকে তিন বৎসরের শিশুর মধ্যে এর সর্বাধিক প্রকাশ দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৪/১৫ মাসের শিশুর মধ্যেও এর প্রকাশ দেখা যায়। লাথি মারা, আঁচড়ে দেওয়া, কামড়ানো, যার উপর রাগ তাকে মারধর করা, মেঝেয়-গড়াগড়ি যাওয়া বদমেজাজের বহিঃপ্রকাশ। প্রায়শঃ শিশুর মুখ এ সময়ে রাগে লাল হয়ে যায়। কখনো কখনো সে জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলে, ছুঁড়ে মারে, আসবাবপত্রে ঢিল ছুঁড়তে থাকে।

শিশুরা এ সব বয়সে, বাবা মা'র কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করার জন্য এ সব পথ ধরে থাকে। তারা যদি দেখে এ রকম করলে 'যা চাই তা পাই' হচ্ছে, তা হলে রাগের এ রকম প্রকাশ একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। মা বাবা যদি সন্তান সম্পর্কে অধিক মনোযোগী হন, বা সন্তানকে অত্যধিক আদর দেন তাহলে শিশুর বদমেজাজী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। ক্রোধপ্রকাশে এরূপ-ভাবে ব্যক্তি অভ্যস্ত হলে তার প্রক্ষোভের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৈশবকালীন ক্রোধের প্রকাশ পরিবর্তিত হওয়া সমীচীন। যে অবস্থা তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপণে বাধার সৃষ্টি করে, সে অবস্থা দূর করার জন্য গঠনমূলক কাজে যাতে সে প্রয়াসী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সহিষ্ণুতার শিক্ষা শিশু যেন প্রাপ্ত হয়। পিতামাতার সুস্থ আচরণ, তাঁদের সুস্থ মেজাজ গৃহে নিয়ম শৃঙ্খলা, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ ও আনন্দ উপকরণ, শিশুর আবেগ জীবনকে সুস্থ ও সুঠাম করে তোলে। শিশুর রাগের উদ্দীপকটি অহেতুক কাছে রাখা সমীচীন নয়। শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে, শিশু সৃজনমূলক কাজে নিযুক্ত হয় এমন উদ্দীপক তার সামনে আনতে হবে।

গঠনমূলক প্রতিযোগিতা কর্মে শিশুকে নিয়োগ করা যেতে পারে পড়শুনা, খেলাধুলা প্রভৃতিতে শিশুর মনোযোগ যথার্থভাবে যাতে আকৃষ্ট হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। আত্ম-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে শিশুকে ক্রমাগত গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। এর মধ্য দিয়েই শিশুর সুস্থ আবেগ জীবন গড়ে উঠতে পারে এবং এর মধ্য দিয়েই শিশু রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মনঃসমীক্ষণ ঃ নির্জ্জান মন ঃ মানসিক স্বাস্থ্য

নির্জ্জান মন, নির্জ্জান মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, তার গতি প্রকৃতি, দ্বন্দ্ব, অবদমন, প্রক্ষেপণ অন্যান্য আত্মরক্ষামূলক মানস-প্রক্রিয়া, মনের বিকাশ পর্ব, সংবন্ধন (Fixation), পশ্চাদগমণ (Regression) প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা করতে হলে, ফ্রয়েড্ প্রবর্ত্তিত মনঃসমীক্ষণ ভাবধারা, মনস্তত্ত্বে সে ভাবধারার প্রবর্ত্তনা, প্রসার ও ফলশ্রুতি, এ সকল বিষয়ে আমাদের জানতে হবে।

মনঃসমীক্ষণ, ঐতিহাসিক পটভূমি ও ফ্রয়েড্ :—

মনঃসমীক্ষণের ভাবধারা বস্তুতঃ মনোবিদ্যার চর্চ্চা থেকে আসে নি ; চিকিৎসা সম্পর্কিত, মানসিক রোগ চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা প্রসূত মনঃসমীক্ষণের সত্যাদি মনোবিদ্যার চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এনেছে। মানুষের মনের গভীর গহনে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা ও মানুষের নির্জ্জান মন কীভাবে অলক্ষ্যে মানব আচরণ ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে সে সম্পর্কে মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কার ও গবেষণা গভীরভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ। এদিক থেকে মনঃসমীক্ষণকে আচরণের মনোবিজ্ঞান বলা যেতে পারে, যদিও মনঃসমীক্ষণের চিন্তাধারার সাথে আচরণ-বাদী মনোবিদ্যার কোন মৌলিক সাদৃশ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে মনঃসমীক্ষণ মত-বাদকে কখনও কখনও গভীর মনোস্তরের মনোবিদ্যা বলা হয়। কেননা মনঃ সমীক্ষণ সেই মনের সমীক্ষণ, যে মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যক্তি সাধারণভাবে অবহিত নয়। কখনও আবার একে অনুভূতির মনোবিদ্যাও (feeling psycho-logy) বলা হয়, কেননা মনঃসমীক্ষণের মতাদর্শই প্রথম উনবিংশ শতাব্দীর বৌদ্ধিক মনোবিদ্যায় যে অতিমাত্রিক সংবেদন ও বৌদ্ধিক অবগতিকে জোর দেওয়া হয়েছিল, তার মূলে কার্যকরী আঘাত চাপে। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষণ মতধারা, মনোবিদ্যায় প্রচলিত জ্ঞান-পরীক্ষণ-কেন্দ্রীভূত যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা পশুকুলের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ যে সত্যাদি বা মানসিক অভীক্ষা প্রভৃতির প্রচলনে মনঃসমীক্ষণের সাথে কার্য্যনির্বাহ সংযোগে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা খুঁজে পায় নি। এর মধ্য দিয়ে মনের গহনে প্রবেশ করা যায় না।

শারীরিক কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়াহেতু মনের পরিবর্তন ঘটে, এরূপ ধারণা পরিবর্তে মানসিক কারণে মনের পরিবর্তন সাধিত হয়, এরূপ সত্য মনঃসমীক্ষ প্রকাশ ও প্রসার করে। এটি যখন থেকে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়েছে মস্তিষ্কের আঘাত বা তার কোন প্রকার গাঠনিক বিকৃতি না থাকা সত্ত্বে মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি দেখা যাচ্ছে, তখন থেকেই মানসিক বিকৃতি কারণ ব্যক্তির মনোজগতেই সন্ধান করা আরম্ভ হয়েছে। ব্যক্তির 'বিকৃত চি অভ্যাস, ইচ্ছাশক্তির সংকীর্ণতা, আবেগ জীবনের অস্থিরতা প্রভৃতি কারে মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব হয়। এ সব কারণেই যে মানসিক বৈকল্যের উ ঘটে, এ ধারণা যত দানা বেঁধেছে, ততই মনোবিত্থায় মনঃসমীক্ষণ চিন্তাধ গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু এর একটা ইতিহাস আছে। সম্মোহন বিত্থার ইতিহাসের সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেসমার (Mesmer) সম্মো বিত্থাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়াস করেন। কিন্তু প্যারি সাঁরকো (Charcot) ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। তি দেখলেন যে, যে সব ব্যক্তিত্বের গভীরভাবে সংবিষ্ট করা যায়, তারা হিষ্টি মূর্চ্ছারোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয় এবং এ সত্য থেকে তিনি হিষ্টিরিয়া রো কারণ নির্ণয় ও নিরাময়ে অনেক পরিমাণে আলোকিত হন। সম্মোহন প্র সম্বন্ধেও তিনি আলোকপাত করেন। সংবিষ্ট অবস্থা ব্যক্তির একটা বি রোগাক্রান্তি অবস্থার মত। নান্সী (Nancy) মতাবলম্বীরা এর বিরো করেন। এঁদের মতে স্বাভাবিক সকল ব্যক্তিকেই মৃদুভাবে সংবিষ্ট করা য এটা একটা নিষ্ক্রিয় ও সংগ্রহণমুখী অবস্থা। অভিভাবনে (Suggestion) উদ্ভব ঘটে। এঁরা স্নায়বিক রোগীদের কখনও কখনও এ প্রথায় চিকি করতেন। সাঁরকো ও নান্সী এই দুই মতাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ খুব হয়ে উঠল।

সাঁরকোর অনেক ছাত্র ছিল যাঁরা স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি এঁদের মধ্যে বেষ্টনের মর্টন (১৮৫৪—১৯২৯), মানসিক রোগীদের সম্মোহন বা সম্মোহন জাতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকেন। তিনি মনের সন্নিকটে আরও একটি মনোজগতের (Co-conscious) আভাস প্যারী(Paris) নগরের পিয়ারে জ্যানেও (Pierre Janet)বলতেন অচেতনা মানস ক্রিয়াকাণ্ড সম্ভব ; তাঁর মতে মানুষের চেতনা খণ্ডিত ও অসংলগ্ন

সম্ভব। তিনি পরবর্ত্তীকালে স্নায়ুরোগ বিষয়ে, গবেষণা ও চিকিৎসায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন। তিনি শাঁরকোর সম্মোহন প্রক্রিয়া হিষ্টিরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। এ থেকে তিনি দেখলেন যে সংবিষ্ট অবস্থায় হিষ্টিরিয়া রোগী তার অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণে আনতে পারে, যে সব অভিজ্ঞতার কথা জাগ্রতাবস্থায় একেবারেই স্মরণে আসে না। কোন আবেগজনিত আঘাত অর্থাৎ কোন মর্মান্তিক ঘটনা যখন ব্যক্তিকে তীব্র ভাবে আহত করে, সে অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি যদিও ধীরে ধীরে ভুলে যায়, তবু সে ভুলে যাওয়া ঘটনার কথা সংবিষ্ট অবস্থায় পুনরায় মনে করতে পারে এবং সংবিষ্ট অবস্থায় কোন অভিভাবনপূর্ণ (suggestion) নির্দেশ দিলে যেমন "এ অভিজ্ঞতা অতীত অভিজ্ঞতা মাত্র এখন এর আর কোন অস্তিত্ব নেই" প্রক্ষোভ পুঞ্জীত হিষ্টিরিয়া রোগের সংলক্ষণগুলো দূরীভূত হয়। জ্যানে (Janet), অন্যান্য প্রকারের মানসিক রোগ যেমন অহেতুক ভয় বা আবেশিক বায়ু (Obsessions) নিরাময়ের জন্য "পুনর্শিক্ষণের" পথ নিয়েছিলেন। জ্যানের মতে আবেগ জর্জ্জর অভিজ্ঞতার প্রধান অংশগুলি সংজ্ঞান মনের ধারার সঙ্গে মিলতে পারে না এবং ফলে রোগীর কোন বিশেষ ঘটনা মনে পড়লে সেই ঘটনার অনুষঙ্গিক প্রক্ষোভও সে অনুভব করে। জ্যানে মনে করতেন যে, মানসিক জটগুলি মানসিক যন্ত্রনার জন্য প্রধান চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর মতে যন্ত্রণা বিপর্যতার জন্য মানসিক শক্তির স্বল্পতা হেতু ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি কমে যায় এবং ফলে জীবন সংগ্রামে পরাজিত হতে থাকে। এই মানস শক্তির স্বল্পতা হেতু অহেতুক ভয়, আবেশিক বায়ু, অসাড়তা প্রভৃতি মানসিক রোগ-সংলক্ষণ দেখা দেয়।

জ্যানের প্রভাব মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করে। ফ্রয়েদ্ও এঁর দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষণের ভাবধারার উৎসমূলে জ্যানে প্রমুখ মনশ্চিকিৎসকদের চিন্তাধারা কাজ করছে। মনঃসমীক্ষণ ভাবধারার পটভূমি এঁরাই তৈরী করেছিলেন বলে মনে হয়।

ফ্রয়েদ্-এর প্রয়াস পর্যায়—

ফ্রয়েদ্ পরিচিতি : চেকোশ্লোভাকিয়ার ফ্রিবুর্গ শহরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিগমুণ্ড ফ্রয়েদের (Sigmund Freud) জন্ম। ভিয়েনাতেই তিনি শৈশবকাল থেকে থেকেছেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি পড়াশুনা করেন, এখান থেকেই

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্নাতক হওয়ার পূর্বে শরীরবৃত্ত বিষয়ের (Physiology) পরীক্ষাগারে অর্নষ্ট ব্রুক (Ernst Broucke) এর অধীনে তিনি ছয় বৎসর কাজ করেন। ব্রুক শরীর বৃত্তের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কাছে ফ্রয়েদ্ অত্যন্ত নিপুণ ভাবে কাজ শেখেন। কিন্তু এতে জীবীকার কোন সংস্থান হবে না ভেবে তিনি চিকিৎসক হলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েদ্ একটি সাধারণ হাসপাতালে সরকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শরীরবৃত্তগত পরীক্ষাগার থেকে হাসপাতালে এসে যোগ দেন, কিন্তু শরীর বৃত্তগত বিষয়ে বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্র, এর গঠন ও কার্যকারিতা ও এর গাঠনিক ও কার্মিক বিকৃতিজনিত (যেমন অসাড়তা বা মস্তিষ্কের আঘাত) যে সকল অসুস্থতা, সে বিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন ও এ বিষয়ে পটুতা অর্জনে প্রয়াসী হন। এ সময়ে ভিয়েনাতে স্নায়ু ও আবেশিক রোগ সম্বন্ধে তেমন কারও জ্ঞান ছিল না এবং রোগ নিরাময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও যথার্থ প্রয়োগ প্রচলন ছিল না।

॥ ১ ॥ প্যারীর সাঁরকোর তখন এ বিষয়ে খুব নাম ডাক। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েদ্ পারী সহরে সাঁরকোর কাছে শিক্ষালাভের জন্য গেলেন। হিষ্টিরিয়া রোগ নিরাময়ে তাঁর সম্মোহন কৌশল-প্রয়োগ ফ্রয়েদ্‌কে মুগ্ধ করে। (ক) সাঁরকোর আরও একটি অবিষ্কার একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সকল প্রকার আবেশিক রোগই ব্যক্তির যৌন-জীবনে কোন না কোন বিকৃতি থেকে আসে, এটা ফ্রয়েদ্‌কে চমকিত করে। ফ্রয়েদ্ ভাবতে থাকলেন এই আবিষ্কৃত সত্যকে সাঁরকো কেন তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহার করছেন না। পরবর্ত্তী-কালে ফ্রয়েদের চিন্তাধারায় এ সত্য যথাযথ ভাবে স্থান পেয়েছিল।

(খ) সাঁরকোর সঙ্গে কাজ করার সময়ে, ফ্রয়েদ্ দেখলেন সাঁরকো রোগীকে সংবিষ্ট করে হিষ্টিরিয়া রোগলক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে পারেন। পূর্বে জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান দেশে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে স্নায়ুমণ্ডলে কোন গাঠনিক গোলযোগ হেতুই হিষ্টিরিয়া রোগ হয়। লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্নায়ুচিকিৎসাগারেও এরূপ ধারণাই প্রচলিত ছিল এবং সেখানে এরূপ শিক্ষাই দেওয়া হ'ত।

(২) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েদ্ ভিয়েনাতে ফিরে পুরোপুরি স্নায়ুরোগের, বিশেষ করে হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। তিনি সম্মোহনকেই চিকিৎসার প্রধান উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন, কিন্তু অচিরেই নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হন। একটি বাধা হ'ল (ক) অনেক রোগীকে সংবিষ্ট করা সম্ভব ছিল না। যদিও বা

তিনি কষ্টে স্থষ্টে কোন প্রকারে কোন রোগীকে সংবিষ্ট করতেন, তাদেরও সব সময় এ পদ্ধতিতে সারিয়ে তুলতে পারতেন না। এরূপ অভিজ্ঞতায় তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পুনরায় প্যারীতে গেলেন—এবার গেলেন নান্সী (Nancy) মতাবলম্বীদের রোগ নিরাময় পদ্ধতি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে। নান্সী মতবলম্বীরা সকল রোগ নিরাময়েচ্ছু ব্যক্তিকেই সংবিষ্ট করতে পারতেন এবং সংবিষ্ট অবস্থায় নিরাময়মূলক অভিভাবন (Suggestion) দ্বারা রোগীদের সারিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু এঁদের একটা বিষয়ে জেনে ফ্রয়েদ্ হতাশ ও মর্মাহত হলেন—যে সব রোগীরা দানের উপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে নিরাময়মূলক অভিভাবন যেভাবে কার্যকরী হ'ত, সাধারণ চিকিৎসা খরচ বহনে সক্ষম রোগীদের ক্ষেত্রে অভিভাবন ততটা ফলপ্রস্থ হ'ত না, কেননা তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অতি পোষাকী ছিল ; এরা অভিভাবনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারত না।

জোসেফ্ ব্রুয়ারের (Josef Breuer) প্রভাব—

ব্রুয়ার ভিয়েনার একজন চিকিৎসক ছিলেন। জোসেফ্ ব্রুয়ারের প্রভাবই বোধ হয় ফ্রয়েদের উপর সর্বাধিক ছিল। সাঁরকো ও নান্সী মতাবলম্বীরাও ফ্রয়েদের উপর অতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ব্রুয়ারও ফ্রয়েদের মত প্রথম শরীরবিদ হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত হন। ফ্রয়েদ্ ও ব্রুয়ার দুই বন্ধু ছিলেন। এঁরা দুজনেই উন্মায়ু রোগ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেন।

ব্রুয়ার মানসিক রোগ চিকিৎসায় একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ পদ্ধতি কেবল যে মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই নতুন দিশারী তাই নয়, মনের গহন রাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির আবিষ্কারেও এ পদ্ধতির পরোক্ষ তাৎপর্য কম নয়। ব্রুয়ারের একজন রোগিনীই বস্তুতঃ এই নতুন পথের সন্ধান দেন। রোগিনীটি হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগছিলেন। ব্রুয়ার তাঁর উপর যথারীতি রোগ নিরাময় উদ্দেশ্যে সম্মোহন প্রয়োগ করেছেন। রোগিনীটি দেখলেন যে, তাঁকে যদি সংবিষ্ট অবস্থায় কেবল তাঁর প্রক্ষোভঘটিত অসুবিধার কথাগুলি খোলাখুলি বলতে দেওয়া হয় তাহলেই তিনি অনেকটা ভাল বোধ করেন। সংবিষ্ট অবস্থায় অনেক বিস্মৃত ঘটনার (যার সাথে তার আবেগগত জীবনের অনেক যোগ ছিল) কথা মনে আসতো এবং তা বলে তিনি নিজেকে অনেক হাল্কা বোধ

করতেন, হিষ্টিরিয়া রোগের সংলক্ষণও যেন অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে ব্রুয়ার তাঁর নতুন নিরাময় পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন। রোগী বা রোগিনীকে কেবল তার মনের কথা খুলে বলতে দিলেই সে ভাল হয়ে যায়। কাজেই রোগী বা রোগিনীকে সংবিষ্ট করে যতটা সম্ভব তার মনের কথা বার করে আনা যায়। সে কথার আপাত দৃষ্টিতে কোন অর্থ না থাকতে পারে, সে কথার সাথে আপাত দৃষ্টিতে রোগের কোন সম্বন্ধ খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে। সামাজিক অসামাজিক, শ্লীল অশ্লীল যে কোন প্রকার কথাই এ অবস্থায় রোগীর মনে আসতে পারে—এরূপ অকপট আত্ম-কথন যত ত্বরান্বিত ও স্বচ্ছন্দ করা যায় রোগের তত নিরাময় ঘটে।

ব্রুয়ার ও ফ্রয়েদ্ ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি হিষ্টিরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে দুজনেই অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভ করলেন। ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করলেন। তাঁরা বল্লেন যে বিগত স্মৃতি, যার সাথে আবেগ (দুঃখ, ভয়, ঘৃণা, অতৃপ্ত ভালবাসা) জড়িয়ে থাকে, যদি মানসপটে ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে এ সব পুঞ্জীভূত আবেগের বিরেচন (Catharsis) ঘটে। এ প্রক্ষোভ-বিদূরণ প্রক্রিয়াকেই অভিস্ফোট (Abreaction) বলে। জ্যানে সংবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি করে হারানো স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনে রোগের কারণটি খুঁজে নিয়ে তা দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফ্রয়েদ্ ও ব্রুয়ার এর সঙ্গে দেখলেন যে রোগী যদি আপন মনে তার সব কথা বলার সুযোগ পায় তা হলেও অনেক পরিমাণে আরোগ্য লাভ করতে পারে। খুব খানিকটা কাঁদাকাটির পর মনের রুদ্ধ শোক যেমন প্রশমিত হয় তেমনি চিকিৎসকের কাছে মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করার পর রোগীর মনেও শান্তি আসে, রোগও ধীরে ধীরে সেরে যায়। যে সব ঘটনা রোগীর লজ্জা ও দুঃখের কারণ, সেই সব ঘটনাকে রোগী অবদমিত করে রেখেছে। এদের মনের আর এক 'প্রান্তে' সরিয়ে দিয়েছে ; মনের অবচেতন গহ্বরে যেন নির্বাসিত করেছে। সংবিষ্ট অবস্থায় এদের কথা আবার চেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায়। তাঁরা দেখলেন, কতকগুলি দুঃখদায়ক ভাব মনে রুদ্ধ অবস্থায় থেকে রোগের সৃষ্টি করে, এবং সেগুলি কোন উপায়ে মন থেকে বের করে দিতে পারলেই রোগের উপশম হয়।

বার্ণহাইমের (Bernheim) প্রভাব—

এ উপায়ে চিকিৎসা করার পরে ফ্রয়েদ দেখলেন যে, মনের অনেক গোপন

কথা সংবিষ্ট অবস্থায়ও সহজে স্মৃতি পটে উদয় হয় না। তিনি আরও দেখলেন যে, সকল রোগীকে সংবিষ্ট করা যায় না। ফ্রয়েদ্ পুনরায় ফ্রান্সে গেলেন, কিন্তু এবার গেলেন নান্সীতে বার্নহাইমের কাছে অধ্যয়ন করতে। 'বার্নহাইমের একটি পরীক্ষামূলক কার্য দেখে তিনি নতুন আলোক পেলেন। বার্নহাইম একটি রোগীকে সংবিষ্ট করে তাকে আবেশান্ত-অভিভাবন দিয়ে বলতেন, "যখন বারোটা বাজবে তখন তুমি জানালাটি খুলবে।" এর পর রোগীটিকে জাগিয়ে দেওয়া হ'ত। ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রোগীটি সত্যি সত্যি জানালা খুলে দিত। এর কার্য-কারণ সম্বন্ধ সে খুঁজে পেত না। এ কাজ কেন সে করল, তা জিজ্ঞাসা করলে, সঠিক উত্তর দিতে পারত না, একবার বলত 'আপনার নির্দেশের জন্য এ কাজ করেছি, আবার, বলত, "খুব গরম লাগছিল বলে জানালা খুলে দিয়েছি।"

বার্নহাইম এর সঠিক তাৎপর্য খুঁজে বার করতে চাইলেন। রোগীকে বস্তুতঃ এ কাজ কেন করেছে তা বলার জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া হ'ল। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর, এ কাজ করার আসল কারণ তার স্মরণে আসে। এইভাবে বার্নহাইম্ তার চেতন মনের সাথে অবচেতন মনের (Unconscious Mind) সেতুবন্ধ স্থাপন করেন।

ফ্রয়েদ্ লক্ষ্য করলেন যে, সংবিষ্ট অবস্থায় রোগী যা করে, জেগে ওঠার পর তার আর সে সব কিছু মনে থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় এরূপ লুপ্ত-স্মৃতি উদ্ধারের জন্য বার্নহাইম ব্যক্তির কপাল একটু চেপে ও তাতে হাত বুলিয়ে বলতেন যে, সংবিষ্ট অবস্থার সব ঘটনা তার মনে আসবে। দেখা যায়, বিস্মৃত ঘটনা সত্যই রোগীর স্মরণ প্রান্তে জেগে ওঠে।

ব্রুয়ার ও বার্নহাইম দুজনের কাছ থেকেই ফ্রয়েদ্ তাঁর বৈপ্লবিক পথ-নির্দেশ পেলেন। একদিকে নির্জ্ঞান মনের সন্ধান. ও তার স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পেলেন, অন্যদিকে মানসিক রোগ চিকিৎসার কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন করলেন ফ্রয়েদ্।

ফ্রয়েদ্ ঠিক করলেন, রোগীকে সংবিষ্ট না করে বার্নহাইমের মত রোগীকে শুইয়ে দিয়ে তার কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে স্পর্শ করে তার পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। এতে রোগী প্রথম জানায়, যে তার কোন কথাই মনে আসে না। ফ্রয়েদ্ রোগীকে তার মনে যে কথারই উদয় হোক, অকপটে তা বলার জন্য নির্দেশ দিলেন। এইরূপে রোগীর যে সব কথার

সন্ধান পাওয়া গেল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার মধ্যে লুপ্ত স্মৃতির আভাস রয়েছে দেখা গেল।

ফ্রয়েদ্ সংবেশন পদ্ধতি পরিত্যাগ করলেন। কেবল শরীর-মন এলিয়ে দিয়ে একান্তে কেবল যা মনে আসে বাধা-বন্ধহীন-ভাবে রোগীর তাই বলে যাওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। রোগীকে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিতেন। দরজা জানালা বন্ধ করে অল্প আলোতে রোগী এরূপ অবস্থায় থাকবে। রোগী বিশেষ কোন বিষয়ে মনকে নিবদ্ধ করবে না, মন আপনা আপনি বিহার করবে। এইভাবে তার মনে যে সব কথা আসবে, সে সেগুলো ন্যায়, অন্যায়, শ্লীল, অশ্লীল, আবশ্যক, অনাবশ্যক নির্বিশেষে বলে যাবে। লজ্জা, সংকোচ, ভয়, ভদ্রতা প্রভৃতির কোন বাধা না মেনে সে অবাধে সব মনের কথা প্রকাশ করবে। ফ্রয়েদ্ এ পদ্ধতির নাম দিলেন অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি (Free association method)। এ পদ্ধতিকে অবাধ ভাবানুষঙ্গ বলাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কেননা ব্যক্তি তার ভাব-প্রকাশে ও নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপ নিজের অসুবিধা সম্বন্ধে বা নিজের বিষয় সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলতে হবে। সংবেশন পদ্ধতির মধ্যে যে অভিভাবনের পদ্ধতি আছে, ফ্রয়েদ্ তা পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু ব্যক্তিকে আবেশ-প্রবণ করে তোলার মূল নীতিটি গ্রহণ করলেন। সম্মোহনের আবেশপ্রবণতা ও অবাধ ভাবানুষঙ্গ মিলিয়েই ফ্রয়েদের চিকৎসা পদ্ধতি আরম্ভ হ'ল।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ—কিন্তু ফ্রয়েদ্ দেখলেন যে, এরূপভাবে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগ-চিকিৎসা অনেক সময়সাপেক্ষ, ব্যক্তির অবচেতন মানস গহনে প্রবেশ করাও এ পদ্ধতিতে অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। ফ্রয়েদ্ তখন দেখলেন, রোগীর স্বপ্নবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান মনের প্রবেশের পথ সুগম হতে পারে। রোগীর অব্যাবহিত পূর্বের স্বপ্নের কথা রোগী বলে, তাকে কেন্দ্র করে স্বপ্নের প্রতিটি অংশকে কেন্দ্র করে, রোগী অবাধ ভাবানুষঙ্গ (Free association) দিয়ে থাকে। স্বপ্নের প্রত্যেকটি অংশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ব স্মৃতি উদ্রেগের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়—একে কেন্দ্র করে বিগত বহু পুরানো অভিজ্ঞতার কথা, বিস্মৃতি দেশের গোপন কথা স্মরণ পথে ফিরিয়ে আনা যায়। এই সব স্মৃতিচারণ বস্তুতঃ ব্যক্তির শৈশবকালীন বহু অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেমন ব্যক্তি কি প্রকারের মানসিক জটের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বা কি প্রকারের গূঢ়েষা ব্যক্তির অবচেতন মানসে কাজ করেছে। স্বপ্ন-বিশ্লেষণ পদ্ধতি

ফ্রয়েদই প্রথম আবিষ্কার করেন। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, ফ্রয়েদ্ প্রথম সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের পরবর্ত্তী পর্যায়েই ফ্রয়েদ্ তাঁর Psychopathology of Everyday Life গ্রন্থে দেখান যে, মানুষের হঠাৎ ভুলে যাওয়া, কিছু বলতে বা উচ্চারণে ভুল করা, লিখতে গিয়ে কিছু মনে না আসা, বিকৃত করে কোন কিছু লেখা বা উচ্চারণ করা প্রভৃতির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেও মনের নির্জ্জান স্তরস্থিত ব্যক্তির গূঢ়ৈষার বৃত্তান্ত জানা যায়। কাউকে বিদ্রূপ করা, তামাশা করে কিছু বলা বা ইঙ্গিত করার মধ্যেও যে ব্যক্তির নির্জ্জান মন প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে, সেটাও ফ্রয়েদ্ তাঁর Wit in Relation to the Unconscious গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, মনঃসমীক্ষণ বস্তুতঃ আর কেবলমাত্র একটি মানসিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি রইল না, মনোবিদ্যায় একটি বৈজ্ঞানিক মতধারার বৈপ্লবিক সংযোজন হয়ে রইল।

ফ্রয়েদ্ দেখলেন যে, উদ্বায়ু (Neurotic) রোগের সংলক্ষণ, স্বপ্ন, তথাকথিত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি, বিদ্রূপ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে যে অবদমিত ইচ্ছা বা গূঢ়ৈষার প্রকাশ মেলে, তা মূলতঃ যৌন-ইচ্ছা সংক্রান্ত। সাঁরকোও বলেছিলেন যে, যৌন জীবনে কোন প্রকার গোলযোগই সর্বপ্রকার উদ্বায়ু রোগের কারণ। ফ্রয়েদ্ বললেন যে, অবদমিত কামেচ্ছাই উদ্বায়ু রোগের মূলে কাজ করে। তবে এ অবদমন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়—কেন না সকল কামোৎসারিত ইচ্ছাকেই সমাজে চরিতার্থ করা যায় না এবং এর জন্য মানসিক দ্বন্দ্বও সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর কাজ করে। এই দ্বন্দ্বের ও অবদমনের মাত্রা-ভেদেই মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব হয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে যৌন-ইচ্ছার সাথে যে মানসিক বৈকল্যের কোন সম্বন্ধ আছে, এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না।

ফ্রয়েদের মতবাদ মনোবিদ্যার জগতে আলোড়ন এনেছিল সত্য, কিন্তু তা-সর্বজনগ্রাহ্য বলে গৃহীত হয় নি।

মনঃসমীক্ষণের আরও বিকাশ ব্যাপ্তি :—

ফ্রয়েদের মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শের সংহত বিবরণ দেওয়ার পূর্বে, মনশ্চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আরও বিকাশ পর্বের কিছু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। মনঃসমীক্ষণে এটা সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি বস্তু-বিশেষ

যৌন-ক্রিয়া ও যৌন-বস্তুর প্রতীক হিসাবে কাজ করে। যে ক্ষণে রোগী স্বপ্নে এই সব বস্তুপুঞ্জের যে কোন একটির দেখার কথা বলবে, তখন চিকিৎসক এই প্রতীকী বস্তুটির অন্তরালে যে গূঢ়ৈষা তার আভাস পেয়ে যেতে পারে। ফ্রয়েদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীকে কেবল জানানোই হবে না, কি ও কেন তার অসুস্থতা, রোগীকে নিজে নিজে রোগ-উৎপাদনকারী মূল অভিজ্ঞতাকে চেতন-মানসপটে পুনরুদ্রেক করতে হবে। ছকে বাঁধা প্রতীকী (Symbols) দিয়ে সর্বদা রোগীর নির্জ্ঞান মনের গূঢ়ৈষাকে বোঝা যায় না।

ফ্রয়েদ্ তাঁর অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও স্বপ্ন বিশ্লেষণের পদ্ধতি অবলম্বন করে অনেক মানসিক রোগীকে সারিয়ে তুললেন। তিনি এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির অবদমিত আশা আকাঙ্ক্ষায় বিজড়িত অভিজ্ঞতাকে চেতন মনের কোণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং হিষ্টিরিয়া, আবেশিক ভয় ও অন্যবিধ উদ্বায়ু রোগ সংলক্ষণ দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু একটা জিনিস কোন কোন সময়ে ঘটতে দেখা যেত। যে সব রোগী ভাল হয়ে গেছে বলে ছেড়ে দেওয়া হত, তারা কিছুদিন পর অন্য প্রকারের রোগ সংলক্ষণ নিয়ে আবার ফিরে আসত। কিন্তু ফ্রয়েদ্ এতে বিহ্বল বা হতাশ হলেন না, তিনি তাঁর পূর্বতন নিরাময় পদ্ধতিতে এতটুকু আস্থা হারালেন না। তিনি ঘোষণা করলেন যে, উদ্বায়ু রোগের প্রথম স্তরকে মাত্র তিনি ভেদ করতে পেরেছেন—তাঁর মনঃসমীক্ষণকে আরও গভীর স্তরে প্রধাবিত করতে হবে। তাহলেই মনঃসমীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে মানসিক রোগ নিরসনে যথার্থ রূপে কার্যকরী হয়ে উঠবে। তিনি বললেন রোগীর জীবনাভিজ্ঞতার আরও গভীর স্তরেও আরও শৈশবকালীন স্তরে প্রবেশ করতে হবে। এ স্তরীয় অভিজ্ঞতার মধ্যেই, ফ্রয়েদের মতে. মানসিক রোগের মূল কারণটি নিহিত থাকে। প্রথম দিকে ফ্রয়েদ্ বর্তমানকালের কোন গূঢ়ৈষা বা মানসিক জটিলতার আবিষ্কার করেই শেষ করতেন, কিন্তু পরে তিনি দেখলেন যে, বর্তমানের যে জটিলতা তা একটা ফল মাত্র, তা শৈশবকালের কোন জটিলতারই পরিণতিস্বরূপ—এবং অতি শৈশবকালীন এ জটিলতা ব্যক্তির নির্জ্ঞান মানস স্তরে বর্তমান থাকে। নির্জ্ঞান মানসস্তরের অতি শৈশবকালীন জটিলতা যতদিন দূর না হয়, ততদিন বাইরের বর্তমান কালস্থিত জটিলতার উপশম ঘটিয়ে স্থায়ী আরোগ্য ঘটানো যায় না।

প্রথমে ফ্রয়েদ্ ধরে নিয়েছিলেন যে, মূল গূঢ়ৈষা রোগীর জীবনে বিশেষ

কোন প্রক্ষোভজনিত আঘাতের ফল। ক্রুয়ার ও সাঁরকোও এই সত্য বিশ্বাস করতেন। ফ্রয়েদ্ সেইজন্য ব্যক্তির বহু পুরানো দিনের ভুলে যাওয়া অভিজ্ঞতাগুলোকে স্মৃতি পথে টেনে আনতে সচেষ্ট হলেন, যাতে সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাকে খুঁজে পাওয়া যায়, যা থেকে মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব ঘটেছে। বহু হিষ্টিরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে ফ্রয়েদ্ স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে শৈশবকালীন প্রক্ষোভ আঘাত জনিত অভিজ্ঞতার সূত্রটি আবিষ্কার করতেন। এ হেন রোগী বা রোগিনীদের ক্ষেত্রে প্রায়শঃই দেখা যেত যে এরা পিতা, কাকা বা বড় ভাইদের দ্বারা যৌনবিষয়ে বিচ্যুত হয়েছিল। ফ্রয়েদ্ এ সব ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করতে গিয়ে দেখলেন যে, এ সব অভিজ্ঞতার কথা প্রায়শঃই কাল্পনিক। স্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি যে যৌন অভিজ্ঞতার সূত্র খুঁজে পেতেন তার সবটাই কল্পনা-সঞ্জাত দেখে ফ্রয়েদ্ কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েদ্ পরে সিদ্ধান্ত টানলেন যে রোগী তার যে সব অভিজ্ঞতার কথা বলে, তার অধিকাংশই শৈশবকালীন কল্পনা। যদিও এরা কল্পনা তবু মানসিক জীবনে এদের অস্তিত্ব বাস্তব ঘটনা থেকে কোন অংশে কম নয়। মনোজগতে বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। ফ্রয়েদ্ সিদ্ধান্ত করলেন যে, মানসিক ব্যাপারে বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনা উভয়ই সমান অনিষ্ট সাধন করতে পারে। প্রশ্ন উঠল, এ সকল যৌন লাঞ্ছনা বা বিলোভনের কল্পনা বাল্যাবস্থায় কি প্রকারেই বা রোগীর মনে জেগেছিল এবং পরে কেনই বা সে স্মৃতি লুপ্ত হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত সাধারণ লোকের মত ফ্রয়েদের ধারণা ছিল যে, কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ বয়ঃসন্ধিকালেই হয়ে থাকে। শৈশবে কোন যৌন বোধ থাকে না। তিনি দেখলেন যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের শৈশবকালে (Later-childhood) প্রথম পর্যায়ের শৈশবকালের অতৃপ্ত ইচ্ছা উঁকি মারে। দেখলেন যে, তিনি যদি প্রথম পর্যায়ের অবদমিত মনঃসমীক্ষণের মধ্য দিয়ে শৈশবকালীন ইচ্ছাগুলিকে ধরতে পারেন, তাহলেই বয়ঃপ্রাপ্তিকালের মনোবিকারের মূল কারণে পৌছানো যায়। রোগী যদি এই সব শৈশবকালীন অবদমিত ইচ্ছাকে মানসপটে পুনরুদ্রেক করতে পারে, তা হলে রোগ নিরাময় হতে পারে।

মনঃসমীক্ষণকে শৈশবকালীন পর্যায়ের সমীক্ষায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এটা কি সম্ভব? বাস্তব দিক থেকে এ কি কোন প্রকারে ঘটানো যায়? ব্যক্তির স্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা ঘটিয়ে ফেলা যায় এ ধারণা অবাস্তব—স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সঙ্গে অবাধ ভাবানুষঙ্গ মিলিয়ে শৈশবের অভিজ্ঞতার সীমানায় সম্পূর্ণ-

রূপে পৌছানো যায় এরূপ প্রায় অসম্ভব। ফ্রয়েদ্ যদিও বলেছেন যে, যা কিছু ঘটে যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে তা বিস্মৃত হলেও মন থেকে তা একেবারে মুছে যায় না এবং এই সব পুঞ্জ পুঞ্জ বিস্মৃত অভিজ্ঞতাকে মনের বাঁধনে (Resistances) ঠিকভাবে যুক্ত করে পুনরায় চেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক সাধ্য সাধনা করেও অতি শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার ছিঁটেফোঁটা চেতন মনে তুলে আনা যায়। তাছাড়া কেবল বুদ্ধি-প্রযুক্ত শৈশব স্মৃতিচারণই এক্ষেত্রে কার্যকরী কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। বস্তুতঃ ব্যক্তির শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার সাথে যে প্রক্ষোভ-সংযোগ রয়েছে, তার পুনরুদ্রেক ঘটাতে হবে। ব্যক্তিকে শৈশবকালীন আবেগ-প্রকম্পিত জীবনে যেন ফিরে যেতে হবে। শৈশবের আবেগ-উত্তপ্ত অভিজ্ঞতার কিছুও যদি স্মরণপথে ফিরিয়ে আনা যায় ও এর মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত আবেগের বাষ্পীকরণের সাথে সাথে শৈশবের কিছু অভিজ্ঞতাও স্মরণপথে আনা যায় তাহলে ব্যক্তির মানসিক বৈকল্য দূর হতে পারে।[১]

---

১ In one of his writings Freud distniguishes three stages in his progress.

At first the endeavours of the analytic physician were confined to divining the unconscious of which his patient was unaware, effecting a synthesis of its components and communicating it at the right time...

Since the therapeutic task was not thereby accomplished, the next aim was to compel the patient to confirm the reconstruction through his own memory. In this endeavour the chief emphasis was on the resistances of the patient : the art now law in unveiling these as soon as possible, in calling the patient's attention to them, and.., teaching him to abandon the resistances.

It becomes increasingly clear, however, that the aim in view, the bringing into consciousness of the unconscious, was not fully attainable by this method either. The patient cannot recall all of what lies repressed, perhaps not even the essential part of it,., He is obliged rather to repeat as a current experience what is repressed...As a rule the physician cannot spare the patient this phase of the cure ; he must let him live through a certain fragment of his forgotten life.

S. Freud : Beyond the Pleasure Principle P. P. 17-18.

রোগী যখন তার শৈশবের আবেগাভিজ্ঞতা ও প্রতিন্যাস কিছু স্মরণপথে ফিরিয়ে আনে; যখন সঠিক সব ঘটনা, সেই সব ঘটনার সাথে যে সব ব্যক্তি ও বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল তার সকলের কথা মনে আনতে পারে না, তখন সংক্রমণ (Transference) এর সম্ভাবনা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। রোগী মনঃসমীক্ষকের মধ্যেই তার পূর্বতন সকল আবেগাভিজ্ঞতার সংক্রমণ ঘটাতে আরম্ভ করে। মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করেই ব্যক্তি যেন তার শৈশবের আবেগ পুঞ্জীত অভিজ্ঞতাকে মুক্তি দিতে চায়। শৈশবে ব্যক্তির পিতার প্রতি যেরূপ ভালবাসা, বিদ্রোহ বা ঘৃণার ভাব ছিল মনঃসমীক্ষকও সেইরূপে চিকিৎসাকালে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ব্যক্তি মনঃসমীক্ষককে, কখনও কখনও অত্যন্ত ভালবাসে কখনও তার আস্থাভারে মনপ্রাণ ভরে ওঠে, কখনও বা সমীক্ষককে অত্যন্ত ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে। এরূপ সদর্থক সংক্রমণ বা নঞর্থক সংক্রমণ, ব্যক্তির শৈশবকালে পিতার প্রতি মনোভাবকেই পরিস্ফুট করে। মনঃসমীক্ষক যখন ব্যক্তির সমীক্ষায় রত থাকেন, প্রথমদিকে সদর্থক সংক্রমণ (positive transference) দেখা দেয়। রোগী সেই সময় মনঃসমীক্ষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে তার শৈশবকালের অবদমিত নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। এসব ইচ্ছা যাতে মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে নিবদ্ধ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সকল ইচ্ছা-মুক্তির পথও যাতে রোগী অন্যভাবে পায় সে ব্যবস্থা করা দরকার। ধীরে ধীরে মনঃসমীক্ষক তার ভূমিকাকে খর্ব করতে থাকেন এবং ব্যক্তিকে স্বচেষ্টায় নিজেই নিজের ভার নিতে হয়।

অবাধ ভাবানুষঙ্গ; ও সংক্রমণ, এই দুটি অবস্থাকেই ফ্রয়েদ তাঁর লক্ষ্য পথে পৌছবার কাজে লাগান। এই দুই অবস্থার মধ্যে যে বাধা আপাতদৃষ্টিতে প্রতীত হয়েছিল, ফ্রয়েদ সে বাধা গুলোকেই কাজে লাগালেন। ফ্রয়েদ দেখলেন যে, অবাধ ভাবানুষঙ্গের মাধ্যমে শৈশবকালীন স্মৃতি যেটুকু প্রতিভাত হয়, তাকেই ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ও তার সাথে পুঞ্জীভূত আবেগের বিরেচন হলে, রোগ নিরাময়ের পথ বহুল পরিমাণে প্রশস্ত হয়। সংক্রমণকেও ফ্রয়েদ, কাজে লাগালেন। মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে যে সংক্রমণ ঘটে তাকেই ফ্রয়েদ শৈশবকালের সম্পর্কবিজড়িত যে আবেগাভিজ্ঞতা তার স্বাভাবিক স্ফূর্তিপথকে প্রশস্ত করেন এবং এ অবস্থার মধ্য দিয়েই রোগীর রোগ উপশম ত্বরান্বিত হয়।

এ পদ্ধতি অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, মনঃসমীক্ষক হওয়া হঠাৎ কিছু হয়ে যাওয়া নয়। সকলের পক্ষে হওয়াও সম্ভব নয়। মনঃসমীক্ষক হওয়ার জন্য অন্ততঃ দুই বৎসর একজন মনঃসমীক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রগাঢ় অধ্যবসায়. অনুশীলন প্রয়োজন। কেবল ভেষজবিদ্যায় পারদর্শী হলেই মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায় না, বস্তুতঃ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সময় যে সব বিষয় পড়তে হয় তাতে মানব সভ্যতার ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মের মনস্তত্ত্ব, লোক-গীতি, সাহিত্য, যা কোন না কোন ভাবে ব্যক্তি ও সমাজ মানসের প্রতিফলন এবং সর্বোপরি নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে কোন কিছু অনুশীলন করা হয় না; বরং বর্তমান চিকৎসা বিজ্ঞানে মনের দিকটা তেমন দেখার শিক্ষা দেওয়া হয় না। অসুস্থতায় দেহগত কার্য-কারণ সম্বন্ধ কেবল নির্ণয় করতে শেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সকল রোগ দেহগত কারণে হয় না। প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্র শিখে কেউ যদি মনঃসমীক্ষক হতে চান, তা হলে তাঁর পক্ষে মানসিক রোগ সারিয়ে তোলার প্রয়াস অপপ্রয়াসের নামান্তর মাত্র। ফ্রয়েদ্ বলেছেন যে যিনি মনঃসমীক্ষক হতে চান, তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য হবে নিজের মনঃসমীক্ষা যথাযথভাবে করে নেওয়া। সেই ব্যক্তিই কেবল একজন যথার্থ মনঃসমীক্ষক হতে পারেন, যিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে নিজের অবদমিত গূঢ়ৈষা থেকে মনঃসমীক্ষণ দ্বারা মুক্ত হয়েছেন। অন্যথায় মনঃসমীক্ষকের নিজস্ব জটিলতা ও গূঢ়ৈষা অন্য ব্যক্তির মনঃসমীক্ষণের সময় নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। রোগীর চিকিৎসকের প্রতি-সংক্রমণ তো হয়ই। অশিক্ষিত মনঃসমীক্ষকের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষকের রোগীর প্রতি সংক্রমণ হতে দেখা যায়, পরিণামে মনঃসমীক্ষণের জন্য যে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা সৃজন একান্তভাবে প্রয়োজনীয়তার অভাব ঘটে। ফ্রয়েদ্ বিশ্বাস করেন যে, মনঃসমীক্ষণ তত ফলপ্রসূ হবে, শৈশবকালের ও যৌবনের অপসঙ্গতির যত শীঘ্র মনঃসমীক্ষকের মাধ্যমে দূরীকরণের চেষ্টা করা হবে।

ফ্রয়েদের মনস্তাত্ত্বিক সত্যাদি—

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফ্রয়েদের উদ্বায়ু রোগে মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা পদ্ধতির ঐতিহাসিক পটভূমি ও তার বিকাশ পর্ব সম্বন্ধে এবং মনঃসমীক্ষণ, মনোবিদ্যার চিন্তাধারায় যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন, এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছি। প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েদের মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক নীতির সূত্রগুলি আড়ালে রয়ে গেছে। ফ্রয়েদের মনঃসমীক্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গ করতে গিয়ে ফ্রয়েদের নীতিসূত্র—

গুলিও তার মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে। ঘটনাগুলোর অন্তরালেই নীতিসূত্রগুলি লুকায়িত থাকে।

সংক্রমণের ঘটনা ফ্রয়েদের মনঃসমীক্ষণ জগতে একটা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। সংক্রমণের ঘটনা প্রকৃত পক্ষে মনঃসমীক্ষকের প্রতি রোগীর সদর্থক ও নঞর্থক প্রতিন্যাস (Attitude), যা মনঃসমীক্ষকের মনের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রতিন্যাস মনঃসমীক্ষকের উপর এসে বর্ত্তায়। (ক) এই প্রতিন্যাস যে মূল অন্য কোন ব্যক্তি থেকে মনঃসমীক্ষকের প্রতি এসে ন্যাস্ত হয়, এ ঘটনাটি অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ; এর মধ্যেই একটা সূত্র সম্পাদন করা যেতে পারে। (খ) মুক্তভাবানুষঙ্গ দিতে গিয়ে ব্যক্তির যে একটা বাধো বাধো ভাব —ব্যক্তি যে সব কিছু খুলে বলতে পারে না, এটাও একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ব্যক্তি অনেক ঘটনাকে বলতে গিয়ে তুচ্ছ ঘটনা ভেবে আর বলে না. আরও অনেক ঘটনা বলতে গিয়েও বলতে পারে না। এই বাধো বাধো ভাব কেবল যে চেতন মনে কাজ করে তা নয়। একটা ঘটনা হয়ত মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু তাকে ভেতর থেকে মনেরই একটা অংশ যেন দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ঘটনার ঠিক ঠিক চেহারাটিও তার মনে যেন এসেও আসতে চায় না—বার বার মনের প্রান্তে আবছা ভাবে এসে ফিরে যায়; অবশেষে যখন সে স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে ও পরিষ্কারভাবে মনের প্রান্তে ধরা দেয়, তখন বুঝতে হবে এ স্মৃতি মনের কোথাও লুকানো ছিল। এ ধরনের স্মৃতি সর্বদাই ব্যক্তির মনের কোন অংশে বর্ত্তমান আছে। এ থেকেও একটা সাধারণ সূত্রে আসা যায়—নির্জ্ঞান কোন বাধা এ সব অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে চেতন মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

এ সব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফ্রয়েদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ঘটনাগুলির মধ্যেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক সূত্রগুলি বর্তমান রয়েছে। এ সব সূত্রগুলি, মনঃসমীক্ষণের সময় ব্যক্তির যে আচার আচরণ, তার যে চিন্তা স্রোত পরিলক্ষিত হয়, তার উপরই ভিত্তি করে আছে। ফ্রয়েদ নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন[১]।

---

[১] The psycho-analytic theory endeavours to explain two experiences, which result in a striking and unexpected manner during the attempt to trace back the moral symptoms of a neurotic to their source in his life history: viz. the facts to transference and of resistance.

Freud. S, The History of the Psycho-analytic Movement, 1917, p. 9.

সেই সব আচরণের বিচার বিশ্লেষণও এমন ভাবে সাধিত হয়েছে, যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং মনঃসমীক্ষকও এ সকল আচরণের এরূপ ধারায় বিশ্লেষণে আপনা থেকেই প্রধাবিত হন। মোটের উপর মনঃসমীক্ষণ কালে যে আচার আচরণ ব্যক্তি করে থাকে তার অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ ফ্রয়েদ্ করেছিলেন। তবু এ আচরণ বিশ্লেষণ সর্বাংশে সত্য কিনা সে বিষয় সন্দেহ আছে। উদ্বায়ুরোগী এবং স্বাভাবিক **মনঃসমীক্ষনেচ্ছু ব্যক্তির আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েদ মূল তুটি সত্যের উদ্ভাবন করেন।**

(ক) অবদমন (Repression)

(খ) শৈশবকালীন যৌনতা (Infantile sexuality)

ফ্রয়েদ নিজেই বলেছেন যে, অবদমনের সিদ্ধান্ত ও অবদমনবাদকে কেন্দ্র করেই মনঃসমীক্ষণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ এ সিদ্ধান্তটি মনঃসমীক্ষণের অপরিহার্য অঙ্গ। যখন কোন উদ্বায়ু রোগীকে সংবিষ্ট না করে মুক্ত ভাবানুষঙ্গের মাধ্যমে মনঃসমীক্ষণ করা হয়, তখন মনঃসমীক্ষক ও রোগী অনুচ্চারিত যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়, তার আভিধানিক প্রকাশ 'অবদমন' শব্দের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। মনঃসমীক্ষণের সময় প্রত্যেকবারই এরূপ অভিজ্ঞতার উদ্ভব ঘটে। মনঃসমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে তখন একটা বাধা আসে, যে বাধা তাকে মন খুলে সব কথা বলতে দেয় না, যে বাধা স্মৃতি উদ্ধার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ফ্রয়েদ্ আরও একটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন—এ সিদ্ধান্তই বহু উদ্বায়ু রোগীর মনঃসমীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। এ সিদ্ধান্তে ফ্রয়েদ্ অবশ্য কিছুদিন পরে আসেন। এ সিদ্ধান্তটি হ'ল শৈশবকালীন যৌনতা। মনঃসমীক্ষণের সময় ফ্রয়েদ্ দেখলেন যে অব্যবহিত অতীতের কথা বলতে বলতে শৈশবের ও অতি শৈশবকালের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি স্মৃতি পথে ফিরিয়ে আনতে পারে ; এ সময়ে শৈশব ও অতি শৈশবকালীন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে ব্যক্তির কাল্পনিক অনেক অভিজ্ঞতার কথাও এসে পড়ে। মনেই যে আকাঙ্ক্ষার জন্ম, মনেই যার মৃত্যু, বাস্তব রূপায়ণের সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই, এমন শৈশবকালীন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিজনিত অভিজ্ঞতাও ব্যক্তির মনে আসে। এ সকল আকাঙ্ক্ষার সাথে আত্মরতি সংক্রান্ত ইচ্ছার সম্পর্ক আছে। এ সব আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি এমন যে এর মধ্যে যৌনতার সম্পর্ক আছে।

পরবর্তী কালে ফ্রয়েদ্ এর সত্যতা সম্বন্ধে আরও সুনিশ্চিত হন। অতি-শৈশবে শিশুদের আচার আচরণ প্রত্যক্ষ করে ও তার যথাযথ বিশ্লেষণ করে তিনি শৈশবকালীন যৌনতা বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসেন।

অবদমন ও শৈশবকালীন যৌনতা সম্বন্ধে ফ্রয়েদ্ যদিও মতবাদ বা সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ এনেছেন; তবু তিনি একে বাস্তব বিবর্জিত কেবল অনুমান নির্ভর কোন সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বস্তুতঃ এ দুটি সিদ্ধান্তই প্রত্যেক মনঃ-সমীক্ষকের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা গৃহীত। মনঃসমীক্ষণকালে রোগীর মুক্ত-ভাবানুষঙ্গে শৈশবকালীন যৌন অভিজ্ঞতার (বাস্তব বা কাল্পনিক) প্রতিভাস মেলে। মোটামুটি ভাবে এ দুটি সিদ্ধান্তকে এক করে আমরা যা পাই তাই হ'ল ফ্রয়েদ্ মনস্তত্ত্বের মূল কথা।[১]

অবদমিত শৈশবকালীন যৌনতা (Repressed Infantile sexuality):

তিনটি শব্দ 'অবদমিত' 'শৈশবকালীন' ও 'যৌনতা'—এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই তিনটি শব্দের কোনটি বাদ দিলে চলে না। **অবদমন, যৌন-ইচ্ছা' এবং শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা** এ তিনের তাৎপর্য্য

---

[১] The theory of repression is the main pillar upon which rests the edifice of psycho-analysis.. It is really the most essential part of it, and is itself nothing other than the theoretical expression of an experience which can be repeated at pleasure, whenever, one analyses a neurotic patient without the aid of hypnosis. One is then confronted with a resistance which opposes the analytic work by causing a failure of memory in order to block it…

Just such an acquisition… (a theoretical extract from very numerous experiences)…but of much later days is the theory of the infantile sexuality…At first it was only noticed that the effect of actual impressions had to be traced back to the past…The tracks led still further back into childhood and into its earliest years…to imaginary traumas… This was soon followed by the conviction that these phantasies serve to hide the auto-erotic activities of the early years of childhood…and now the whole sexual life of the child made its a appearance behind these phantasies.

Years later, my discoveries were successfully confirmed for the greater part by direct observation and analyses of children of very early years.

Freud. Op. Cit. p. p. 9.11

সম্বন্ধেই ফ্রয়েড সমধিক জোর দিয়েছেন—বস্তুতঃ ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্ত এ তিনটিই।

এটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ফ্রয়েড নিজেই বহুবার বলেছেন, তাঁর সিদ্ধান্তগুলি, মানসিক জীবনের সব দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেনি। মনোবিদ্যার অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি যে মনের দিকটাকে এড়িয়ে গিয়েছে, ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত মূলতঃ মনের সেই দিকেই আলোকপাত করেছে। ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত প্রধানতঃ স্বপ্ন, তথাকথিত অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তি এবং বিশেষ করে উদ্বায়ু রোগ সম্পর্কিত। **উদ্বায়ু রোগ শৈশবকালীন যৌনেচ্ছার অবদমন থেকেই উদ্ভূত হয়। ফ্রয়েডের এটাই মূল বক্তব্য, যে বক্তব্য থেকে ফ্রয়েডের নূতন বৈপ্লবিক মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা এসেছে। শৈশবকালের অবদমিত যৌনেচ্ছা যে কেবল উদ্বায়ু রোগীদের মধ্যেই থাকে তা নয়, এটা সকল ব্যাক্তির মধ্যেই কম বেশী থাকে।**

ফ্রয়েড্ যে পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং যে মূল সূত্রগুলিকে তিনি সিদ্ধান্তকরণে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোকে পর্যালোচনা করলে নূতন মনস্তাত্ত্বিক সংব্যাখ্যান সঠিকভাবে উপলব্ধ হতে পারে।

মূলতঃ ফ্রয়েড সাঁরকোর সিদ্ধান্তকেই প্রায় মেনে নিয়েছিলেন। তার উপর ভিত্তি করেই তিনি উদ্বায়ু রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন ও যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাকেই ফ্রয়েড তাঁর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি ও শাণিত মেধা দিয়ে কতকগুলি নীতিনির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত করে মূল্যবান কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রকৃতপক্ষে, ফ্রয়েড নূতন নূতন সিদ্ধান্ত বা অনুমানের অবতারণাতেই যেন বেশী মনোযোগ দিয়েছেন—অনুমানকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সাধারণ্যে বাস্তবায়িত করায় যেন তাঁর তেমন প্রয়াস ছিল না।

ফ্রয়েড্ তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে কতকগুলি সূত্র অনুসরণ করেছেন—একটি সূত্র হল (ক) যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতিই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে ধরে নিতে হবে। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ একটি বিশেষ কাজ করার স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছা না থাকে, ততক্ষণ সে কাজ করা উচিত নয় বা সামাজিক দিক থেকে বিধিবহির্ভূত, এরূপ প্রশ্নই আসে না। যে দিকে যত বেশী বিধি নিষেধ আরোপিত থাকে, সে দিকে ইচ্ছার তীক্ষ্ণতা যেন তত বেশী হয়। পিতাকে হত্যা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং এ বিষয়ে দণ্ডবিধিও অত্যন্ত কঠোর। এ দণ্ডবিধির কঠোরতা থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে, পিতাকে হত্যার এরূপ ইচ্ছা নিশ্চিত প্রবলভাবে মানবমনে

বিদ্যমান। অজাচার (Incest) অর্থাৎ নিকট আত্মীয় আত্মীয়ার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও সামাজিক দিক থেকে একটা গর্হিত কাজ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। ফ্রয়েড মনে করেন যে, ব্যক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব তীক্ষ্ণভাবে রয়েছে, এবং এইজন্যই একে রোধ করার জন্য সমাজে শাস্তির ভয় ও নিয়মনামা। মনের কোণে আদিম লুক্কায়িত ইচ্ছার অস্তিত্ব এইভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে এবং এইভাবেই গহন মনের মনস্তত্ত্বের সূচনা হয়।

ফ্রয়েডের কাছে আরও একটা নীতিসূত্র আছে, যা তাঁর সিদ্ধান্ত নিরূপণে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ নীতিসূত্রটি হ'ল এই যে মানুষ যাকে ভয় করে, তাকে বোধ হয় প্রত্যাশাও করে। কাউকে ভয় পাওয়া যেন তাকে পেতে চাওয়ারই নামান্তর। দুঃখকে ও আঘাতকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ আছে, কিন্তু অনেক সময় সভ্যজীবনে মানুষের মধ্যে যে ধরণের ভয় দেখতে পাওয়া যায়, তা প্রায়শঃই অদ্ভুত। বিশেষ করে উন্মায়ু রোগীদের ক্ষেত্রে যে সব ভয় দেখা যায় তারা আরও অদ্ভুত। আচরণবাদীরা এরূপ ভয়কে হয়তো বলবেন সাপেক্ষ প্রত্যাবর্ত ভয় (Conditoinel fear)। কিন্তু ফ্রয়েড্ মনে করেন যে, এ ভয় আর কিছুই নয়—সামাজিক ও আত্মিক দিক থেকে অনগ্রহণীয় ইচ্ছাকে ঢেকে রাখার জন্যই এ ভয়ের অবতারণা। ঠিক সেইরকম কোন ব্যক্তির কল্যাণ কামনাতে ও অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত দয়া দাক্ষিণ্য দেখানোর মধ্যে নির্জ্ঞান মনে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ ও তাকে ক্ষতি করার ইচ্ছাই লুক্কায়িত ভাবে কাজ করে।

ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্তঃ প্রেষণা (Motivation) ও গূঢ়ৈষাঃ (Complex)

মনঃসমীক্ষণ মতবাদের মূলভিত্তি

ফ্রয়েডের সমস্ত চিন্তাধারার পশ্চাতে মূল কয়েকটি সিদ্ধান্ত কাজ করেছে—এ সিদ্ধান্তগুলি থেকেই অন্যান্য ধারণাগুলো এসেছে। যদিও ফ্রয়েড্ নিজে 'অবদমনের' সিদ্ধান্তকেই মনঃসমীক্ষণের মূল চিন্তা-ভিত্তি বলেছিলেন একজায়গায়, তিনি নির্জ্ঞান মনের ধারণাকেও (যে নির্জ্ঞান মনের উৎপত্তি হয় অবদমন প্রক্রিয়া থেকে), মনঃসমীক্ষণ মতবাদ বা গহন মনের মনস্তত্ত্বের মূল ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন।

তাঁর প্রধান যে সিদ্ধান্ত তা হ'ল এই যে, প্রত্যেকটি চিন্তা, আচার আচরণ, গতি, ক্রিয়া প্রক্রিয়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার

মানসেই সর্বদা আমাদের কর্মপ্রয়াস। সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কখনো বা আমরা চেতন, কখনো বা আমরা চেতন থাকি না। প্রত্যক্ষভাবে ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঐচ্ছিক (Voluntary) যে ক্রিয়া কর্ম সেগুলো যেরূপ ব্যক্তির কোন না কোন ইচ্ছার পূরণ ঘটাচ্ছে, ঠিক তেমনি অনৈচ্ছিক (involuntary), হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ক্রিয়া কর্ম, (Accident Psychology of error) এমন কি ঐ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সব ক্রিয়াকর্ম ঘটে যায় তার মধ্য দিয়েও কোন না কোন ইচ্ছা পূরণ হয়। উদ্বায়ু রোগের কারণ বিশ্লেষণেও ফ্রয়েড্ এইরূপ মতের অবতারণা করেছেন। ম্যাকডুগালও (MC Dougall) বলেছেন যে পূর্বসূরীদের সাথে ফ্রয়েড উদ্বায়ু রোগের কারণ নির্ণয়ে একমত হতে পারেন নি। ফ্রয়েড উদ্বায়ু রোগের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রেষণার (Motivation) কথা তুলেছেন। ফ্রয়েডের পূর্বসূরী, এমন কি জ্যানে (Janet) উদ্বায়ুরোগ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এ রোগের উৎপত্তি হয় ব্যক্তির মানসিক দুর্বলতা থেকে। কিন্তু ফ্রয়েড্ বল্লেন যে, উদ্বায়ু রোগের উৎপত্তি হয় বাসনা ও তার অবদমন থেকে। উদ্বায়ু রোগ সংলক্ষণ কেবল মানসিক দুর্বলতার প্রকাশ নয়, বরং সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণের ভঙ্গিমা। বস্তুতঃ ফ্রয়েড্ বলেছেন যে, রুগ্ন ব্যক্তি যদি ভয় (Phobia) বা অসাড়তা (Paralysis) সংজ্ঞানে নাও চায়, নির্জ্ঞানভাবে নিশ্চয়ই সে এগুলো চায়। ফ্রয়েডের মতে সকল কর্মপ্রয়াসই হয় প্রত্যক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে আপন ইচ্ছা-পূরণের পথ মাত্র।

শারীরিক দিক থেকে কোন বিকৃতি বা বিচ্যুতি না থাকা সত্ত্বেও, কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি অন্ধতা, বধিরতা বা আর কোন অঙ্গের আড়ষ্টতা দেখা যায় তা হলে তা মানসিক ক্রিয়া বৈকল্যের জন্য হয়েছে বুঝতে হবে। ফ্রয়েডের মতে এরূপ দৈহিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার কোন ইচ্ছারই পূরণ করছে। এটা শুনতে কি রকম আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইচ্ছা করেও কোন ব্যক্তি এমন আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে, অন্ধ হয়ে যেতে পারে, বধির হয়ে যেতে পারে। এ ইচ্ছা আবার কি রকমের ইচ্ছা!—এ ইচ্ছার দ্বারা কোন্ ইচ্ছারই বা পূরণ হয়? এরকম নানা প্রশ্নই মনে উদিত হতে পারে। জ্যানের মতে মানসিক শক্তি স্বল্পতার জন্যেই এরকমটা হয়ে থাকে—চেতনার বিচ্ছিন্নতা (Splitting of Consciousness) থেকে এরকম হয়ে থাকে। চোখ বা পা'র সাথে যদি আবেগগত কোন দুঃসহ আঘাতের সংযোগ ঘটে ও ব্যক্তি যদি আপন অস্তিত্বের স্বাভাবিক মানসিক স্রোতোধারার সাথে এ আঘাতের সঙ্গতি রেখে চলতে না

পারে, তাহলে এ অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির মূল-অভিজ্ঞতার স্রোত থেকে দূরে সরে যায়। ফ্রয়েড্ এ সব সংলক্ষণের ভিন্ন ধারায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, আড়ষ্টতা বা অন্ধতা ব্যক্তির কোন জটিল অবস্থাকে এড়িয়ে যাবার একটা প্রয়াস হতে পারে ; একবার অক্ষম বা আড়ষ্ট হয়ে গেছি প্রতিপন্ন করতে পারলে কোন দায় দায়িত্ব তাকে আর ধরতে পারে না। ফ্রয়েড অবশ্য অতটা সোজাসুজি এরকম স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি। তিনি একটি যুবতীর পা'র আড়ষ্টতার প্রসঙ্গ উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরলেন। হিষ্টিরিয়ার ফলে যুবতীর একটি পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাবা অনেকদিন ধরে অসুখে ভুগছিলেন। বছর দুই আগে মেয়েটি তার বাবার অনেক দিন ধরে অত্যন্ত যত্নের সাথে শুশ্রূষা করেন। সে তার বাবাকে বিছানা থেকে তুলে নেওয়ার জন্য তার পা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করত। সেই সময়ে মেয়েটি কোন একজন যুবকের সাথে প্রেম-সূত্রে জড়িয়ে পড়েছিল এবং বিয়েরও প্রায় সব ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে বাবার অসুখে তার সব পণ্ড হয়ে গেল। তার বাবার প্রতি একান্ত অনুগত হয়েও মেয়েটি না ভেবে পারছিল না যে এ রোগ কোন না কোন ভাবে শেষ হবেই। চিন্তার মধ্যে পিতার মৃত্যু কামনাও কি ছিল? এরকম ইচ্ছা মনে উঁকি মারার সাথে সাথেই সে ইচ্ছার চেহারা দেখে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে মন থেকে সজোরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। সে যেন এ ইচ্ছা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল—সে এ ইচ্ছার 'অবদমন' করল। কিন্তু নির্জ্ঞান মনে এ ইচ্ছা তার শক্তি নিয়ে কাজ করে যেতে থাকল। মন থেকে মুছে ফেললেও ইচ্ছা মন থেকে মুছে যায় না। মনের এক কোণ থেকে আর এক গহণ কোণে গিয়ে বাসা বাঁধে, আর সেখান থেকেই সে ইচ্ছা তার সকল শক্তি দিয়ে চরিতার্থ হতে চায়। মেয়েটির ক্ষেত্রে তার অবদমিত ইচ্ছা চরিতার্থ হতে চাইল তার পাএর আড়ষ্টতার মধ্য দিয়ে। ফ্রয়েড্ এ প্রতিক্রিয়ার নামকরণ করলেন বিপরিণাম (Conversion)। 'বিপরিণাম' নাম দিলেন এইজন্য যে, নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাই এখানে শারীরিক রোগ লক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। এ নির্জ্ঞান ইচ্ছার মধ্যে একটা শক্তি থাকে—অবদমিত হলে ইচ্ছার এ শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু এ ইচ্ছা সরাসরি চরিতার্থ হতে পারে না, বিকৃত উপায়ে অভিশান্ত হয়ে (Displaced) এ ইচ্ছা তার মুক্তির পথ খোঁজে। **ফ্রয়েড্ মানসিক রোগের কারণকে প্রেষণা, নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা ও ইচ্ছার অবদমন প্রক্রিয়ার** মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড প্রেষণার অবতারণা করেছেন, অর্থাৎ মানসিক রোগে যে বিকৃত আপাত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচার-আচরণ পরিলক্ষিত হয় তার পিছনেও ব্যক্তির গহন মনের কোন ইচ্ছা কাজ করে। ব্যক্তির ইচ্ছা ভিন্ন কিছু সংঘটিত হয় না—ব্যক্তির ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটে। কখনো ব্যক্তি সে সম্বন্ধে অবহিত, কখনো বা অনবহিত থাকে।

মানুষ যে ভুলভ্রান্তি করে তার ব্যাখ্যাও ফ্রয়েড এ সিদ্ধান্ত দিয়েই করেছেন। কোন ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে সেও মনে করে, অন্যান্য ব্যক্তিরাও মনে করেন যে এটা হঠাৎ হয়ে গেল। এটা একটা আকস্মিক ঘটনা। এর কোন কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নেই। ফ্রয়েডের পূর্বে এরূপ ধারণা ছিল যে, "কাজের ভুল-ভ্রান্তির" মত "কথার ভুল" "লেখার ভুল" মনোবিদ্যার দিক থেকে মূল্যহীন। ফ্রয়েড প্রথম এ দিক বিচার বিশ্লেষণে মনোযোগ দিলেন —তিনি বল্লেন যে এসব তথাকথিত ভুল ভ্রান্তির পিছনে ব্যক্তির নির্জ্ঞান মন (Unconscious mind) কাজ করে। নির্জ্ঞান মনের-ইচ্ছাতেই এ সব 'আপাত অনিচ্ছাকৃত' ভুল ভ্রান্তিগুলি হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে ফ্রয়েড তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেন। এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বলছেন— "আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ যদি মারা যাই, তা হলে আমি কিন্তু প্যারী-সহরে গিয়ে বসবাস করব।" মন্তব্যটি একটু ভাল করে খতিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে প্রকৃত মনোভাবটি কি প্রকারের। ব্যক্তি তার স্ত্রীর মৃত্যুকামনা করছে—নির্জ্ঞান মনে তার এ ইচ্ছাটি কাজ করছে। হঠাৎ সে ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে পড়ল, তার এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-একজন মহিলা বলছেন, "আমার স্বামী আমার যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন"। চিকিৎসক প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বলেছিলেন যে তাঁর স্বামীর যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন। কিন্তু স্ত্রী ভুল করে তাঁর স্বামীর ওপর নিজের প্রভুত্বটিকে এই ভুলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে ফেললেন।

লেখার সময় যে'ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, তার ব্যাখ্যাও ফ্রয়েড অনুরূপ ভাবেই দিয়েছেন। যেখানে প্রক্ষোভের পটভূমি রয়েছে সেখানেই এরূপ ভুলভ্রান্তি ঘটে যেতে পারে। এই সব ছোটখাট ভুলভ্রান্তির এমনি যে খুব একটা তাৎপর্য্য আছে তা নয়, কিন্তু ফ্রয়েড বলেছেন যে এইসব ভুলভ্রান্তিতে নির্জ্ঞান মন যেভাবে কাজ করে, যে মানস প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়, মানসিক রোগ ও স্বপ্নের মানস প্রক্রিয়া পদ্ধতি প্রায় একই প্রকারের। এই একই প্রক্রিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপের

ক্ষেত্রেও প্রকটিত হয়। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যে কৌশলে প্রকাশিত হয় সেই কৌশলেই ব্যঙ্গবিদ্রূপের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। সংকোচন (Condensation) হল সুপ্ত নির্জ্ঞান ইচ্ছাকে (Latent content) প্রস্ফুটনের (manifest content) কৌশল প্রক্রিয়া। বিদ্রূপেও এর নজির দেখা যায়। স্বপ্নের মত, বিদ্রূপেও বিক্ষেপনের (Displacement) প্রক্রিয়া কাজ করে। বিক্ষেপনের ফলে আসল নকল, আর নকলটি আসল হয়ে যায়। যেমন এক ব্যক্তি একটা দুর্ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বল্লে, "গাড়ীর চালকটির ভাগ্য অত্যন্ত খারাপ ; দুর্ঘটনায় কেবল তার স্ত্রীপুত্রই যে মারা গেছে তা নয়, তার ঘড়িটি পর্য্যন্ত ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে"। এতে ঘড়িটির দাম স্ত্রীপুত্রের জীবন থেকে বেশী দাম পেয়ে গেছে—এতে ব্যক্তির নির্জ্ঞান ইচ্ছাই প্রকটিত হয়েছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপের সময় সর্বদাই নির্জ্ঞান মনের কোন ইচ্ছা চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। কিন্তু সে ইচ্ছা ঠিক তার রূপ নিয়ে আসে না—আসতে পারে না। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাকে সংজ্ঞান মনে আসতে না দেওয়ার জন্য প্রতিবন্ধ (Resistance) কাজ করে। এ প্রতিবন্ধ নির্জ্ঞান মনের মধ্যে রয়েছে। এই প্রতিবন্ধকে এড়াবার কৌশলের জন্যই স্বপ্নে, ভুল-ভ্রান্তিতে, ব্যঙ্গবিদ্রূপে, মানসিক রোগ সংলক্ষণে, প্রকৃত নির্জ্ঞান অবদমিত ইচ্ছার অন্য কৌশলে ও উপায়ে অভিব্যক্তি ঘটে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। একবার মুসোলিনী তাঁর সমর-শক্তিকে আরও বলশালী করার জন্য একজন প্রখ্যাত রসায়ণবিদকে ডেকে পাঠালেন। সে বৈজ্ঞানিকটি মুসোলিনীর গৃহে যাওয়ার সময় পথের দুদিকে মুসোলিনীর ছবি সারে সারে টাঙ্গানো রয়েছে দেখলেন। তিনি পথের সব লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে মুসোলীনি তাদের কাছে খুব ভয়ের পাত্র। অবশেষে তিনি মুসোলিনীর প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। প্রাসাদের অবসর কক্ষে বসে তিনি মুসোলিনীর নানা ভঙ্গিমার প্রতিকৃতি সংবাদপত্রে দেখতে পেলেন। অবশেষে মুসোলিনীর ঘরে রসায়ণবিদের ডাক পড়ল। প্রাসাদের এ ঘর ও ঘর পেরিয়ে অবশেষে তিনি মুসোলিনীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুসোলিনী তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একেবারে উদাসীন রইলেন। অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতিকে তিনি খেয়ালের মধ্যেই আনতে পারলেন না। রসায়ণবিদকে দেখে হঠাৎ মুসোলনী মুখ তুলে তাকালেন ; তারপর প্রশ্ন করলেন, "বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সবচেয়ে মারাত্মক গ্যাস কি ?"

রসায়নবিদ কিছুক্ষণ নীরব থেকে উত্তর দিলেন "Incense" (Incense এর মানে সুগন্ধি-ধূপ ও রেগে আগুন হওয়া দুইই হয়)।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে রসায়নবিদের মুসোলিনীর নিষেধ অমান্য করার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে। এতক্ষণ তাঁকে বসিয়ে রাখা, তাঁকে কোন প্রকার আমল না দিয়ে কথা বলার জন্য মুসোলিনীর প্রতি তাঁর যে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, সেটি সরাসরি প্রকাশ করার ক্ষমতা রসায়নবিদের ছিল না— সেইজন্য তিনি তাঁর ইচ্ছাটিকে অন্যপথে প্রকাশ করলেন। Incense শব্দটি ব্যবহার করে একাধারে তিনি মুসোলিনীকে ভক্তি ও আনুগত্য দেখালেন, অন্যদিকে ভর্ৎসনা করলেন। রসায়নবিদের অবদমিত ইচ্ছাটি সামাজিক ও প্রকাশযোগ্য উপায়ে চরিতার্থ হবার কৌশল। এইসব ঠাট্টাবিদ্রূপ যত মার্জিত হয় তার কৌশল প্রণালীও তত কঠিন হয়।

স্বপ্নই হোক, তথাকথিত ভুলভ্রান্তি, বিদ্রূপ, রোগ-লক্ষণ সবই ফ্রয়েডের মতে কার্য্য-কারণ সম্পর্কিত। হঠাৎ কিছু ঘটে না, বাস্তব জগতে যেমন সব কিছুর মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ সম্পর্ক আছে মনের জগতেও এই কার্য্য কারণ সম্পর্ক রয়েছে। Psychopathology of Everyday Life নামক গ্রন্থে ফ্রয়েড এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ভুলভ্রান্তি, বিদ্রূপ প্রভৃতির 'ইচ্ছাকৃত' কারণের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। পূর্বের মনোবিদরাও কথা ভুল করা, লেখায় ভুল করাকে, 'হঠাৎ' ছেড়ে যাওয়া, একটা আর একটার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, এক কথার পরিবর্তে আর একটি কথায় চলে আসা এবং মস্তিষ্কে অনুষঙ্গ-বন্ধ (Associative bond) শিথিল হয়ে যাওয়া প্রভৃতির অবতারণা করে ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েড্ এখানে একটা প্রশ্ন রেখেছেন। এ সব ভুলভ্রান্তি সব সময় হয় না কেন? কেনই বা এরা বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঘটে থাকে? ফ্রয়েড বল্লেন যে, তাঁর পূর্বসূরীরা এ সব ভুলভ্রান্তিকে নিছকই দৈব বলে ধরে নিয়েছেন, ভেবে নিয়েছেন যে এর কোন কারণ নেই। কিন্তু ফ্রয়েড বল্লেন যে, মানসিক জগতেও, বাইরের জগতের মতই প্রত্যেকটি ঘটনার একটি কারণ আছে, প্রত্যেকটি আচরণের পিছনে একটি কারণ থাকে। তিনি বহু ঘটনা বিশ্লেষণ করে ভুলভ্রান্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, প্রত্যেকটি তথাকথিত ভুল, ভুলে যাওয়ার পিছনে ব্যক্তির কোন ইচ্ছা-পূরণের প্রয়াস থাকে।

ফ্রয়েডের নিজের জীবনের একটি ঘটনা। মনঃসমীক্ষকের জীবনের প্রথম

দিকে তার চিকিৎসাধীন বিশেষ কোন একজন রোগীর নাম তিনি ভুলে গিয়েছিলেন—বহু চেষ্টা করেও তিনি তার নাম মনে আনতে পারতেন না। সে রোগীটিকে কিন্তু ফ্রয়েড বহুকাল চিকিৎসা করেছেন—এ সত্ত্বেও তিনি রোগীটির নাম ভুলে গিয়েছিলেন। এ রকম ভুলে যাওয়াটা ফ্রয়েডের কাছে খুব আশ্চর্য্য ঠেকল। পরে তিনি দেখলেন যে, রোগীটির সম্বন্ধে একটা মস্ত ভুল তিনি করে ফেলেছিলেন। রোগীটি যখন সত্যি সত্যি পেটের ঘা'র অসুখে ভুগছিলেন, তখন তাঁকে উদ্বায়ু-রোগে ভুগছিলেন বলে ফ্রয়েড সাব্যস্ত করে বসে ছিলেন। এ রকম একটা মারাত্মক ভুল ফ্রয়েড তাঁর মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছেন এবং সেই জন্যই তিনি কি তার রোগীটির নাম ভুলে গিয়েছিলেন? ফ্রয়েড বলছেন যে এরকম ভুলে যাওয়ার পিছনে সর্বদাই একটা ইচ্ছা কাজ করে। ফ্রয়েড অবশ্য এ কথা বলেন নি যে, আমাদের সব ভুলে যাওয়ার পিছনেই কেবল এ রকম প্রক্রিয়াই কাজ করে। তবে তিনি বলেছেন যে, যা কিছু আমরা জানি, যা কিছু একবার আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে, তার সবটা কোন ক্রমেই আমাদের মনে থেকে একেবারে মুছে যায় না; এরা এমনভাবে মনের গহনে নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত থাকে যে ইচ্ছা করলেও এদের আর মনের চেতন কোণে ফিরিয়ে আনা যায় না।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ—

ফ্রয়েড তাঁর "The Interpretation of dreams" গ্রন্থে স্বপ্ন বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে, স্বপ্নের সাথে ব্যক্তির মানসিক যোগসূত্র কোথায়, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের গতি-প্রকৃতি কি ভাবে জানা যায় এ সকল বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পূর্বে স্বপ্ন সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, স্বপ্ন ভবিষ্যতের নিশানা দেয়, কিন্তু ফ্রয়েড বল্লেন স্বপ্ন ব্যক্তির অতীতকে উন্মীলিত করে। পূর্বের মনোবিদরা স্বপ্নকে কতকগুলি ছিন্ন অনুষঙ্গের বিকৃত অনুলিপি বলে মনে করতেন। তাঁরা বস্তুতঃ, কোন ব্যক্তি বিশেষ ধরনের স্বপ্ন দেখে কেন, বা কোন ব্যক্তি স্বপ্নে 'ক' না দেখে 'খ' দেখল কেন, এ সব প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনাই করেন নি, এ সব ব্যাপারকে তাঁরা কিছুটা আকস্মিকতার উপর ছেড়ে দিতেন। কিন্তু ফ্রয়েড এদের ব্যাখ্যা অন্য পটভূমি থেকে দিলেন। শিশুরা তাদের জাগ্রত অবস্থায় যা চেয়ে পায় না, সেইটিকেই স্বপ্নে দেখে। জাগ্রত অবস্থায় তাদের আকাজ্ক্ষার রূপই স্বপ্নের মধ্যে ফুটে উঠে। বড়দের ক্ষেত্রেও

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অতৃপ্ত অবদমিত ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটে ; কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে যেরকম অতৃপ্ত বসানা স্পষ্ট ও সোজাসুজিভাবে স্বপ্নে প্রতীত হয় বড়দের বেলায় আকাঙ্ক্ষাটি এমন আড়ালে আবডালে থাকে যে, স্বপ্ন থেকে সে বাসনাটিকে চেনা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকার প্রতীকের মাধ্যমে অবদমিত ইচ্ছাটি স্বপ্নের মধ্যে চরিতার্থ হতে চায়। ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে তার ইচ্ছা-পূরণ ঘটায়। নানাপ্রকার অসামাজিক ইচ্ছা স্বপ্নে চরিতার্থতা লাভের প্রয়াস করে। নিদ্রাকালে মনের প্রহরী (Censor) কিঞ্চিৎ অসতর্ক হয়ে পড়ে এবং সেই অবকাশে অবদমিত ইচ্ছা ছদ্মবেশে ও প্রতীকের সাহায্যে সংজ্ঞানে এসে উপস্থিত হয়। **আমাদের যে সকল বাসনা পূর্ণ হয়নি বা যাদের পূর্ণ হবার পথে বাধা আছে, সেই সব ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ইচ্ছা বা চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকলে মনে যে অশান্তির উদয় হয়, স্বপ্নে কল্পনার সাহায্যে তারই শান্তি হয়। মনের অশান্তি দূর করে বলে স্বপ্ন নিদ্রার সহায়। ফ্রয়েড তাই স্বপ্নকে guardian of sleep বা নিদ্রারক্ষক বলেছেন।** সাধারণের ধারণা, স্বপ্ন দেখলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় কিন্তু ফ্রয়েডের মত ঠিক বিপরীত। তিনি বলেন, নিদ্রার বিঘ্ন হলে স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, আর এই স্বপ্ন দেখার ফলে নিদ্রা অনেক স্থলে সম্ভব হয়।" স্বপ্নে ব্যক্তি যা দেখে, ('Manifest content ', সেটা আসলে, ব্যক্তির যে অবদমিত নির্জ্ঞান বাসনা (Latent content), তার-ই ছদ্মবেশী প্রতিফলন। স্বপ্নের স্ফুটাংশের (Manifest content) মুক্ত-ভাবানুষঙ্গের মধ্য দিয়ে অস্ফুট অতৃপ্ত ইচ্ছাটির স্বরূপ আবিষ্কার করা যায়। স্বপ্নের কোরকে যে অবদমিত ইচ্ছাটি থাকে, তা যদি সরাসরি সংজ্ঞানে আসে, তা হলে সেটা ব্যক্তির কাছে ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক করে। যে মুহূর্তে এ ইচ্ছা সংজ্ঞানে আসার প্রয়াস করে, নির্জ্ঞান মনস্থিত প্রহরী (Censor) এর প্রয়াসকে প্রতিহত করে এবং পুনরায় নির্জ্ঞানে ফিরিয়ে দেয়। নিদ্রাকালে অস্ফুট বাসনার সংজ্ঞানে আসার সুযোগ বেশী ঘটে, কেন না মন তখন ততটা সক্রিয় থাকে না। নির্জ্ঞান মন যতটা সক্রিয় থাকে ততটাই অস্ফুট বাসনার সংজ্ঞানে আগমনকে বাধা দেয় এবং ছদ্মবেশে প্রহরীকে (Censor) ফাঁকি দিয়ে সংজ্ঞানে আসে।

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব থেকেও দেখছি যে ফ্রয়েড এর পিছনে প্রেষণার কথা এনেছেন। স্বপ্নের সাথেও ব্যক্তির ইচ্ছার (নির্জ্ঞান অবদমিত) সম্পর্ক রয়েছে। পরীক্ষণপদ্ধতিভিত্তিক মনস্তত্ত্বের দ্বারা মনোবিদরা যে ভাবে স্মৃতি,

স্বপ্ন, চিন্তন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, ফ্রয়েডের নিকট তার তেমন বৈজ্ঞানিক মূল্য ছিল না। তিনি দেখলেন যে, এঁদের যা সিদ্ধান্ত তাতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, মানসিক ঘটনা কারণ ছাড়াই ঘটে—এটা যেন হঠাৎ খেয়ালখুশীমত ঘটে যায়। ফ্রায়ডের এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, পরীক্ষণসাপেক্ষে মনোবিদরাও কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতেই চেয়েছিলেন। ফ্রয়েডের ক্ষেত্রে যেটা নূতন দিক সেটা হ'ল এই যে, তিনি কারণ বলতে মানসিক দিক থেকে সর্বদাই একটা 'ইচ্ছাকে' মনে করেছেন। তাঁর মতে **মানসিক পর্য্যায়ে যা ঘটে তার কারণ সর্বদাই মানসিক, এবং মানসিক কারণ বলতে ফ্রয়েড সর্বদাই ইচ্ছা বা প্রেষণা বুঝিয়েছেন**। মস্তিষ্কের জৈবিক কার্য্য-কারিতা দিয়ে কিংবা কেবল অনুবন্ধ অনুষঙ্গ (Association) দিয়ে সকল মানসিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসের মধ্যে. যথার্থ মনস্তাত্বিক কারণটিকেই বাদ দেওয়া হয়। তাঁর মতে স্বপ্ন বা ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপ মানসিক ক্রিয়াকর্ম এবং এর মধ্য দিয়েও ঐচ্ছিক কার্য্যে যেরূপ ইচ্ছার চরিতার্থতা ঘটে, সেইরূপ নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছার চরিতার্থতা ঘটে।

অতএব, আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ফ্রয়েড যদিও বলেছেন যে 'অবদমনই' তাঁর মৌল মতবাদ যাকে কেন্দ্র করে তাঁর অপর সকল মতামত শাখায়িত হয়েছে, তবু দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মানসিক কার্য্যেরই মানসিক একটি কারণ আছে। প্রত্যেক মানসিক কার্য্যই প্রেষণা-প্রসূত কোন ইচ্ছার দ্বারা উৎসারিত—এ সিদ্ধান্তগুলি যেন ফ্রয়েডের কাছে আরও বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

অবদমন :—

মনঃসমীক্ষণের সময়, মনঃসমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে যে বাধো বাধো ভাব কাজ করে, মনের কথা খুলে বলতে গিয়েও সে ভিতরের যে বাধা ভয় অনুভব করে (Resistance), সেই ঘটনার তত্ত্বগত প্রকাশই 'অবদমন' শব্দটির মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। ব্যক্তি অনেক কথা এই সময়ে বলতে গিয়ে বলতে পারে না, অতীতের অনেক কথা মনে করেও মনে করতে পারে না। অন্যান্য মনোবিদগণ একে মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ (Associative) প্রক্রিয়ায় কোন প্রতিবন্ধের থেকে উদ্ভূত বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্রয়েড এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন। ফ্রয়েডের মতে. অতীতের কিছু কিছু মনে করতে না পারাটা

ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—প্রেষণাবদ্ধ। এরূপ মনে করতে না পারার ঘটনাই 'প্রতিবন্ধ' (Resistance) আর প্রতিবন্ধ থাকা মানেই পূর্বের কোন অবদমনের ইঙ্গিত দেয়।

অতীত অভিজ্ঞতা—শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার গুরুত্ব—

ফ্রয়েডে্র আরও একটি মূল সিদ্ধান্ত এই যে, রোগের কারণ অর্থাৎ 'ইচ্ছা'র সূত্রগুলি অতীতের ঘটনার মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে—এমন কি স্বপ্ন, বিদ্রূপ বা কোন ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে যে **ইচ্ছার পূরণ প্রয়াস** ব্যক্ত হয়ে থাকে, সেটাও **অতীতের কোন ইচ্ছা**। এই সূত্রকে ধরেই ফ্রয়েড্ অব্যবহিত অতীত থেকে শৈশবজীবনের অভিজ্ঞতায় চলে যান। এতে নূতন চিন্তার কি আছে? প্রত্যেকেই এটা জানেন যে বর্তমান সর্বদাই অতীতের অভিজ্ঞতা ও কর্মের ফলশ্রুতি। ফ্রয়েডের এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ ও এ বিষয়ে স্বাভাবিক ধারণা থেকে কিছুটা ভিন্নতর। তিনি বলছেন যা অতীতে ঘটে তার একটা নিষ্ক্রিয় ছাপই যে কেবল মনের মধ্যে থাকে তা নয়, সে অভিজ্ঞতা সক্রিয় থাকে এবং স্বপ্নের অস্ফুট অংশের মধ্য দিয়ে ও অন্যবিধ উপায়ে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসলেন যে ইচ্ছার মৃত্যু হয় না। কোন ইচ্ছা যদি একবার সক্রিয় হয়, তা হলে সেটা ব্যক্তির মনের মধ্যে অগোচরে কাজ করে যেতে থাকে।

মনঃসমীক্ষণে সংক্রমণের (Transference) ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রোগীর মনঃসমীক্ষকের প্রতি সদর্থক (Positive) বা নঞর্থক (Negative) প্রক্ষোভগত প্রতিন্যাসই সংক্রমণ। ফ্রয়েডের কাছে এ সংক্রমণের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। অতীতের ইচ্ছা মরে যায় না। এ ইচ্ছার মধ্যে শৈশবকালের ইচ্ছারাও আছে। শৈশবকালীন ইচ্ছারা, সংক্রমণের সময় সক্রিয় হয়ে ওঠার একটা উপযুক্ত অবস্থা ফিরে পায়। মনঃসমীক্ষকের প্রতি ব্যক্তির যে প্রক্ষোভগত ভাব তার মধ্যে একটা নির্ভরশীল অসহায় ভাব কাজ করে। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষকের মধ্যে সে তার শৈশবকালীন ইচ্ছা (যে ইচ্ছারা শৈশবকাল থেকে এখন পর্য্যন্ত ব্যক্তির মধ্যে ভিতরে ভিতরে সক্রিয় ছিল) চরিতার্থ করার একটা অবকাশ যেন পায়। মনঃসমীক্ষকের মধ্যে ব্যক্তি তার পিতাকে দেখতে চায়, দেখতে পায়। এ সময়ে 'পিতৃ-সম' মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে তার অনেক শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে, শৈশব-কালীন অনেক পুঞ্জীত আবেগের প্রকাশ ঘটে।

এ থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, মনঃসমীক্ষণের সংক্রমণের ঘটনাকে যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এটা মেনে নিতে হয় যে, কতকগুলি ইচ্ছা ও অবস্থার কথা ব্যক্তির মনে সর্বদা সক্রিয় থাকে—সে ইচ্ছা যত অতীতের-ই হোক তা মরে যায় না। (Psycho Dynamics of the Unconscious)।

ব্যক্তির সহজাত দ্বৈততা (Assumption of the Inherent dualism of the Individual)

'অবদমিত' 'শৈশবকালীন' 'যৌনতা' –এ শব্দ তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মূল তিনটি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে। অবদমনের ধারণার অন্তরালে সর্বজনীন ভাবে ইচ্ছার অগোচর নিয়ত সক্রিয়তার ধারণা রয়েছে এবং তিনি শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার কার্য্যকারিতার অবতারণা করে ইচ্ছার নিয়ত সক্রিয়তা, অবদমন ও তজ্জনিত গূঢ়ৈষা বা মানসিক জটের প্রসঙ্গ এনেছেন।

শৈশবকালীন যৌনতা বলতে বস্তুতঃ ফ্রয়েড্ কি বলতে চেয়েছেন ? আঙ্গুল চোষার মধ্য দিয়ে শিশু 'যৌন স্থখ' আহরণ করে, এরূপ ফ্রয়েড্ বলেছেন। শিশু যে ভাবে মাতৃস্তন কামড়ায় এবং তাকে মুখের মধ্যে নিয়ে যায়, তার প্রত্যেকটি ক্রিয়ার মধ্যেই 'যৌন স্থখ' আহরণের প্রয়াস রয়েছে। মলমূত্র পরিত্যাগ করা ও সারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শিত ও আন্দোলিত হওয়ার মধ্য দিয়েও শিশুর 'কাম পিপাসা' পরিতৃপ্ত হয়। ফ্রয়েডের মতে শিশুকে স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে যা কিছু দেহগত সাংবেদনিক (Sensuous) স্থখ দেয়, তার মধ্যেই 'যৌন-স্থখ' থাকে। পরবর্ত্তী জীবন অধ্যায়ে ব্যক্তির যে কোন ভালবাসা-বন্ধুত্ব শিল্প ও সংগীতপ্রীতি সবকিছুর মধ্যেই ফ্রয়েডের মতে 'যৌন-স্থখ' নিহিত থাকে। যা কিছু করতে আমরা ভালবাসি সব কিছুর মূলেই রয়েছে কামবেগ (Sex-impulse)। বৃহত্তরভাবে ফ্রয়েড যৌনতাকে 'ভালবাসা'র সমার্থক বলে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েড বলেছেন যে, ভালবাসা যৌনতা বিবর্জিত কিছু এরূপ ভাবা চলে না। স্নেহ ভালবাসা বস্তুতঃই 'যৌনমূলক', সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আঙ্গুল চোষাও তাকে স্বল্প পরিসরে যৌন স্থখ দিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের যৌনতার ধারণা একদিকে ঘনিষ্ঠভাবে যৌনোৎসারিত অথচ বৃহত্তর তাৎপর্য মণ্ডিত—এর মধ্যে তিনি কোন স্ববিরোধিতা খুঁজে পান নি।

ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির মানসিক জীবনে একটা দ্বৈততা আছে। মানুষের মনের তিনি দুটি স্তরের কথা বলেছেন—চেতন (Conscious) ও নির্জ্ঞান (Unconscious)। তিনি মনের প্রাকচেতন (Preconscious) অংশের

কথাও বলেছেন। প্রাকচেতন চেতন মনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাকচেতন মনের অভিজ্ঞতাকে চেতন মনে ইচ্ছা করলেই ফিরিয়ে আনা যায়; যদিও প্রাকচেতন মনের অভিজ্ঞতা ঠিক চেতন মনের অভিজ্ঞতার সাথে অব্যবহিতভাবে সংযুক্ত নয়। যে সব অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছা অবদমিত হয়, সেগুলোই নির্জ্ঞান মনে থাকে। চেতন মন ও নির্জ্ঞান মন মনের দুটি বিপরীতমুখী দিক। মনের একটি দিক বাস্তবধর্মী, অপরটি সুখান্বেষী। শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও তাৎক্ষণিক সুখের জন্য যা করে সেটা মনের একটি দিক; আর একটি দিকে বাস্তব প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে চলতে চায়। মনের দুটি দিক, দুটি বিপরীতধর্মী এষণা দ্বারা চালিত হয়—একদিকে থাকে তাৎক্ষণিক সুখান্বেষণ (Pleasure Principle) আর একদিকে থাকে বাস্তবধর্মীতা (Reality Principle)।

সাহজিক ভাবে মানুষ সুখান্বেষণের আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয়; সে তাৎক্ষণিক সুখ বা আরাম চায়। কিন্তু সে বাস্তবের দ্বারা, সামাজিক ভৌতিক ও পারিবেশিক প্রতিবন্ধের দ্বারা প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হয়—তার সকল ইচ্ছা পরিপূরণে বাধা আসে। যে সুখপ্রত্যাশা পরিণামে দুঃখ আনে, তাকে হয় সে পরিত্যাগ করার প্রয়াস করে, নয় বৃহত্তর ও সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্তির আশায় তাৎক্ষণিক সুখ-প্রাপ্তিকে সাময়িক ভাবে ত্যাগ করে। এ দ্বৈততা প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তির সাথে পরিবেশের। শিশু প্রথম কেবল সুখান্বেষণের প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তার মধ্যে বাস্তব জগতের বাধা নিষেধের কোন জ্ঞান থাকে না। ধীরে ধীরে বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে সে অনেক কিছু শেখে—পরিবেশের নিয়ম, অনুশাসনকে নিজের মধ্যে ধারণ করার প্রয়াস করে। সামাজিক ও ভৌতিক নিয়ম ও অনুশাসনকে সে যেন নিজের মধ্যে গ্রথিত করে নেয়, ধীরে ধীরে তার মধ্যে একটা শক্তি বা মানসপ্রকৃতি গড়ে ওঠে, যা তাৎক্ষণিক সুখ প্রাপ্তির স্পৃহাকে সংযত করতে পারে।

সৃজনেষণা (Eros) ও মরণেষণা (Thanatos)-র ধারণা (Concept of Eros and Thanatos)

ফ্রয়েড দিবাস্বপ্ন এবং নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে সুখান্বেষণের সূত্র অনুসরণ করেন, কিন্তু ব্যক্তির জাগর জীবন বাস্তবতার সূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দ্বৈততা বক্তির সাথে পরিবেশের। কিন্তু পরিবেশের অনুশাসন ও বিধি নিয়ম ব্যক্তি নিজের মধ্যে অনেক পরিমাণে যেন আত্মসাৎ করে নেয়। এই

বাস্তব সত্তা, যেহেতু ব্যক্তির মধ্যে আত্মস্থ থাকে, সেই হেতু তার বাস্তব সত্তার প্রেষণা-গতিবেগ কামশক্তির (libido) সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী না হয়ে বরং অনেকটা কামশক্তির অধীন, কামশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদিক থেকে, ফ্রয়েডের দ্বৈততার নীতি এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

তাছাড়া, বহু ব্যক্তি আছে যারা নিজেদের অত্যন্ত ভালবাসে। এ অবস্থাকে বলা হয় স্বকাম (Narcissism)। শিশুদের মধ্যেও প্রাথমিক স্তরের স্বকাম পরিলক্ষিত হয়। পরিজন ও বাইরের ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসা যায় বা এ থেকে যে সুখ পাওয়া যায় এ বোধের উন্মেষ যখন সঠিক ভাবে শিশুর মধ্যে হয় না, তখন স্বকামের মধ্য দিয়েই সে তার সুখস্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করে। তাছাড়া, শিশু যখন তার অভিপ্রেত ভালবাসার জনদের কারও কাছ থেকে অনীহা ও আঘাত পায়, তখন সে নিজেকে 'নিজের মধ্যে' গুটিয়ে নেয় অর্থাৎ কামশক্তিকে (Libido) অহমে আবদ্ধ করে রাখে। এ ভাবে আপন অহমও (Ego) যদি প্রেম-পাত্র (Love-object) হতে পারে, তাহলে অহমও অংশত কামশক্তিরই অন্তর্ভূক্ত, এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

আত্মরক্ষাকারী অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে পূর্বে কামশক্তির (libido) বিপরীত ধর্মী বলে মনে করা হত। এরা সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী না হলেও কামশক্তির কাছে এরা নিশ্চয়ই কিছুটা ভিন্নজাতীয়। কেননা এরা ব্যক্তির একান্ত প্রিয় বস্তু অহমকে রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলি ভিন্নজাতীয় হলেও এরা সমষ্টিগতভাবে কামশক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এটা আর বলা চলে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলিও কিয়দংশে কামশক্তির অন্তর্ভূক্ত। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা পরিব্যাপ্ত কামশক্তিকে ফ্রয়েড বলেছেন জীবনেষণা (Eros বা Life-instinct)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই জীবনেষণার মধ্যেই কি আর যা কিছু ব্যক্তির ইচ্ছা তা নিহিত থাকে, না এর বিপরীতমুখী আর কোন ইচ্ছা রয়েছে, যার দ্বারা ফ্রয়েডের দ্বৈততার ধারণা প্রমাণিত হতে পারে। ফ্রয়েড বল্লেন, জীবনেষণার ঠিক বিপরীতমুখী আরও একটি ইচ্ছা

আছে, তার নাম দিয়েছেন তিনি মরণেষণা (Death instinct)। মানুষের মধ্যে যে আত্মহত্যা, আত্মনিপীড়ন, ধ্বংসাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, এগুলিই মরণেষণার দ্যোতক। তাছাড়া ফ্রয়েড দেখালেন, প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যেই যেন জীবন মৃত্যু একসঙ্গে খেলা করছে। অবশ্য জনন-কোষের মৃত্যু নেই এটা যেন পরিপূর্ণরূপে জীবণেষণার ধারক। একদিকে জীবন আর অপরদিকে মৃত্যু। দুটি বিপরীতমুখী দিক। মরণেষণা যখন বহির্মুখী হয়ে ওঠে তখন তা সব কিছু চূর্ণ করে, অপরের প্রতি নির্মম আচরণ করে, অপরকে হত্যা করে; আর তা যখন অন্তর্মুখী হয় তখন তা আত্মহনন, নিপীড়িনের রূপ নেয়।

নির্জ্ঞান মনের স্বরূপ : ফ্রয়েডের মত

Development of Mind and Freud's account of Instincts and Libidinal development

ফ্রয়েড মনের চেতনা ও নির্জ্ঞানের দ্বৈততাকেও পুনর্বিবেচনা করেন। প্রথমদিকে ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে, অহম্ সত্তা (Ego) সম্পূর্ণরূপে চেতন।' এবং এই চেতন মনের কাছে যে সব ইচ্ছা অপ্রীতিকর ও অগ্রহণযোগ্য, অহম তাদের বাধা দিয়ে নির্জ্ঞানে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যেসব রোগী মনঃসমীক্ষণ করেন তাঁরা কেউ মনঃসমীক্ষণের সময় তাঁদের বাধা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না। এই সব বাধা চেতন মনের বাধা নয়, চেতনভাবে এরা অবাধে অতীত অভিজ্ঞতাকে মনে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কোন বাধা দেয় না। অতএব এ বাধা নির্জ্ঞান, এবং নিঃসন্দেহে এ বাধা থেকেই অবদমন ঘটে। অহম্, অবদমন ও বাধাপ্রদান ক্রিয়াতে নির্জ্ঞানভাবে কাজ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে অহমের কিয়দংশ চেতন এবং কিয়দংশ নির্জ্ঞান। অহমের চেতন দিক পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। অহম্ তার ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়ে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং অঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের দ্বারা তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে চেষ্টা করে, চেতন বেদনা বা সুখ প্রাণীর ভিতরের অঙ্গাদি (Organs) ও নির্জ্ঞান মনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও অন্তরস্থিত মন বেশীর ভাগই নির্জ্ঞানস্তরীয়। নির্জ্ঞান মনে সদাসক্রিয় প্রবৃত্তিনিচয় এবং যন্ত্রণার উদ্রেককারী বিশেষ বিশেষ অবদমিত কামনা বাসনা ও অভিজ্ঞতা বিরাজ করে। এক্ষেত্রে দ্বৈততা হ'ল একদিকে মনের উপরের স্তর, যে স্তর পরিবেশের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং অন্যদিকে মনের অন্তঃস্থিত স্তর, যার সাথে সরাসরি স্পষ্ট পরিবেশের

কোন সম্বন্ধই নেই। এই অন্তঃস্থিত মনের স্তরকে ফ্রয়েড নামকরণ করেছেন Id ইড্ বা অদস্। মনের অহম বা Ego পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বটে কিন্তু এ স্তরের উদ্ভব হয়েছে অদস্ (Id) থেকেই। অহমের এ অংশটি নির্জ্ঞান।

ইদ্-এর মধ্যে আছে প্রাবৃত্তিক তাড়ন শক্তি যার মধ্যে জীবণেষণা (Life instincts) ও মরণেষণা (Death instincts) দুইই বর্তমান রয়েছে, যা থেকে ব্যক্তির ইচ্ছাগুলি রূপ নেয় এবং পরিবেশের দিকে প্রধাবিত হয় ; চেতন মনকে আন্দোলিত করে। যখনই এ ইচ্ছাগুলির কোন একটি অহম দ্বারা অবদমিত হয়, তখন সে ইচ্ছাগুলি ইদ্ বা অদসে ফিরে যায়। অহম সত্তা সর্বদা একদিকে বাস্তব জগতের দাবী ও অন্যদিকে অদসের প্রবৃত্তিগত বাসনার
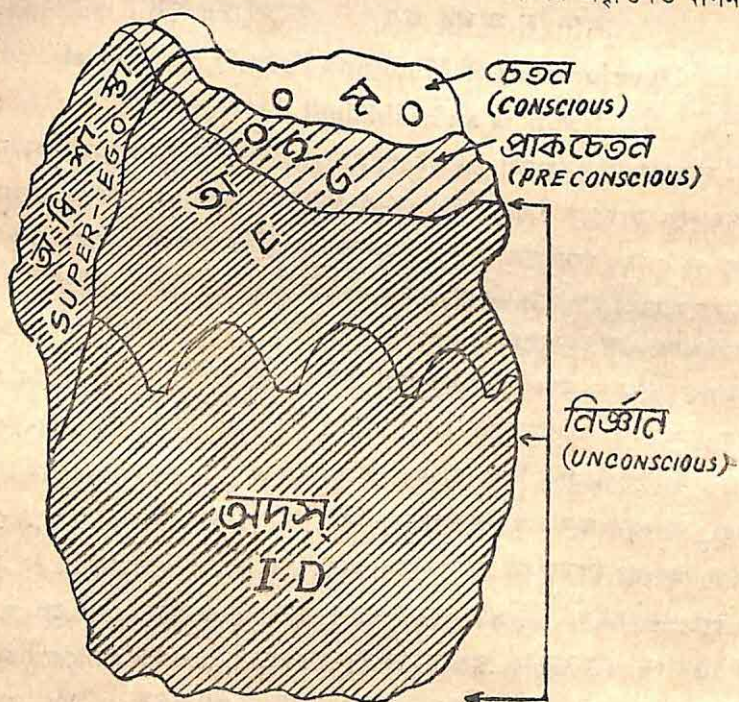
দাবীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য মধ্যস্থতা করে।[১] অদস যাতে বাস্তব জগতের দাবীর সাথে মানিয়ে চলে, অহম তার প্রয়াস করে। অদস অন্ধভাবে কেবল

১The ego tries to mediate between the world and the id, to make the Id comply with the world's demands and, by means of muscular activiiy, to accommodate the world to the Id's desires.

Freud, S.: The Ego and the Id. 1927, P 83.

সুখান্বেষণ করে (Pleasure Principle), কিন্তু জীবনে সর্বদা সুখান্বেষণ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা যায় না। অদসকে অহমের মাধ্যমেই চলতে হয়। অহমকে বাস্তব জীবনের সাথে চলতে গিয়ে বাস্তব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় এবং বাস্তবাদর্শ (reality principle) মেনে চলতে হয়।

অহম জীবনের প্রথম দিকে অত্যন্ত অপুষ্ট ও দুর্বল থাকে; স্বভাবতঃই অদসের নির্দেশে চলতে গিয়ে অহমকে নানারূপ বাধা বিপত্তি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। অহম এ সময়ে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে যা বাস্তব পরিবেশ মঞ্জুর করতে পারে না। যখন অহমকে তার কোন প্রিয়-বস্তু ত্যাগ করতে হয়, তখন তার মনের মধ্যে তার একটা প্রতিচ্ছবি (Image) থেকে যায় এবং মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবিটিকেই বস্তুর পরিবর্ত্ত হিসাবে আঁকড়ে ধরে, এবং এইভাবে সেইসব পরিত্যক্ত বস্তু ও অবস্থার চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। অহমের বিকাশ ও বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হতে থাকে। অহম যদি ঠিকভাবে বিকাশ লাভ করে, তা'হলে এর মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি দেখা যায় এবং পরিবেশের সাথে এর যথার্থ সঙ্গতি থাকে। অদস সর্বদাই আদিম ও এলোমেলো ; এর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যই এই।

অদস ও অহমের মধ্যে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব হয়, একে বলা হয় অধিশাস্তা (Super Ego)। আমরা বিবেক বলতে যা বুঝি মোটামুটিভাবে অধিশাস্তা তাই। মনঃসমীক্ষণের সময় রোগীর মধ্যে যে পাপবোধ পরিলক্ষিত হয়, তা থেকেই মনঃসমীক্ষক মনের এ সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন। অধিশাস্তার মধ্যে অনেক বিধি নিষেধ থাকে—'এটা করবে' 'এটা করবে না'—এ রকম সব বিধি নিষেধ অধিশাস্তা অহমের উপর আরোপ করে। এসব বিধি নিষেধ যে সর্বদা বাস্তবানুগ তা নয়, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারেও যে এরা সর্বদা সাহায্য করে তা নয়। এসব বিধি নিষেধের উদ্ভব হয় অন্তর্জগত থেকে, **অহম ও অদসের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে।** পরিবেশের সাথে যুঝতে গিয়ে অহম যদিও সকল স্তরের প্রাণীর মধ্যেই অল্পবিস্তর গড়ে ওঠে, **অধিশাস্তা কিন্তু কেবল মানুষের মধ্যেই থাকে।** অধিশাস্তা মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠার কারণ (ক) মানব শিশুর সমাজ আরোপিত বিধি নিষেধের মধ্য দিয়ে শৈশবকাল যাপন এবং (খ) একমাত্র মানুষকেই জন্মকাল থেকে বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্যন্ত যথাযথ যৌনজীবনের উদ্দেশ্য রূপায়ণের মধ্যে অর্থাৎ সামাজিক দিক থেকে রীতিসিদ্ধ যৌনজীবন আরম্ভ হওয়ার কালের মধ্যে অনেকটা সময় অতিবাহিত করতে হয়।

অধিশাস্তা আদিমকালের মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি হয় এবং এর আদিরূপের ক্ষুদ্রাংশ বংশানুক্রমে ব্যক্তির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু অধিশাস্তার অধিকাংশ প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে নূতনভাবে উদ্ভব হয়। শিশুর 'যৌনাকাঙ্ক্ষা' প্রতিহত হওয়ার মধ্য দিয়েই 'অধিশাস্তা'র উদ্গম ঘটে। শিশুর প্রতিহত যৌনাবেগ থেকে অধিশাস্তার অভ্যুদয় হয়। ফ্রয়েডের মতে, শিশুর যৌনতা প্রকৃতপক্ষেই যৌনতা কেন না শিশু সর্বদাই একটি ভালবাসার বস্তু খোঁজে, ছেলে হলে প্রথম ভালবাসার বস্তু মার মধ্যে পায়, মেয়ে হলে বাবা'র মধ্যে। এ থেকে আরম্ভ হয় 'ইডিপাস গূঢ়ৈষা'। অধিশাস্তা গঠনে '**ইডিপাস গূঢ়ৈষার**' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেজন্য এ পর্য্যায়টিকে ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন।

গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই গূঢ়ৈষার নামকরণ হয়েছে। থিবসের রাজা ভবিষ্যৎ বাণী শুনলেন যে, ছেলে বড় হয়ে তাঁকে হত্যা করবে এবং ছেলে মাকে বিবাহ করবে। ইডিপাস হ'ল থিবসের রাজার ছেলে। ভাবী পিতৃহন্তা ছেলের পা'র মধ্যে একটা পেরেক ফুটিয়ে দিয়ে তাকে একটি পাহাড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল। ইডিপাসকে থিবসের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা রক্ষা করলেন এবং পোষ্যপুত্রের মত প্রতিপালন করে মানুষ করলেন—ইডিপাস তার আসল পিতৃপরিচয় ও তার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী কিছুই জানল না। একবার অবশ্য সে যখন ভবিষ্যৎ বক্তার নিকট গেল, তার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করা হ'ল যে সে তার পিতাকে হত্যা করবে ও তার মা'কে বিবাহ করবে। এ কথা শুনে সে তার প্রতিপালক পিতার বাড়ী থেকে দূরে চলে গেল, এবং পথে ঘুরতে ঘুরতে, তার নিজের পিতার সাথে দেখা হয়ে গেল। পিতার সাথে ঝগড়া হল, তাকে হত্যা করল, ইডিপাস তখন একজন বড় যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। সে থিবসে পৌঁছল, থিবস জয় করল, সেখানকার রাজা বলে ঘোষিত হ'ল এবং সেখানকার বিধবা রাণীকে বিবাহ করল। এ সবই কিন্তু ইডিপাস করল তার পিতামাতার প্রকৃত পরিচয় না জেনে। স্বামী স্ত্রী হিসাবে বেশ কিছুদিন কাটল, তাদের চারটি সন্তান হ'ল। চতুর্থ সন্তান হবার পর প্রকৃত সত্য প্রকাশ হ'ল। ইডিপাস এ ঘটনায় এতটা আহত হ'ল যে, সে দুঃখে নিজের চোখ তুলে ফেলল।

এ পৌরাণিক কাহিনীর ছকটি ফ্রয়েড গূঢ়ৈষা ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন। ইডিপাস তার বাবাকে হত্যা করল এবং মাকে বিবাহ করল। সে দুটি অপরাধ করল—একটি পিতাকে হত্যা, অপরটি মা'র সাথে যৌন সম্পর্ক। দুটিই অত্যন্ত গর্হিত কাজ। গর্হিত ও নিষিদ্ধ বলেই ফ্রয়েড্ বলেছেন, সকলের মধ্যেই এরকম

ইচ্ছার অস্তিত্ব রয়েছে, সকলের মধ্যে এরূপ বাসনা রয়েছে। যা কিছু নিষিদ্ধ, তাই করার একটা প্রবল বাসনা মানুষের মধ্যে আছে; বাসনা আছে বলেই এরূপ প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে এবং ঘটতে পারে বলেই সামাজিক নিষেধনামা জারি করা হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে নিষেধনামাই নিষিদ্ধ বাসনার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

ইডিপাস কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষা বলতে বোঝায় মা'র সম্পর্কে ছেলের যৌনেচ্ছা। প্রত্যেকের মধ্যেই এরূপ ইচ্ছা আছে। ছেলের মা'র সম্পর্কে যৌনেচ্ছা এবং মা'র ভালবাসা পাওয়া নিয়ে বাবার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এ অবস্থাকেই ফ্রয়েড নামকরণ করেছেন ইডিপাস অবস্থা। মায়ের প্রতি তার যৌন আকর্ষণ যত বৃদ্ধি পায়, তত সে পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এবং শেষ পর্য্যন্ত পিতার প্রতি বিদ্বেষ, তাঁর ক্ষতি, মৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তায় উঁকি মারে। এরূপ মানসিকতাকেই ফ্রয়েড বলেছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স। নির্জ্ঞান মনেই এ সকল চিন্তার, এ সকল ইচ্ছার আনাগোনা চলে।

ছেলে-শিশুর যৌন-মানসশক্তি মার প্রতি উদ্দিষ্ট হওয়া, মা'র প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার পরই অন্য কোন ভাইবোনের জন্ম-সম্ভাবনায় যখন মাতৃস্তন্য পান বন্ধ হয়ে যায়, মা'র শাসন তর্জন আরম্ভ হয়। মা'র প্রতি তার আসক্তি—তার প্রথম অকৃত্রিম ভালবাসার পথ খুব সহজ সরল নয়। ইতিমধ্যে ছেলে তার পিতার প্রতি আসক্তি অনুভব করে, পিতাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ, সব কিছুতেই তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। পিতার সাথে একাত্মীকরণ (Identification) করে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখে যে, সব বিষয়ে সে পিতাকে অনুসরণ করতে পারে না, অনুসরণ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে, সে মা'কে তার বাবার মত ভালবাসতে পারে না, ভালবাসা সম্ভব হয় না। সে দেখে যে, মাকে একান্তভাবে ভালবাসার বিষয়ে তার বাবা একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে হস্তক্ষেপ করে, সে তার বাবার এই ভূমিকাকে অত্যন্ত অপছন্দ করে, ভিতরে ভিতরে বাবাকে পথের কাঁটা মনে করে এবং মা'কে পাওয়ার পথে এ পথের কাঁটা দূর হয়ে যাক্ এমন কামনাও সে করে থাকে। যে পিতাকে আদর্শ হিসাবে দেখে ও ভালবাসে, সেই পিতাকেই আবার মা'র ভালবাসা পাওয়ার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ও পথের কাঁটা ভেবে ঘৃণা করে। যে পিতাকে ভালবাসছে তাকেই আবার ঘৃণা করতে হচ্ছে। ভালবাসা ও ঘৃণা এই দুই এর দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। ফ্রয়েড মনে করেন, ছেলের

যৌন-মানসশক্তি আত্ম-রতির (Auto-erotic) বিভিন্ন পর্য্যায়, যেমন মৌখিক (Oral) ও পায়ু (Anal) স্থান অতিক্রম করে যখন চার পাঁচ বৎসরে লিঙ্গে নিবদ্ধ হয় তখনই এ দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা অত্যন্ত তীক্ষ্ণরূপ নেয়। এই সময় সে তার বাবা মা উভয়ের কাছ থেকেই কঠোর বিরোধিতা পায়। আত্মকামের অভ্যাসগুলির পুনরাবৃত্তিকে শাসন করা হয়, ভয় দেখানো হয়। তখন শিশুটির এ সব ইচ্ছা ত্যাগ করা ও অবদমন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই সময়ে সে নিজে নিজে কতকগুলো আদর্শ আচরণমান নির্ধারণ করে নেয়। সে বাবার সাথে দুটি আদর্শ সামনে রেখে একাত্মীকরণ করে (১) 'আমি আমার বাবার মতন হব। (২) আমি আমার বাবাকে হত্যা করব না, অথবা 'তাঁর স্ত্রীকে' অধিকার করার কোন ইচ্ছা পোষণ করব না'। এই দুটি সর্তকে ছেলে মানবে বলে গ্রহণ করে এবং এই মূল দুটি আদর্শ প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই অধিশাস্তার মর্মমূল গঠিত হয়।

মোটামুটিভাবে এ অবস্থাকেই বলা হয়: ইডিপাস কমপ্লেক্স বা ইডিপাস গূঢ়ৈষা এবং এ অবস্থায় যে সকল ইচ্ছার উদ্রেক হয় তার অবদমনও এমনি ভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু এ অধ্যায়টি শিশুর, সে ছেলে হোক আর মেয়েই হোক, উভকামিতা (Bisexuality) দ্বারা জটিল হয়ে যায়। ছেলের যৌন-মানসিকতা বা 'ভালবাসা' মা'র সাথে সাথে বাবার প্রতিও ধাবিত হয় এবং মা'ও কিয়দংশে আদর্শ হয়ে যেতে পারে এবং যেহেতু ছেলের বাবার প্রতিও যথেষ্ট আকর্ষণ থাকে, মা সেখানে বাবার ভালবাসা পাওয়ার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন ছেলে মা'র ভাব-মূর্তিকে নিজের মধ্যে একাত্মীকরণের মাধ্যমে গ্রথিত করে নিতে পারে। এর দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে ছেলের অধিশাস্তা গঠনে মা'র ভূমিকাও অনেক পরিমাণে রয়েছে। ছেলের একাত্মীকরণ কখনো কখনো বাবার থেকে মার সঙ্গে বেশী হতে পারে। এর ফলে ছেলের মধ্যে একটা মেয়েলিপনাও দেখা দিতে পারে। মেয়ের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত অবস্থাগুলোর অবতারণা ঘটে।

পাঁচবৎসর বয়সে ইডিপাস গূঢ়ৈষার যথার্থ ও সার্থক উত্তরণের পর শিশুর যৌন-বিকাশ বয়ঃসন্ধিকাল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। একজন যুবক বা যুবতী পরিণত ভালবাসার সুযোগ ও দাবী কিভাবে গ্রহণ ও প্রতিপালন করবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে তারা ইডিপাস পর্য্যায়ে কতটা সার্থকতার সাথে সঙ্গতিসাধন করতে পেরেছিল।

ফ্রয়েডের 'মানসিকপ্রক্রিয়া' (Mental mechanisms), আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া (Defence Mechanisms), নির্জ্ঞানের সক্রিয়তা (Dynamics of the unconscious), 'আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া' (Defence Mechanisms) বা সক্রিয়তা (Dynamisms) প্রভৃতি ধারণার মধ্যে যান্ত্রিকতা নেই। ফ্রয়েডের এই সকল ধারণা ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যায় ও ব্যক্তিত্বের কার্য্যকারিতা অনুধাবনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক। কোন গোপন ইচ্ছাকে, অন্য কোন বস্তু সম্বন্ধে ভয়ের আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা একপ্রকার সক্রিয়তা (dynamism)। যে ইচ্ছা অসামাজিক ও অশ্লীল, সে ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার প্রয়াসে বিবেকের যে কষাঘাত ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় আসে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে ইচ্ছা চরিতার্থ করার প্রয়াসকে যুক্তিসিদ্ধ করার প্রয়াস (Rationalisation) করে। যে ইচ্ছাকে সোজাসুজি সমাজ অনুমোদন করে না ও চরিতার্থ করা যায় না, সে ইচ্ছাকে সমাজ অনুমোদিত পথে নিয়ন্ত্রিত করাও (Sublimation) একপ্রকার মানসিক সক্রিয়তা।

ফ্রয়েডের এই সকল সিদ্ধান্ত যদিও সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয় নি, তবু এটা ঠিক যে, ফ্রয়েড ব্যক্তির নিগূঢ় ক্রিয়া-কলাপ ও সমাজ-পরিবেশে মনের কর্ম-কৌশল সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। সকল তত্ত্ব ও সত্য নিয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে হয়ত আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ সত্যাদি জানা যেতে পারে। মনঃসমীক্ষণ কেবলমাত্র এককভাবে ব্যক্তির মনোজগত নিয়েই এখন আর আলোচনা করে না, সমাজ-সমস্যা, সমাজ-জীবনের ধারায় ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা কিভাবে প্রভাবিত হয়, সে বিষয়েও পর্য্যালোচনা করে। মনঃসমীক্ষণ এখন প্রায় একটা সমাজ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রয়েডের মৌলিক বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি বুঝতে হলে, ফ্রয়েডের উন্মায়ুরোগের চিকিৎসা ও তৎসংক্রান্ত যে সকল চিন্তাভাবনা, তাকে যথাযথভাবে অনুশীলন করতে হবে। উন্মায়ুরোগ ও মানসিক বিকৃতি নিরাময়ে তাঁর যে প্রয়াস ও অবদান তাকে কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না।

মনঃসমীক্ষণের মূল সূত্রগুলো কিভাবে এসেছে, এদের ক্রমবিবর্ত্তন ধারা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি, এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুতঃ ফ্রয়েডের চিন্তার ধারাবাহিকতা না বুঝলে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যুক্তি-বিন্যাস না বুঝলে মনঃসমীক্ষণের মর্মমূলে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এই কারণেই ফ্রয়েডীয়

চিন্তা-ধারাকে ও মনঃসমীক্ষণের সিদ্ধান্তগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যুক্তিধারাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এবার আমরা ফ্রয়েডের মূল-সিদ্ধান্তগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করব।

মনঃসমীক্ষণ কি ?

'মনঃসমীক্ষণ' শব্দটির যথাযথ অর্থ প্রায়ই ঠিকভাবে বুঝে দেখার চেষ্টা করা হয় না এবং এ শব্দটিকে অত্যন্ত অসাবধানতার সাথে ব্যবহার করা হয়। মনঃসমীক্ষণ শব্দটি ফ্রয়েড (Freud), এ্যাড্‌লার (Adler) ও ইয়ুং (Jung) এর নামের সাথে জড়িত, যদিও যথার্থভাবে মনঃসমীক্ষণ শব্দটি ফ্রয়েডের ও যাঁরা তাঁর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির অনুগামী তাঁদের সাথেই একান্ত এককভাবে জড়িত হওয়া সমীচীন। ফ্রয়েড-নিজেও বলেছেন যে, 'মনঃসমীক্ষণ' নামটি কেবল তাঁর উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তগুলি (Theory) এবং তাঁর উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

মনঃসমীক্ষণ বলতে বর্তমানে মনোবিদ্যায় একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ বুঝায়। মনোবিদ্যার অন্য মতাদর্শের কোন পর্যায় বা পরিণতি হিসাবে মনঃসমীক্ষণের অভ্যুদয় ততটা হয় নি, যতটা হয়েছিল ফ্রয়েডের চিকিৎসাসংক্রান্ত অধ্যয়ন গবেষণা ও চিকিৎসক হিসাবে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষণ-মতাদর্শ মনোবিদ্যার অন্যান্য চিন্তাধারা বা মতাদর্শের বিরোধিতা করেছে ; বিশেষ করে কেতাবি মনোবিদ্যা যা বেশী করে জোর দিয়েছে শিক্ষণ, প্রত্যক্ষণ, চিন্তন প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর। মনোবিদ্যার গঠনবাদ (Structuralism), অনুষঙ্গবাদ (Associationism) এবং গেস্টাল্ট্‌বাদ প্রত্যেকটি মতাদর্শের বিরুদ্ধেই মনঃসমীক্ষণবাদ কঠোর সমালোচনা করেছে। মনঃসমীক্ষণাবাদ এই সকল মতাদর্শকে এমনকি উদ্দেশ্যবাদ (Purposivism) এর বিরুদ্ধেও এই বলে অভিযোগ করেছে যে, এরা কেবল মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিয়ে বিমূর্ত ও বুদ্ধিবাদী জ্ঞানের কচকচি করেছে ; কিন্তু মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার গভীর কারণ সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করে নি। মনের গভীরে প্রবেশ করার বৈপ্লবিক প্রয়াস প্রথম মনঃসমীক্ষণবাদীরাই করেছেন—এরূপ দাবী মনঃসমীক্ষণবাদীরা করে থাকেন। মানবিক আচার আচরণ, বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের অন্তরালে যে উৎসশক্তি কাজ করে তার সন্ধান ও মানুষের মনের গভীর গোপন প্রদেশের খনন মনঃসমীক্ষণবাদীরাই প্রথম করেছেন বলে দাবী করেন। মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক

বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে মনঃসমীক্ষণবাদীরা প্রসারিত করেছেন। এ জ্ঞানালোকে অন্বিত হলে মানসিক বিকাশ পর্য্যায়কে অনেকটা যথার্থ দিকে নিয়ন্ত্রিতও করা যেতে পারে।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডই (Sigmund Freud) মনঃসমীক্ষণবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ফ্রয়েডের চিন্তাধারা মানুষ সম্পর্কে ধারণা নবতর মূল্যায়নে প্রবুদ্ধ করেছে। গ্যালেলিও (Galileo), ডারুইন (Darwin) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা মানুষের নিজের সম্পর্কে যে অসুস্থ ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচলিত ছিল তার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। গ্যালিলিও প্রথম বললেন যে, পৃথিবীর চারদিকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে না, সূর্য্যের চারদিকেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। মানুষের যে অহঙ্কার, তার বাসস্থান যে পৃথিবী তাকে কেন্দ্র করেই তার সবকিছু। এই ধারণায় গ্যালেলিও প্রথম আঘাত করেন। ডারুইনও মানুষের নিজের সম্পর্কে যে ধারণা —তারা অন্য প্রাণীদের থেকে যেন একেবারে ভিন্নতর ও আলাদা কিছু, তাকে আঘাত করলেন। ডারুইন বললেন, মানুষ 'উচ্চস্তরের' প্রাণী মাত্র—আলাদা কিছু নয়। ফ্রয়েড মানুষের বাস্তবায়িত প্রকৃতির মধ্যে যে পশু-প্রকৃতি রয়েছে তাকে স্বীকার করলেন ও মানুষের আচার আচরণে, চিন্তায় তার যে প্রভাব তার কথাও বললেন। আমাদের মনের গহনে ধ্বংসের ইচ্ছা রয়েছে, হত্যার ইচ্ছা রয়েছে, আত্ম-সুখের ইচ্ছা রয়েছে। একদিকে রয়েছে জীবনেষণা অন্যদিকে রয়েছে মরণেষণা। এ সব কথা বলে ফ্রয়েড মানুষের সংস্কারগত অহঙ্কারে আঘাত করেছেন। মানুষের মধ্যে কেবল দেবত্ব রয়েছে, মানুষ অমৃতের আলোকের সন্তান এই সকল ধারণায় আঘাত করেছেন।

মনঃসমীক্ষণের দুই অর্থ :

'মনঃসমীক্ষণ' শব্দটির দুটি অর্থ আছে। প্রথমতঃ, মনঃসমীক্ষণ বলতে ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতি বুঝায়, যে চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয় এবং যে চিকিৎসা পদ্ধতিতে মনের গভীর স্তরের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ 'মনঃসমীক্ষণ' মনোবিদ্যায় একটি বিশেষ মতাদর্শ যা 'মনঃসমীক্ষণ' পদ্ধতিতে মানসিক রোগীদের চিকিৎসাকালে ধীরে ধীরে উৎসারিত ও যা কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও সুসংবদ্ধ সিদ্ধান্তে নির্যাসিত।

এ ক্ষেত্রে আমরা 'মনঃসমীক্ষণ' শব্দটি মনোবিদ্যার একটি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ

হিসাবে ব্যবহার করব। চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে 'মনঃসমীক্ষণের' যে তাৎপর্য্য, সেটা আমরা এক্ষেত্রে আলোচনার মধ্যে আনব না। মনঃসমীক্ষণের মূল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

মনঃসমীক্ষণের মূল সিদ্ধান্ত সকল[১] :

(ক) নির্জ্জান মন, প্রাক্-চেতন ও চেতন মন (The Unconscious)।

ফ্রয়েড অবস্থান বিন্যাসে (Topographical) মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন—নির্জ্জান, প্রাক চেতন ও চেতন। তিনি এমন সকল মানস ক্রিয়ার অস্তিত্বের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন, যার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনবহিত, অথচ যে সকল মানসক্রিয়া অগোচরে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়া-কলাপকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েডই অবশ্য এরূপ অগোচর মানস-ক্রিয়ার কথা যে প্রথম বলেছেন বা নির্জ্জান মনের ধারণা দিয়েছেন তা নয়, ফ্রয়েডের বহুপূর্বে লেবনিজ্ (Leibnitz), হার্টম্যান্ (Hartman), সেফেনায়ার (Schopenhaur) এবং নিৎসে (Nietzche) প্রমুখ দার্শনিকগণ 'নির্জ্জান মানসিক ক্রিয়া' সম্বন্ধে তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেছেন।

মনের চেতন অংশ সেই অংশ যার সম্বন্ধে আমরা অব্যবহিতরূপে অবহিত। আমরা এই মুহূর্তে যে সব চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে জ্ঞাত, সেইসব চিন্তা ও অনুভূতি নিয়েই চেতন মন গঠিত। প্রাক্চেতন মনে সেই সব চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, যাকে বিশেষ অবস্থায় ইচ্ছা করলেই আমরা চেতন মনে ফিরিয়ে আনতে পারি। প্রাক্-চেতন মন যেন চেতন মনের পূর্বে অবস্থিত একটি ছোট ঘর। মনের এই অংশ থেকে, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে কিছু কষ্ট করলে বা অনুষঙ্গের দ্বারা পূর্ব স্মৃতি চেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায়। মনের নির্জ্জান স্তরে সেই সব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, যাকে ইচ্ছা করলেও আমরা স্মৃতি পথে ফিরিয়ে আনতে পারি না। এতে সেই সব ইচ্ছা ও অনুভূতি আছে, যার সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে অবহিত হতে পারি। স্বাভাবিক ভাবে আমরা এ সকল ইচ্ছার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকি না।

ফ্রয়েডের মতে মনের নির্জ্জান অংশই ব্যক্তির মানস ক্রিয়ায় অধিক

---

[১] (The unconscious—the Psycho-dynamics of unconscious mental function—conflict, Repression and other defence mechanisms.)

সক্রিয়। চেতন মন, নিজ্ঞান মনের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পকায় ও ক্ষুদ্রাংশ। নির্জ্ঞান মনে বাসা বেঁধে থাকে অজস্র শৈশবকালীন কামনা, অতৃপ্ত বাসনা, উদগ্র-সুখাশ্রয়ী তৃষ্ণা। নির্জ্ঞানস্তরীয় অধিকাংশ ইচ্ছাই হ'ল শৈশব-কালীন বাসনার ফল। কখনও কখনও এ সকল ইচ্ছা সুপ্ত থাকে; নিষ্ক্রিয় থাকে, কখনও কখনও অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। নির্জ্ঞান যে সব অভিজ্ঞতা পুঞ্জীত থাকে, তার প্রত্যেকটির সাথেই তীক্ষ্ণ প্রক্ষোভগত অনুষঙ্গ থাকে, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সাথে যৌন-মানসশক্তি সম্পৃক্ত থাকে—এ সকল অভিজ্ঞতার অধিকাংশই শৈশবকালে প্রাক্ষাভিক (Emotional) আঘাত জনিত Traumatic) অভিজ্ঞতা।

ফ্রয়েড নিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রমাণ গুলির অবতারণা করেছেন—

(১) এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমাদের মনের কোন কোণে সঞ্চিত থাকে, যাকে আমরা ইচ্ছা করলেও মনের চেতন প্রান্তে ফিরিয়ে আনতে পারি না।

(২) ঘুমের ঘোরে চলা ফেরা করা, পরে সে অভিজ্ঞতার কথা মনে একেবারে না থাকা—বা স্বপ্নচারিতা (Somnambulism)।

(৩) সম্মেহনের পরে অভিভাবনজনিত যে পরিবর্ত্তন।

(৪) স্বপ্ন (Dreams)

(৫) কোন বিশেষ বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তিকে ভুলে যাওয়া।

(৬) লিখতে বা বলতে গিয়ে বিশেষ কিছু ভুল করা।

(৭) বিদ্রূপ করা।

(৮) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে মানসিক রোগীদের সারিয়ে তোলা যায়—এ সত্যও নিৰ্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত তাকে দৃঢ়তর করে। নিৰ্জ্ঞান মনের ইচ্ছা অনিচ্ছা মানবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে, এ সিদ্ধান্তের উপরই মনঃসমীক্ষণের চিকিৎসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

(খ) অদস্ (Id), অহম্ (Ego) ও অধিশাস্তার (Super-ego) অবস্থান বিন্যাসে মনের তিনটি স্তরের কথা ফ্রয়েড বলেছেন—চেতন, প্রাক-চেতন ও নিজ্ঞান স্তর। মনের সংগঠন বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা করতে গেলে মনের সদা সক্রিয়তাকে (Dynamics) আমাদের গোচরে রাখতে হবে। মনের সক্রিয়তার তিনটি দিক আছে এবং এদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চেতন, প্রাকচেতন ও নিৰ্জ্ঞান স্তরে ঘটে থাকে।

(১) **অদস্ (Id)**—অদস্ সকল মানসিক শক্তির উৎস মনের আদিম ও অবিন্যস্ত রূপ। জীবনেষণা ও মরণেষণা (life instincts, death instucts) প্রবৃত্তি গুলির প্রধান আধার। এ সকল প্রবৃত্তির বাস সম্পূর্ণরূপে মনের নির্জ্ঞান স্তরে। অদস সর্বদা সুখ-সূত্রের দ্বারা চালিত হয়। এর কর্ম প্রয়াস সর্বদা সুখান্বেষণে ছোটে—বাস্তব জীবন ও জগতের সাথে এর কর্ম কাণ্ডের প্রথমাবস্থায় কোন সম্পর্ক থাকে না। নির্জ্ঞানস্থিত মনোবৃত্তি গতি জাতীয় (Dynamics) গুনসম্পন্ন, অর্থাৎ মূলতঃ এর থেকেই কর্মপ্রেরণা উৎপন্ন হয়। শৈশবের বাস্তব জ্ঞান বিবর্জ্জিত সুখান্বেষী অসংলগ্ন কর্মপ্রয়াস ধীরে ধীরে সমাজ ও বাস্তব-সূত্রের (Reality Principle) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই সকল নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছাবেগ যদি বাস্তব ও সমাজ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হত তাহলে মানুষ কেবল তাৎক্ষণিক সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা ছুটত। সভ্যতার আলোকে তারা আর কোন দিন আলোকিত হত না। মানুষ হয়ে থাকত সময় জ্ঞান হীন—বাস্তবজ্ঞানহীন।

(২) **অহম্ (Ego)**—অহম হ'ল বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সংহতি আনয়নকারী সত্তা। মনের এ অংশটি সর্বদা স্থান কাল ও ভৌতিক জগতের সাথে যোগাযোগ রেখে চলে। অদসের ইচ্ছাগুলিকে অহম্ সর্বদা বিচার করে দেখে এবং এ ইচ্ছাবেগকে প্রতিরোধ করে। এর কাজ হ'ল ব্যক্তির সাথে বাইরের ভৌতিক জগত ও মানবিক জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। অহম আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তির অদসের অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যতটা চরিতার্থ করা যায় তার উপযোগী আচার আচরণ অহম নিয়ন্ত্রিত করে। অহমও অদসের ইচ্ছাগুলির বাস্তবায়িত সর্বাধিক চরিতার্থতা চায়। অহম এমন ভাবে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস করে যাতে সামাজিক ও ভৌতিক বাস্তবের দাবী যতটা সম্ভব মানা যায়। সঙ্গে সঙ্গে অদসের ইচ্ছা গুলিরও সর্বাধিক সন্তুষ্টি ঘটে। বাস্তবের দাবী ও অদসের দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটায় অহম। অহম যেহেতু বাস্তবের সাথে সম্পর্কান্বিত, সেইহেতু অহম্ সর্বদাই বাস্তব সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যুক্তি, বিচার বিবেচনা দ্বারা অহম চলে।[১] অহমকে একদিকে অদসের ইচ্ছার সাথে ও অন্যদিক ভৌতিক ও সামাজিক বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে অহমকে

---

১. Ego stands for reason and circumspection, prudence and discretion." Mitchell, Problem of psycho-pathology.

আবার অধিশাস্তার (Super ego) দাবী ও নির্দেশ মেনেও চলতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে অহমকে তিনটি ভিন্নমুখী শক্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে,

(১) বহির্জগৎ

(২) অদসের প্রবৃত্তিগত চাপ

(৩) অধিশাস্তার বাধা ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি।

শিশু অদসের দ্বারা চালিত হয়ে অনেক কিছু পেতে চায়—যে কোন বাসনার পরিতৃপ্তি চায়। কিন্তু বাস্তব জগতের সাথে পরিচয় হবার সাথে সাথেই শিশু দেখে যে তার সব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। সে দেখে অপরিণাম দর্শী বাসনায় সুখ থেকে দুঃখই আসে বেশী। এ সব অভিজ্ঞতার দ্বারা অদসের খানিকটা অংশ 'অহম' এ রূপান্তরিত হয়। অহম্ তখন গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে মনকে অনেক কিছু মানিয়ে নিতে বলে—মনকে বুঝবার চেষ্টা করে, এ কাজ করা ঠিক নয়, এ কাজ করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, এ দাবীটা অসঙ্গত।

অধিশাস্তা (Super Ego)

অধিশাস্তার ইচ্ছা-শক্তিই প্রধাণতঃ ব্যক্তির সমাজীকরণের জন্য দায়ী। অদস্ (Id) মূলতঃ জৈবিক ইচ্ছার দ্বারা অনুবর্ত্তিত ; অহম্ (Ego) মূলতঃ ভৌতিক পরিবেশের দ্বারা এবং অধিশাস্তা সমাজ সংস্কৃতির দ্বারা অনুবর্ত্তিত।[২] এই অধিশাস্তা আমাদের বিবেকসত্ত্বা। এর মধ্যে পাপবোধ ও অনুশোচনার অনুভূতির জন্ম হয়। একে অহমের আদর্শও বলা যেতে পারে (Ego ideal) কেননা এর মধ্যেই সামাজিক আচরণাদর্শ নিহিত থাকে। অধিশাস্তা অহম্ ও অদসের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখে। অধিশাস্তা এমন ভাবে কাজ করে যেন একটি অতন্দ্র প্রহরী ; অদস আগত অবদমিত ইচ্ছাকে গ্রহণ করার বিপদ সম্পর্কে অধিশাস্তা অহমকে সাবধান করে, শাসন করে।[১] অবিশাস্তার মধ্যেই অবদমনের শক্তি, আত্ম সমালোচনার ক্ষমতা বর্ত্তমান

---

[২]The Id is primarily biologically Conditioned, the Ego primarily Conditoned by the physical environment, but the super-ego is primarily sociologically and culturally conditioned.

Brown, Psyco-dynamics of abnormal behairour 1940

[১]Super-ego acts, as it were, like a guard that warns the Ego of the danger of accepting any repressed impulses emanating from the Id',—Jones, Earnest, wnat is psycho-analysis ? Internatonal Universities press, Newyork, 1948.

থাকে। অধিশাস্তার জন্ম হয় ইডিপাস স্তরে, ইচ্ছা, অবদমন ও ইডিপাস গূঢ়ৈষাকে অতিক্রমনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। ঈডিপাস স্তরীয় ইচ্ছার চরিতার্থতায় পিতামাতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা দেয়। এই সময়ে শৈশবকালীন অহম্ এ অবস্থা উত্তরণের জন্য তার শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস করে। অহমের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা পিতামাতার সাথে একাত্মীকরণ করে। তাদের আদিষ্ট বিধি নিষেধগুলোকে তারা নিজের অহমের মধ্যে গ্রথিত করে নেওয়ার চেষ্টা করে। পিতামাতার মনোভঙ্গী ও তাদের মতামত, তাদের অহম্ গ্রহণ করে এবং এর ফলে অহমের কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন, এ ভাবে উদ্ভূত অহমের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট আদি অহমের সন্মুখে বিরাজ করে আদি-অহমের আদর্শ বা অধিশাস্তা রূপে।[২] অধিশাস্তা প্রাথমিক পর্য্যায়ে এ ভাবে গঠিত হওয়ার পর পিতা মাতা, পিতামাতার পরিবর্তস্বরূপ শিক্ষক শিক্ষিকা ও তাদের আদিষ্ট ও প্রতিপালিত নীতি নির্দেশর দ্বারা অধিশাস্তা আরও শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট হয়। অধিশাস্তার নির্দেশ ও দাবীর সাথে যদি অহমের কার্য্যকলাপের সামঞ্জস্য না থাকে, তখনই ব্যক্তির মধ্যে পাপবোধ ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়।

অধিশাস্তার অস্তিত্বই ব্যাখ্যা করে যে, কি করে প্রত্যেক সভ্যতায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-সংযমের শক্তি মানবিক আচরণকে মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করছে, সভ্যতার আলোকে পরিশীলিত করছে। অধিশাস্তা উৎসারিত এ শক্তি সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় অপরিহার্য্যভাবে কাজ করছে। যদি আত্ম-শৃঙ্খলার বুনিয়াদ এই অধিশাস্তার জন্ম ও পুষ্টির মধ্য দিয়ে না হত অর্থাৎ যদি বিবেক-সত্তা' আমাদের মধ্যে না থাকত, তা হলে সামাজিক আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হত না!

[১]ব্যক্তিত্বের তিনটি গভীর দিকের গঠন ও সক্রিয়তা সম্বন্ধে মিচেল (Mitchel) বলেন যে, 'মন প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নির্জ্ঞান অদস (Id) থাকে।

---

[২]"Their point of view, as it there, is adopted by the Ego, but the modification of the Ego, thus arising, remains isolated and confronts the rest of the content of the Ego as the Ego-ideal or super Ego".—Hart, Bernad, The psychology of Insanity. 1949.

[১]The mind in its beginning is conceived as an unconscious Id. The Ego arises as a modification of the Id, produced by contact with the outside world through the perceptual system. It comes to existence in

অহম্ অদসের রূপান্তরন থেকেই উদ্ভূত হয়। অদস্ যখন ব্যক্তির বাইরের বাস্তবের সাথে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতার মাধ্যমে যোগান্বিত হয়, তখনই অদস থেকে বাস্তবের অভিজ্ঞতার ও শিক্ষাসংস্পৃক্ত অহমের উৎপত্তি হয়। অদসের বাস্তবের দাবীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে গিয়ে এবং বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অদসের যথাসম্ভব চরিতার্থতার জন্য অহমের উৎপত্তি। অদস বাস্তবের দাবীকে বোধের মধ্যে নিতে পারে না—সুখ সূত্রের দ্বারা অদস চালিত হয়। পিতামাতার সাথে একাত্মীকরণের মধ্য দিয়ে অহমের 'অহম-আদর্শ' (Ego-ideal) উদ্ভূত হয় এবং প্রকৃত অদসের যৌনতা সম্পর্কে পিতামাতার সমালোচনাভঙ্গী ও গ্রহণ-বর্জন ভঙ্গী গ্রথিত হয়ে অধিশাস্তার বিবেক হিসাবে কাজ করে এবং অবদমন ক্রিয়ায় অহমকে উদ্দীপ্ত করে। অহমের চেতন অংশটি বাস্তবের সাথে সংযোগ রেখে চলে, আর তার নির্জ্ঞান অংশটি অদসের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে।

অহম্ (বাস্তব সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) অদস (Id) সুখ-সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অধিশাস্তা হ'ল অহম-আদর্শ। এই তিন শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলছে। অদস্ চায় তার কামজ ও আক্রমণাত্মক বাসনা চরিতার্থ করতে। অধিশাস্তা হ'ল বিবেকসত্তা এবং অহম হ'ল বুদ্ধি প্রয়োগকারী বাস্তব সত্তা। অহমকে, অধিশাস্তার ইচ্ছা ও অদসের ইচ্ছার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলে তার বাস্তবায়িত সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। সঙ্গতি সাধনের প্রক্রিয়ামাত্রই দ্বন্দ্বের অবতারণা করে। এ থেকেই মনঃসমীক্ষণের একটি অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয়।

দ্বন্দ্ব (Conflict), অবদমন (Repression) এবং গুঢ়ৈষা (cemplexes)

ফ্রয়েডের মতে প্রায় সকল ব্যবহারই অদস, অধিশাস্তা ও অহমের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণতি। এই সকল দ্বন্দ্ব মনের চেতন, প্রাকচেতন অথবা অবচেতন স্তরে সংঘটিত হয়। এ দ্বন্দ্ব হয় কেন?

---

response to the claims of reality, and for the purpose of securing a real satisfaction of the impulses of the Id which disregards reality and is dominated by the pleasure principle. By means of identification with the parents or one of the parents, an Ego-ideal is set up within the Ego, and as a super Ego, adopts the critical and condemantory attitude of the parents towards the libidinal impulses of the Id. The Ego ideal functions as conscience and is the instigator of the repressions effected by the Ego."—Mithell, problem of psycho-pathology.

সাধারণভাবে আমরা দেখি, যখন দুটি বিপরীতমুখী ইচ্ছা সমানভাবে দুদিকে ব্যক্তিকে টানতে থাকে, তখন ব্যক্তি সেই মুহূর্তে কোন্‌টাকে ছেড়ে কোন্‌টাকে ধরবে এ সম্বন্ধে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হতে থাকে। এরূপ অবস্থার উদ্ভব আর একভাবেও হতে পারে, যেমন ব্যক্তির ইচ্ছা রূপায়ণে বাইরের শক্তির নিয়ত বাধাদান। ইচ্ছা ও ইচ্ছা রূপায়ণে বাধাও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

এ দ্বন্দ্ব শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হয়। দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের যথার্থ সমাধান ব্যক্তিত্ব বিকাশ পর্য্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ। আবার এ দ্বন্দ্ব যদি অস্বাভাবিক হয় এবং এর সমাধান করার শক্তি ব্যক্তির মধ্যে না থাকে তাহলে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়—মানসিক স্বাস্থ্য হানি ঘটে।

এ অন্তর্দ্বন্দ্ব আবার যাদের বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতা বেশী তাদের মধ্যে বেশী করে দেখা দিতে পারে। শুভ ও অশুভ ইচ্ছার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাল মন্দের বিচার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এ বিচার ক্ষমতা বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতার একটি ধর্ম, যার বুদ্ধি যত বেশী সে তত পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন, তার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও বেশ অধিক। আবার এদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার জন্য দ্বন্দ্বের সার্থক সমাধানও করতে পারে। বুদ্ধিমান শিশুরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বেশী ভোগে। একটা পর্য্যায় পর্যন্ত এরূপ দ্বন্দ্ব শিশুকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে, দ্বন্দ্ব উত্তরণের জন্য সে নূতন সৃজনধর্মী কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বুদ্ধিমান শিশুদের দ্বন্দ্ব যেহেতু বেশী, দ্বন্দ্ব উত্তরণের কর্মপ্রয়াসও অধিক, ফলে নূতন নূতন কর্ম প্রয়াস ও সার্থকতার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বও সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষমতায় অধিক সম্পন্ন হয়। পারিবেশিক চাপে ভেঙ্গে পড়ে না, মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে ব্যক্তিত্বের সুস্থতা-অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

কিন্তু যাদের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বা শারীরিক কোন কারণে বিকৃতি দেখা যায়, তাদের মধ্যেও সামর্থ্য ও অভিলাষের মধ্যে যে দূরত্ব থাকে তা অনুধাবন করে শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচিত হ'ল তা অনেকাংশে চেতন মনের দ্বন্দ্ব। ফ্রয়েড্ দ্বন্দ্বের আরও গভীরতর কারণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, অদসের ইচ্ছা, যা প্রধানতঃ যৌন-কামনাযুক্ত ও আক্রমণধর্মী, যখন চরিতার্থ হবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন বাস্তবের বাধা ও অধিশাস্তার শাসনে তা প্রতিহত হয়, এবং দুই বিপরীতমুখী ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একদিকে

আদিম ইচ্ছা ও অপরদিকে মানসিক ও আত্মিক বিধি নিষেধ। এ দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তির মধ্যে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার উদ্ভব হয়। এ অস্বস্তির নিরসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ব্যক্তি তা করতে চায়। শিক্ষাগত সংস্কার, ধর্মীয় সংস্কার, অদস্ ইচ্ছার নগ্ন পরিতৃপ্তির পথে বাধা দেয়। এ দ্বন্দ্বের সমাধান তিনভাবে হতে পারে। অদস ইচ্ছা বাস্তবকে ও অধিশাস্তার দাবীকে অগ্রাহ্য করে সরাসরি চরিতার্থ হতে পারে, কিংবা অদস ইচ্ছাকে জোর করে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, অথবা এ সকল ইচ্ছাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, যাতে সমাজ অনুশাসন ও অধিশাস্তার অনুশাসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্ত উপায়ে এ সকল ইচ্ছার চরিতার্থ করা যায়। প্রথম পথ অর্থাৎ অদস ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপূরণ সম্ভব নয়, কেন না বাস্তব সেখানে অত্যন্ত কঠোর বাধা দিয়ে থাকে, অন্য পথ হচ্ছে অদস্ ইচ্ছাকে পরাস্ত করা, অদস্ ইচ্ছার আকুতিকে একেবারে নিশ্চুপ করে দেওয়া। তৃতীয় পথটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। তৃতীয় পথে অদস ইচ্ছার পরিপূরণের জন্য শিক্ষা, যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন। অদস ইচ্ছার গতি এক দিকে, আত্ম-সম্মানবোধ, সামাজিক বিধি নিষেধের গতি অন্যদিকে। এই বিপরীতমুখীতার জন্য দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। এ দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান স্তরেই চলতে থাকে। অহম্ একদিকে অধিশাস্তা ও অপরদিকে অদস্ ইচ্ছার দ্বারা এ দ্বন্দ্বে আন্দোলিত ও জর্জরিত হতে থাকে। একদিকে অধিশাস্তা ও অহমের বিপরীত ধর্মী ইচ্ছা অর্থাৎ প্রতিবন্ধ (Censor) শক্তি, অপরদিকে অদসের ইচ্ছা—এই দুই বিপরীত-মুখী শক্তির দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান মনেই হতে থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি প্রয়াসেই অবদমন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।

নির্জ্ঞান মনে যেন একটি ছোট ঘর আছে। এ ঘরের মধ্যে যেন অজস্র বাসনা, যেন একের পর এক অগণিত ব্যক্তির মত ভিড় করছে। ঠিক এর সঙ্গেই যেন রয়েছে আরও একটা ছোট ঘর, যেন অভ্যর্থনার ঘর। এ দুটি ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় যেন একজন ব্যক্তি প্রহরী রয়েছে, যিনি সকল ইচ্ছাকে পরীক্ষা করে দেখেন, বিচার করেন এবং অনেক ইচ্ছার প্রবেশাধিকারে বাধা দেন। এর ফলে নির্জ্ঞান স্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে—এ উত্তেজনা চেতন স্তরে পৌঁছে না। যখন এসব ইচ্ছা প্রহরী দ্বারা (Censor) প্রতিহত হয়ে নির্জ্ঞানেই ফিরে আসে—চেতন স্তরে এরা আর পৌঁছুতে পারে না। তখন এই সব ইচ্ছারই অবদমন ঘটে। এ প্রক্রিয়াকেই বলি আমরা **অবদমন (Repression)**। এদিক থেকে অবদমন সম্পূর্ণরূপে একটি নির্জ্ঞান প্রক্রিয়া।

দ্বন্দ্বের পরিণামে অবদমন দেখা দেয়। দ্বন্দ্ব মাত্রই শক্তিক্ষয়কারী। **এ দ্বন্দ্ব অবসানের জন্য আমাদের মন নানাপ্রকার আত্মরক্ষাকারী কৌশল-প্রয়াস (defence mechanisms) অবলম্বন করে থাকে।** সাময়িকভাবে হলেও একটা শান্তির প্রয়াস চলতে থাকে।

অবদমিত ইচ্ছা কিন্তু মরে যায় না। অবদমিত ইচ্ছারা প্রহরীর চোখে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, দিবা স্বপ্ন, ভুল ভ্রান্তি, উদ্বায়ুরোগের সংলক্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অবদমিত ইচ্ছাগুলি চরিতার্থ হওয়ার প্রয়াস করে।[১]

যে সব ক্ষেত্রে অবদমন সার্থকভাবে ঘটে থাকে, সেখানে কোন খারাপ ফল দেখা দেয় না। কিন্তু যেখানে অবদমন অসম্পূর্ণ সেখানেই যতপ্রকার মানসিক অসুস্থতা ও বৈকল্য দেখা দেয়। **এই সকল অতৃপ্ত অবদমিত ইচ্ছারা নির্জ্ঞানে সক্রিয় থাকে। ধীরে ধীরে একটি এই প্রকারের অবদমিত ইচ্ছা অন্য একটি সমধর্মী অবদমিত ইচ্ছার যোগসূত্র স্থাপন করে এবং এইরূপে একই প্রকারের বহু অবদমিত ইচ্ছা একত্রিত হয়ে একটি জট বা গূঢ়ৈষা (Complex) এর সৃষ্টি করে।** এ সকল অবদমিত ইচ্ছা বা গূঢ়ৈষা সর্বদাই চেষ্টা করে চেতন মনে হানা দেবার। এই সকল অবদমিত ইচ্ছার দল যেন বিদ্রোহী। বিদ্রোহী বলা হ'ল এই জন্য যে, এ সকল ইচ্ছা সর্বদাই চেতনে যেতে চায়, কিন্তু নিয়তই নির্জ্ঞানের প্রহরীরা (Censor) প্রতিহত করতে চায়। যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে গূঢ়ৈষার জন্ম হয়, তার সূচনা হয় চেতন মনেই, কিন্তু গূঢ়ৈষা সৃষ্ট হয়ে গেলে তা নির্জ্ঞানে চলে যায়।

কখনো কখনো প্রহরীকে (Censor) ফাঁকি দিয়ে, এই সকল অবদমিত ইচ্ছা নানাভাবে চেতন মনের স্তরে পৌছে যায়।

বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মধ্যে বই খাতা ছিঁড়ে ফেলা, পেন্সিল কলম ভেঙ্গে

---

[১] When they are more serious, however become the afflictions of the hysteric, the delusions of the psychotic, the fears and obsessions cf the psychotic, and even the productions of the genius.

—Brown, Psychology and the Social order.

Sometimes the Conflict is resolved in an economical fashion in various manners through the so-called mechanism. These mechanisms are various unconscious or conscious processes whereby the inner conflict situation is eliminated or reduced in its severity. Brown, Psychodynamics cf Abnormal behaviour.

ফেলা, বাড়ীর কাজ নিয়ে আসতে ভুলে যাওয়া প্রভৃতি সংলক্ষণ ছাত্রের নির্জ্ঞানে বিদ্যালয় বা শিক্ষক সম্বন্ধে অনীহা থেকে দেখা দিতে পারে। এসব-ক্ষেত্রে ছাত্রের মনের গভীরে কোন দ্বন্দ্ব চলতে থাকে।

বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া বা অন্যান্য দুষ্ক্রিয়তাও ছাত্রের অবদমনের ফলস্বরূপ। অনেক সময় কোন কোন ছাত্রের মধ্যে সহপাঠীদের বই পত্র চুরি করতে দেখা যায়, এটাও অবদমিত কোন ইচ্ছা চরিতার্থ করার একটা উপায় মাত্র। পড়াশুনায় অমনোযোগিতা, অন্যমনস্কতা, অল্পতে রেগে যাওয়া, বিষণ্নতা প্রভৃতি সংলক্ষণও ছাত্রের অত্যধিক অবদমনের পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়। অস্বাভাবিক বিস্মৃতি বা কোন কাজে অতিমাত্রিক উৎসাহ প্রভৃতি উপসর্গও অবদমনের জন্য দেখা যায়। মোটের উপর দ্বন্দ্ব ও অবদমন যদি ব্যক্তির মধ্যে থকে, তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ থাকতে পারে না, যদিও মনের আত্ম-রক্ষাকারী কৌশল (Defence Mechanism) ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার নানা প্রকার চেষ্টা করে থাকে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা

শিশু যা চায় তাই পায় না। বাইরের বাস্তব তার শক্তি দিয়ে তার চাওয়াকে পঙ্গু করে ফেলে–প্রতিহত করে। অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এ অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক সমাধান যদি না হয় তাহলে শিশুর মধ্যে যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়—শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান নানাভাবে হতে পারে।

(১) অন্যবিধ সন্তোষ প্রদায়ী গঠনাত্মক প্রয়াস

হীনমন্যতা বোধ থেকে যদি শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যেমন আপন শক্তি স্বল্পতার কথা মনে রেখে যদি সে অন্য কোন ভাল ছাত্রের সাথে তুলনা করতে আরম্ভ করে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্বস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য সে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনা আরম্ভ করবে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হয়ে ওঠার সর্বপ্রকার প্রয়াস করবে। সেটা অসম্ভব প্রতীত হলে সে অন্যবিষয়ে পারদর্শী হওয়ার যেমন খেলাধূলা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতির কোন না কোন ক্ষেত্রে নিপুণতা দেখিয়ে নিজের হীনতাবোধ দূর করার চেষ্টা করবে। এ দুই এর কোনটিই যদি সে গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে সে মরিয়া হয়ে সকলের মতামত, বিশেষ করে গুরুজনদের

মনোভাবকে আহত ও অপমানিত করে দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ও অস্বস্তির ভার লাঘব করার চেষ্টা করবে। এ সব ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিপূরক গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানই শ্রেয়ঃ—এ থেকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথার্থভাবে হতে পারে।

(২) অবস্থার পর্য্যালোচনা

যে অবস্থা শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায়, সে অবস্থার কোন অঙ্গটি বিশেষভাবে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী সেটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সে অবস্থার যাতে উদ্ভব না হয় তার দিকে পূর্ব থেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হয়, তাহলে শিশুকে অন্য সুস্থ পরিবেশে স্থানান্তরিত করতে হবে। ব্যক্তিকে যদি অবস্থার পর্য্যালোচনা করে সঠিকভাবে দেখিয়ে দেওয়া যায় কোন্ ঘটনা বা শক্তি তার ইচ্ছা পরিতৃপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করছে—তার ইচ্ছার অবাস্তবতা কতটুকু, ইচ্ছার পরিণাম কি, তাহলে শিশুর দ্বন্দ্বের কারণ তিরোহিত হতে পারে। কেননা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে সে নিজেই অবস্থাকে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারে তার অপরিণামদর্শিতা কিভাবে কাজ করছে, তার ইচ্ছার অবাস্তবতাও যে কতটা সেটাও উপলব্ধি করতে পারে। নিজের চিন্তাজালকে নিজেই অবলোকন করার শিক্ষা শিশু যেন পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট থেকে পায়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে যাতে নিজের দ্বন্দ্বের কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হয়, এরূপ শিক্ষায় শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কেননা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি ও সমস্যা দেখা দেয় তা ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎস মূলে আঘাত না করে কেবল জোর করে অন্তর্দ্বন্দ্ব মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। ঠিক সময়ে দ্বন্দ্বের সমাধান না ঘটালে, শিশুর মধ্যে অবদমন, দিবাস্বপ্ন, পলায়নপরতা নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ দেখা দেবে। এরূপ অস্বাস্থ্যকর উপায়ে দ্বন্দ্বের সমাধান করার চেষ্টা শিশুর মানসিক জটিলতা ক্রমে বৃদ্ধি করে; ব্যক্তিত্ব বিকাশকে রুদ্ধ করে। মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্য্যস্ত হতে থাকে।

প্রবৃত্তি ও যৌন মানস শক্তির সিদ্ধান্ত : লিবিডোর স্বরূপ

(The Theory of Instincts and Libido)

দ্বন্দ্ব, অবদমন ও গূঢ়েষা সৃষ্টির কারণ নির্ণয়ে আমরা দেখেছি যে একদিকে অদস্ ইচ্ছা ও অপর দিকে সামাজিক ও আত্মিক অনুশাসনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার পরিণতি হিসাবেই অবদমন আরম্ভ হয়। দ্বন্দ্ব সুখ-সূত্রাশ্রয়ী অদস ইচ্ছা ও বাস্তব সূত্রাশ্রয়ী অহমের মধ্যে ঘটে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে নিশ্চিতরূপে জন্মগত দুটি মৌল জৈব-মামসিক এষণা আমাদের মধ্যে রয়েছে—একটি হল জীবনেষণা অপরটি হল মরণেষণা। প্রথমটি হল ভালবাসা, জীবন সম্পর্কে গভীর অনুরাগ, দ্বিতীয়টি হল আক্রমণ, ধ্বংস, মৃত্যুর ইচ্ছা। ব্যক্তির এই সকল মৌল ইচ্ছাগুলি তার দেহ ও মনের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হয়। সকল কর্ম প্রয়াসের মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ইচ্ছাগুলি কাজ করে। এই প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্তির জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার দ্বারা বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

যে শক্তি আমাদের কোন কিছু গঠন করতে, কোন কিছু সৃষ্টি করতে, আমাদের আত্মরক্ষায় ও বংশ-রক্ষায় প্রবৃত্ত করে, তার উৎস হল জীবনেষণা বা ভালবাসার প্রবৃত্তি (Eros or life instinct)। এর উদ্দেশ্য হল একের সাথে অপরকে প্রেম বন্ধনে, ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করা ; এরকম করে ধীরে ধীরে বৃহত্তর গণ্ডীর সৃষ্টি করা। নিজেকে নিজে ভালবাসা, অপরকে ভালবাসা, আত্মরক্ষা, বংশ-রক্ষার শক্তি ও ইচ্ছা উৎসারিত হয় জীবনেষণা (Eros) থেকে। অপরপক্ষে যে ইচ্ছা ও শক্তি আত্মহনন, অপরকে হননে প্রবৃত্ত করে তা উৎসারিত হয় মরণেষণা (death nistinet or thanatos) থেকে। প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যেই জৈবিক দিক থেকেও একদিকে যেমন বিকাশ বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তি আছে, আবার এর মধ্যেই রয়েছে ধ্বংস ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়তি ও গতি। জৈবিক দিক থেকে এই জীবন ইচ্ছাই ব্যক্তিকে আত্ম-রক্ষণের ও বিকাশের কারণ-শক্তি। মানসিক দিক থেকে-এ থেকেই যৌনেচ্ছা ও অন্যান্য রক্ষণ কাজ অথবা, খাদ্য অন্বেষণ, নীড় রচনা, বসন বয়ন ও নানাপ্রকার বুদ্ধি প্রবুদ্ধ কাজ উৎসারিত হয়। মনস্তাত্বিক দিক থেকে মরণ-প্রবৃত্তি থেকেই আসে আক্রমণধর্মীতা, অপরকে পীড়ন, অপরকে বিদ্রূপ

করা, আত্মপীড়ন ও আত্মহত্যা, অপরকে আক্রমণ করা ও হত্যা করার ইচ্ছা।

এ দুটি প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও পরস্পর নিরপেক্ষ শক্তি নয়। এ দুটি প্রবৃত্তি পরস্পর মিলেমিশে কাজ করে। ভালবাসা ও ঘৃণা, ধ্বংস ও সৃষ্টি, জীবন ও মৃত্যু মিলেমিশে একের সাথে অপরে জড়িয়ে আছে। এ থেকেই ফ্রয়েডের দ্বৈততার (ambivalence) ধারণা এসেছে। ফ্রয়েডের মতে, কোন পুরুষের কোন নারীর প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালবাসা ও প্রণয়ের মধ্যেও কিছু পরিমাণ অনীহা ও আক্রমণের মনোভাব আড়ালে থেকে যায়। চেতনে ভালবাসা থাকলে নির্জ্ঞানে ঃঘৃণা থেকে যায়, অপর পক্ষে চেতনে ঘৃণা থাকলে নির্জ্ঞানে ভালবাসা থাকে।

লিবিডোর স্বরূপ ঃ

ফ্রয়েডের প্রবৃত্তির সিদ্ধান্তের সঙ্গেই (libido) যৌন-মানস শক্তির সিদ্ধান্ত জড়িত। Libido হল সকল মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উৎস-শক্তি। ফ্রয়েড অবশ্য এ শক্তিকে বলেছেন যৌন-মানস শক্তি—জীবন-প্রবৃত্তি বা জীবনেষণার সকল শক্তির উৎস-মূল। জীবন-প্রবৃত্তির শক্তির আধার হল এই লিবিডো, এ শক্তি অপরকে নিকটে আনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। সকল প্রকার ভালবাসার উৎসশক্তি হল লিবিডো। যৌন-প্রেম, আত্ম-প্রেম, পিতামাতার ভালবাসা, বন্ধুত্ব-সকল প্রকার ভালবাসার মূলেই আছে এ যৌন-মানস শক্তি বা লিবিডো। ফ্রয়েডের মতে যৌন-মানস শক্তিই শিশুর মধ্যে যৌন-জীবনের সূচনা করে; যৌন-মানস শক্তি যখন বাইরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তখনই অন্যব্যক্তিকে সে ভালবাসতে আরম্ভ করে। যখন এ শক্তি নিজের দিকে প্রবাহিত হয় তখন আরম্ভ হয় আত্ম-রতি। এর প্রবাহ পথ যদি কোন কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই **লিবিডোর সংবন্ধন (fixation)** ঘটে। কখনও কখনও এ প্রবাহ ধারা সম্মুখবর্তী না হয়ে পশ্চাদবর্তী হয়ে থাকে (Regression)। এই যৌন মানস শক্তির গতি-পথকে জৈবিক যৌন-পথ থেকে অন্য সামাজিক ও আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদগতি (Sublimation)।

যৌন-মানস শক্তির গতি প্রবাহের তিনটি দিক আছে। যখন শিশু নিজের শরীর থেকে, নিজেকে কেন্দ্র করেই তার 'যৌনতার' চরিতার্থ ঘটায় তখন তাকে বলা হয় স্বকাম (auto-erotic) পর্য্যায়। ধীরে ধীরে শিশুর জ্ঞান বাড়ার সাথে

সাথে নিজের অস্তিত্বকে অন্যের সাথে তুলনা করে স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে ভাবতে শেখে। নিজেকেই সে ভালবেসে ফেলে যৌন মানস শক্তির সকল দাবী আপন সত্তাকে কেন্দ্র করেই শিশু এ স্তরে মিটিয়ে নেওয়ায় প্রয়াস করে। একেই বলা হয় আত্মরতি বা আত্ম-প্রেম (Narcissistic stage)। ক্রমে যৌন শক্তি নিজেকে ছাড়িয়ে অন্য ব্যক্তিতে ধাবিত হয়, প্রায়শঃই এ ক্ষেত্রে মা'ই হল সেই ব্যক্তি যার মধ্য দিয়ে শিশু তার যৌন-মানস শক্তির দাবীগুলিকে চরিতার্থ করে থাকে। এই পর্য্যায়ে 'ঈডিপাস' অবস্থার উদ্ভব হয়।

এটা সত্য যে, লিবিডো বলতে যৌনেচ্ছা চরিতার্থ প্রয়াসের জন্য যে আকুতি এবং সকল প্রকার যৌন ক্রিয়ার পিছনে যে শক্তি কাজ করে তাকে বোঝায়, তবু লিবিডো বলতে কেবল যৌন-ইচ্ছা বা আকুতি বুঝায় না। লিবিডো হল-যৌন-মানসশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার জীবনেচ্ছা ও উদ্যমের প্রেরণা ও শক্তি। লিবিডো সম্পূর্ণ রূপে মানসিক শক্তি—দেহাতিক্রান্ত শক্তি। দেহের বিকাশ-বৃদ্ধির সাথে একে এক মনে করলে ভুল করা হবে।[১]

সকল ব্যক্তির মধ্যেই এ শক্তি সমান পরিমাণে থাকে না। লিবিডোর যে বিকাশপর্ব তাও সকলের ক্ষেত্রে একভাবে সমাধা হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে লিবিডোর বিকাশ-বিন্যাস ভিন্নভাবে ঘটতে পারে। লিবিডোর বিকাশ ও পথ পরিক্রমা যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে হয় তা হলেই ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে গড়ে ওঠে। লিবিডোর বিকাশ-পর্য্যায়ের কোন অধ্যায়ে যদি বিশৃঙ্খলা বা জটিলতার সৃষ্টি হয় তা হলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়, ব্যক্তিত্বে নানা প্রকার বৈকল্যের উদ্ভব হয়। ফ্রয়েডের মতে, লিবিডোর বা যৌন-মানস শক্তির পরিমাণ, তার প্রবাহ ধারা এবং তার উপর পারিবেশিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া-এসকল অবস্থার উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের প্রকার ও সংগঠন।

লিবিডোর বিকাশ-ধারা ঃ

ফ্রয়েডের মতে, যৌনেচ্ছা বা যৌন তৃষ্ণার পিছনে যে শক্তি, সে শক্তিই হল লিবিডো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফ্রয়েড 'যৌন' তৃষ্ণা বলতে সঙ্কীর্ণভাবে

---

[১] The Libido is prior to sex—it is a from of the primal life energy which is only later monopolised by the sex instincts It continues to manifest itself in the individual life after the sexual functions have apparently ceased and is the motive force of various interests and pursuits. Mitchell, Problem of Psycho-Pathology.

কেবল যৌন-জীবনকেই বুঝান নাই, সকল প্রকার আসক্তি ও ভালবাসাকে (তার মধ্যে যৌন-জীবনও বাদ নয়) বুঝিয়েছেন। যৌনেচ্ছার অত্যধিক অবদমন থেকেই উদ্বায়ুরোগের উদ্ভব হয়। অবদমিত ইচ্ছারা গতিবেগ সম্পন্ন (dynamic)। এ সকল ইচ্ছা সর্বদাই চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। উদ্বায়ু রোগের সংলক্ষণের মধ্যে এ সকল ইচ্ছার প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত প্রকাশ হয়ে থাকে। এ অবদমন থেকে সর্বদাই যে উদ্বায়ুরোগ হবে এমন কোন কথা নেই, কখনও এ সকল অবদমিত ইচ্ছার উদ্গমনও হতে পারে। এর ফলে অনেক মহৎ শিল্প, সাহিত্য ও কল্যাণকর কাজ হতে পারে। ফ্রয়েড্ এসব থেকে একই কথা প্রমাণ করার প্রয়াস করেছেন যে, মানুষের জীবনে যৌনেচ্ছার গতিপ্রকৃতি, ও এর সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণে যৌনতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান সিদ্ধান্ত করেছেন—

(ক) যৌন জীবনের সূচনা বয়ঃসন্ধিকাল বা নবযুবকালে হয় না। এর প্রথম প্রকাশ জন্মের অব্যবহিত পরেই দেখা যায়।

(খ) কেবল যৌন লিঙ্গের ক্রিয়া কারণের সাথেই যৌনতা বা যৌন-জীবন জড়িত এরূপ ধারণা, ফ্রয়েডের মতে ভুল। অনেক ক্রিয়াকাণ্ড যৌনতার অন্তর্ভুক্ত, যার সাথে যৌনাঙ্গের (genitals) কোন সম্পর্ক নাই।

(গ) যৌনতার প্রধান কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে সুখ আহরণ করা। যৌনতার বংশ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক আছে সত্য, কিন্তু যৌনতা ও বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছা সর্বদা এক নয়। যৌনতা অর্থে কেবল সুখ-স্পৃহা বুঝায়।

ফ্রয়েড যৌনমূলক আচরণ বলে সেই আচরণকেই অভিহিত করেছেন যে আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অপরের সাথে মানসিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। এর সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার প্রবণতা ও প্রয়াসও থাকে। ফ্রয়েডের মতে, যৌন-মানস শক্তির প্রবাহ ধারা ও বিকাশের কতকগুলি স্তর আছে। জন্মক্ষণ থেকেই এ যৌন-মানস শক্তি বিভিন্ন বিকাশ পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ বা মনের ক্রমপরিণতি দুইই এ যৌনমানস শক্তির সুস্থ-গতিপ্রবাহের উপর নির্ভর করে।

লিবিডোর ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে।

(ক) শৈশবকাল (জন্মকাল থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত)

(খ) প্রসুপ্তি কাল (পাঁচ থেকে বার বৎসর)

(গ) নবযুবকাল (বার থেকে কুড়ি/একুশ বৎসর)

ফ্রয়েডের মতে, লিবিডো-বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায় হল শৈশবকাল।

(ক) শৈশবকাল ঃ

ফ্রয়েডের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য এই যে শিশুরও যৌনতা আছে। যৌনতার প্রকাশ নানাপ্রকারে হতে পারে। জন্মকাল থেকে পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত শিশুর আচার আচরণ, ইচ্ছা অনিচ্ছার গতি প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত আসেন যে, এ পর্য্যায়েও যৌনতা বা যৌনেচ্ছার উদ্গম হয় ও তার চরিতার্থতার নানা প্রয়াস চলে। ফ্রয়েড, উদ্বায়ু-রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও দেখেছেন জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরে আকাজ্ক্ষা পরিতৃপ্তিতে বাধা, ও জটিলতা যে ব্যর্থতা ও হতাশবোধ শিশুর জীবনে আনে, তা থেকেই পরবর্তীকালে তার মধ্যে নানা প্রকারের মানসিক জটিলতা ও বিকৃতির উদ্ভব হয়। এ সকল হতাশা বা ব্যর্থতা মূলতঃ জীবনেষণার সাথে যে লিবিডো বা কামশক্তি সম্পৃক্ত তার চরিতার্থ প্রয়াসের ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত। এই কারণেই ফ্রয়েড মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে গেলে শৈশবকালীন যৌনতার যাথার্থ্য বুঝা সমীচীন। এ স্তরে যদিও শিশুর মধ্যে যৌনতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তথাপি এ স্তরে নবযুবকালে যেরূপ যৌনতার উচ্চকিত ও স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়, ততটা স্পষ্টভাবে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। নবযুবকালে যৌন-গ্রন্থির (gonads endocrine glands) কার্য্যকারিতা আরম্ভ হয়, তার ফলে যৌন-আকৃতি ও যৌনতার প্রকাশ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। নবযুবকালে যৌনতার যেরূপ স্পষ্ট একটি উদ্দেশ্য প্রকট হয়, শৈশবকালে যৌনতার তেমন স্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য প্রতীত হয় না। বংশ বৃদ্ধির উপযোগী দৈহিক পরিপক্কতা শিশুর মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু যৌনতার মধ্যে যে সুখ প্রাপ্তির উদগ্র ইচ্ছা থাকে, তার চরিতার্থ প্রয়াস শৈশবকালেও চলতে থাকে[১]।

দৈহিক সুখ প্রাপ্তিই এ স্তরে যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীরের বিশেষ বিশেষ আরামদায়ী অংশ ব্যবহার করে এ সুখ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করা হয়। এ সকল আরামদায়ী শরীর অংশগুলিকে উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করে শিশু সুখ বা আরাম পেয়ে থাকে। আরাম বা সুখের জন্যই সে এ শরীর অংশগুলিকে উদ্দীপ্ত করে। মুখ, হাত, চোখ ও যৌনাঙ্গ (erogenous zones), শরীরের

---

[১] Although the Child manifests sexuality, yet 'the sex drive has not the intensity that it will have in adolescence when the sex glands and hormones have matured, and it does not yet have the de inite aim of the sexually exicted adult,

Woodworth R. S. Contemporary School of Psychology.

এই সকল অংশ যখন উদ্দীপ্ত হয়, তখন যৌন-সুখানুভূতি হয়ে থাকে। এ অবস্থাকে আত্ম-রতি (auto-erotic) পর্য্যায় বলা হয়। লিবিডো বিকাশের এটা হল প্রথম পর্য্যায়। লিবিডো এখন পর্য্যন্তও কোন বাইরের ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হয় না। প্রিয়পাত্র হিসাবে সে অন্যকারও প্রতি আবিষ্ট বা আসক্ত হয় না। নিজের সম্পর্কেই নিজে আসক্ত থাকে। এ পর্য্যায়ে শিশুর যৌনতা পরি-তৃপ্তিতে কোন লজ্জা বা ঘৃণাবোধ থাকে না, কোন প্রকার অপরাধবোধও দেখা দেয় না। ফলে শিশু তার মন যা চায় তাই দেখতে, স্পর্শ করতে, শুনতে, স্বাদ ও ঘ্রাণ নিতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। যেমনি করে পারে শিশু সুখ পেতে চায়, আরাম নিংড়ে নিতে চায়। এরকম আচরণের জন্যই শিশুর যৌন-জীবনকে বলা হয় 'বহুমুখী-অজাচারী' (Polymorphoperverse)। এ সময়ে তার এরূপ আচরণ অস্বাভাবিক ও অনৈতিক কিছু নয়।

এরূপ আত্ম-রতির পর্য্যায় তিনটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়—(ক) মৌখিক (Oral phase) অধ্যায় (খ) পায়ু ও (Anal phase) (গ) লিঙ্গগত অধ্যায় (Phallic phase)।

(ক) **মৌখিক অধ্যায়**—শিশু একেবারে প্রথমাবস্থায় মুখ দিয়ে মাতৃস্তন্য পানের মধ্য দিয়ে তার জৈবিক ক্ষুধা ও লিবিডোর বা যৌনতার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করে থাকে। লিবিডোর বিকাশের এ অধ্যায়টিকেই বলা হয় মৌখিক অধ্যায় (Oral-erotic)। এই সময় শিশু তার মুখের নানাবিধ সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে সুখ আহরণ করে থাকে। প্রথমদিকে চোষা এবং পরে কামড়ান, চিবানো প্রভৃতি কর্ম-কাণ্ড থেকেই শিশু তার যৌনতার পরিতৃপ্তি ঘটায়। ঐ অবস্থাকে বলা হয় মৌখিক-ধর্ষণমূলক (Oral Sadistic) পর্য্যায়, এই সময়েই শিশুর মধ্যে ধ্বংসস্পৃহা স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—আসবাবপত্র ভাঙ্গাচোরা করার মধ্য দিয়ে সে লিবিডোর তৃপ্তি খুঁজে পায়। এই সময় শিশু খুব প্রবল হয়ে উঠে। শিশুর মাতৃস্তন্য পান জৈবিক ক্ষুধার দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু অনেক সময় ক্ষুধা ছাড়াও শিশু মাতৃস্তন চুষতে থাকে, এরূপ চোষণ কার্যের মধ্য দিয়ে শিশু সুখ আহরণ করে এবং এই সুখ, ফ্রয়েডের মতে, যৌনতার সুখ।

(খ) **পায়ু-অধ্যায়**—তিন চার বৎসর বয়সে শিশু মল নিঃসরণ প্রক্রিয়া থেকে যৌন-সুখ আহরণে প্রয়াসী হয়। কখনও কখনও শিশু অধিকতর সুখ পাওয়ার জন্য এ সময়ে মল ইচ্ছা করে আবদ্ধ করে রাখে এবং এর জন্য

মলনালী ও পায়ুদেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা থেকে অধিক সুখলাভের চেষ্টা করে। এ স্তরকেই বলা হয় পায়ু-স্তর। এ সময়ে শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্মী আচরণ, যেমন মায়ের স্তন কামড়ানো, খেতে দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। এজন্য এ অধ্যায়কে পায়ু-আক্রমনতার (oral sadistic) সময় বলেও অভিহিত করা হয়।

(গ) **লিঙ্গ-অধ্যায়**—পায়ু পর্য্যায়ের পরেই দেখা যায় লৈঙ্গিক স্তর (Phallic stage)। এ সময়ে প্রথম শিশু নির্দিষ্ট লিঙ্গস্থানের সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে সুখপ্রাপ্তির প্রয়াস করে। লিঙ্গস্থানের মধ্য দিয়ে যৌনতার তৃপ্তির আগে শিশু মুখ, পায়ু ও অন্যান্য স্থান থেকে যৌন তৃপ্তি লাভ করে থাকে। স্বতঃ কাম স্তরে লিবিডোর আসক্তি প্রথম আপন দেহের সুখানুভূতিতে সীমাবদ্ধ থাকে। এখানেই স্বতঃরতি স্তরের আরম্ভ।

ক্রমে শিশুর অহম বোধ তীক্ষ্ণ হতে থাকে, অহংসত্তার বিকাশ হতে থাকে। স্বতঃকাম স্তরের এটিই হল পরিণত রূপ। এই স্তরকে স্বকাম বা আত্মরতি (Narcissism) বলা হয়।

নার্সিসাস কথাটির একটি বিশেষ পৌরাণিক তাৎপর্য্য আছে। এ কথাটি এসেছে গ্রীক পৌরাণিক নার্সিসাসের কাহিনী থেকে। নার্সিসাস জলে নিজের ছায়াকে ভালবেসে ফেলেছিল। এ থেকেই নিজেকে নিজের ভালবাসা বা আত্মরতির পর্য্যায়টিকে Nercissism বলা হয়।

স্বকামাবস্থা অহংসত্তার বিকাশকে সাহায্য করে, ব্যক্তি সর্বদাই কিছু না কিছু পরিমাণে নিজেকে ভালবাসে। নিজেকে ভালবাসার পরিমাণ যদি অতিমাত্রিক হয় তাহলে ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়। নবযুবকালে স্বকামবস্থার দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়। নবযুবক-যুবতীরা এ সময়ে আবার নূতন করে যেন নিজের প্রেমে নিজেরা হাবুডুবু খেতে থাকে।

লিঙ্গ-স্তরেই ঈডিপাস গূঢ়েষার উদ্ভব হয়। এই স্তরে লিবিডো অহংকে ছেড়ে বাইরের ব্যক্তির সাথে, বিশেষ করে অব্যবহিত সান্নিধ্যে যাঁরা আছেন যেমন মা বাবা তাঁদের সাথে বদ্ধ হতে চায়। সাধারণতঃ ছেলের লিবিডো মা'র সাথে ও মেয়ের লিবিডো বাবার প্রতি আবদ্ধ হয়। ছেলে নিজেকে বাবার সাথে একাত্ম করে মাকে নিজের আসক্তির পাত্রী কোরে তোলে। আর মেয়ে মা'র সাথে একাত্মতা করে বাবাকে একান্তভাবে ভালবাসতে চায়।

প্রথম ক্ষেত্রে, ছেলে মাকে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাবাকে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে মা'কে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ফ্রয়েড শিশুর এই মানসিকতার নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষা। সুপ্তিকাল আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মা বাবার প্রতি যৌনাসক্তি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং এ আসক্তি ক্রমে যৌনতাবর্জিত ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। ঈডিপাস স্তরেই শিশুর অধিশাস্তার অভ্যুদয় ঘটে। মা বাবার আরোপিত বিধি নিষেধ ও তাঁদের ব্যক্তিসত্তার অনেকাংশ শিশুর নিজের সত্তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত ও গ্রথিত হয়ে তার মধ্যে নৈতিক বোধ ও আচরণের একটি মূল্যমান সৃষ্টি করে।

সুপ্তিসময়—যৌন মানস-শক্তির বিকাশ পর্য্যায়ে শৈশবকালের পর আসে সুপ্তিসময়। এই সময়টি পাঁচ থেকে বারো বৎসর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এ সময়ে মনের একটা স্থিরতা আসে ও ঈডিপাস গূঢ়ৈষার সময়ে যে মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা দেখা দেয় তার উপশম হয়। যৌনতা ও স্বকামের বাহ্যিক অভিব্যক্তি এ সময়ে অনেক কমে যায়। বাবা মা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি এ সময়ে শিশুর যে আসক্তি দেখা যায় তার মধ্যে যৌনতার প্রকাশ অত্যন্ত কম থাকে। এই সময়ে অহংসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে, এবং অধিশাস্তাও সৃষ্ট হয়। ঈডিপাস স্তরে যৌনেচ্ছার অবদমনের ফলে পিতামাতা ও শিক্ষকদের সাথে একাত্মতার ফলে অধিশাস্তার সৃষ্টি হয়।

নবযুবকাল—বারো বৎসর থেকে নবযুবকাল আরম্ভ হয়। সাধারণভাবে যৌনজীবন বলতে আমরা যা বুঝি তা এ সময় থেকেই আরম্ভ হয়। শারীরিক দিক থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনগ্রন্থি-র ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এর ফলে মানসিক দিকেও কতকগুলি সুস্পষ্ট পরিবর্তন আসে। যৌন চেতনার উন্মেষ হয় অর্থাৎ ছেলে মেয়ের প্রতি ও মেয়ে ছেলের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। শৈশবকালে যে যৌনতার উদ্বেল ক্রিয়া কাণ্ড চলে যার প্রকাশ সুপ্তিসময়ে স্তিমিত থাকে, সেই শৈশবকালীন যৌনতা যেন নবযুবকালে আবার ফিরে আসে; ফিরে আসে সে উদ্বেলতা ও চাঞ্চল্য। ফ্রয়েডের মতে নবযুবকাল শৈশাবকালেরই পুনরাবৃত্তি। শৈশবকালীন পূর্ণাঙ্গ যৌনাভিজ্ঞতা নবযুবকালে নূতন করে ঘুরে আসে। ভিন্নমুখী উদ্দাম যৌনেচ্ছা ভালবাসা প্রকাশলাভে উন্মুখ হয়ে ওঠে। অধিশাস্তার সাথে বাস্তব সত্তার সাথে এ সকল ইচ্ছার নূতন করে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। এ স্তরটি সম্পূর্ণরূপে ইতররতি পর্যায়ে

পৌঁছুবার আগে স্বকাম (auto-erotic) ও সমরতি (Homosexual) পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এ ইতররতি (Heterosexual) পর্য্যায়েও যৌনেচ্ছা আহত ও অবদমিত হতে পারে, কিন্তু শৈশবকালে এ অবদমন যত তীক্ষ্ণ ও প্রকট হয়, এ সময়ে ততটা প্রকট থাকে না।

শৈশবকাল সমাপনে যৌন মানস শক্তি লিঙ্গস্তরে এসে পৌঁছয় অর্থাৎ যৌন শক্তি উদ্ভূত যে যৌনেচ্ছা তার পরিপূরণ-প্রয়াস মুখ, পায়ু ও অন্যান্য অস্বাভাবিক স্থান ত্যাগ করে যৌনাঙ্গের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। এই স্তরেই লিবিডোর বিচিত্র পথ-পরিক্রমা শেষ হয় এবং শেষ ও স্বাভাবিক লক্ষ্য প্রজনন প্রয়াসে পরিণতি লাভ করে।

মনঃ সমীক্ষণের মূল তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হল :

(১) প্রত্যেকটি আচরণ কার্য্য-কারণ সম্পর্কান্বিত। প্রত্যকটি আচরণের পিছনেই একটি ইচ্ছা কারণ হিসাবে সক্রিয় থাকে। সে ইচ্ছা নির্জ্ঞান মনের হতে পারে, চেতন বা প্রাক্ চেতন স্তরীয়ও হতে পারে। নির্জ্ঞান স্তরীয় প্রেষণার বিশ্লেষণ মানুষের আচরণ অনুধাবনে অধিক পরিমাণে সাহায্য করে।

(২) ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অদস্, অহম্ ও অধিশাস্তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তারই পরিণতি। মানুষের দ্বন্দ্ব চেতনে, প্রাক চেতন মনে বা মনের নির্জ্ঞান স্তরে ঘটতে পারে। নির্জ্ঞান স্তরীয় দ্বন্দ্বই অন্যান্য মনের স্তরের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী ও প্রভাব বিস্তারকারী।

(৩) চেতন মনের দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ নির্জ্ঞান স্তরে অবদমনের মধ্য দিয়ে সমাহিত হয় এবং এরকম দ্বন্দ্ব অধিককাল চলতে থাকলে এবং এর সঙ্গে অবদমন অধিককাল চলতে থাকলে গূঢ়ৈষার (Complex) উদ্গম হয়। নির্জ্ঞানে এই সকল গূঢ়ৈষা মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতার উদ্রেক করে। এ যন্ত্রণা ও অস্থিরতা ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপন বিঘ্নিত করে—এ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্য ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিক সঙ্গতি ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যক্তি নানা প্রকার প্রয়াস করে থাকে। এ সকল প্রয়াস নানা প্রকারের হতে পারে। ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য জোড়াতালি দিয়ে রাখার একটা চেষ্টা ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে। এ সকল প্রয়াসকেই বলা হয় আত্মরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism).

এই সকল গূঢ়ৈষা যখন অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে, তখনই এ থেকে উদ্বায়ু রোগ (Psycho-neuroses) বা উন্মাদ রোগের (psychoses) প্রকোপ দেখা দেয়। অন্তবিধ ব্যক্তিত্বের অসুস্থতা ও জটিলতাও এ থেকে হতে পারে।

(৪) অদসের সাথে, অহম ও অধিশাস্তার যে দ্বন্দ্ব তা মূলতঃ প্রবৃত্তিগত তাড়নার সাথে অর্জ্জিত সমাজ ও আত্মিক বোধ ও চেতনার দ্বন্দ্ব।

এই সকল যৌন তাড়নার মধ্যে জীবনতাড়না বা জীবণেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তাড়নার মধ্যে যে শক্তি কাজ করে তা যৌন-মানস শক্তি। যৌন প্রেষণা যদি প্রতিহত হয়, ব্যর্থ হয় তা হলে দ্বন্দ্ব ও অবদমন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এবং এ যৌন তাড়না নবযুবকালে আরম্ভ হয় না। জন্মক্ষণ থেকেই এ যৌন তাড়না নানাভাবে প্রকাশ পায়। এ তাড়নার প্রধান কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ (কাম স্থান erotic zones) থেকে সুখ আহরণ করা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগ—The use of Psycho-Analysis in Education :

(ক) **মনঃসমীক্ষণ শিক্ষার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচীন ধারণাকে পরিবর্ত্তিত করেছে** এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আরও ব্যাপক করেছে। এতকাল পর্য্যন্ত শিক্ষার কাজ ছিল প্রবৃত্তিকে সংযত করার নামে প্রবৃত্তিকে জোর করে চেপে দেওয়া বা দাবিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এর পরিণাম অবশ্য কখনও ভাল হত না। এবং অনেক শক্তির অপচয়ে অত্যন্ত অফলপ্রসূভাবে যে এ সব আপাত অসুবিধা সৃষ্টিকারী প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ সত্য কারো কাছে মনঃসমীক্ষণের সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে উন্মোচিত হয় নি। শিক্ষার উদ্দেশ্য যৌন প্রবৃত্তিগুলির অবদমন নয়,'এর উদ্গতি সাধন। প্রবৃত্তির শক্তিকে বিনাশ করার অস্বাস্থ্যকর অপপ্রয়াস না করে তার গতিশক্তিকে কল্যাণকর পথে নিয়ন্ত্রিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা এখন আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কেবল বিধি নিষেধের তালিকা নয়। কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। মনঃসমীক্ষণের জ্ঞানালোক শিক্ষার দিগন্তকে আরও প্রসারিত করেছে—সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। এর অর্থ হল এই যে, আবেগগত জীবনের (emotional life) সুস্থতা, আবেগের সুস্থ বিকাশ ধারাও শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ। এখানেই আসে নির্জ্ঞান মনের কার্য্যকারিতা ও আবেগজীবনে তার প্রভাবের কথা। আবেগ জীবনের গভীরে

যেতে হলেই মনের নির্জ্ঞান স্তরের ক্রিয়া-কর্মের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক জানতে হবে। তাছাড়া কর্মপ্রেরণার উৎস শক্তিও নির্জ্ঞান মন থেকেই উৎসারিত।

সমাজ জীবনের সাথে যাতে সুস্থ ও সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ব্যক্তি চলতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের গতি প্রকৃতি নির্ণিত হয়।

(খ) **মনঃসমীক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত** করতে পারে এমন কতকগুলি প্রেরণাদায়ী উদ্দীপক ও পদ্ধতির অবতারণা করেছে। মনঃ-সমীক্ষণের আবিষ্কৃত সত্যকে আধুনিক প্রগতিবাদী সকল শিক্ষাবিজ্ঞানীই গ্রহণ করেছেন। মনঃসমীক্ষণ প্রদর্শিত এ পদ্ধতিগুলি বিশেষ ভাবে শৈশবকালীন শিক্ষাপর্বে গ্রহণযোগ্য। এ পদ্ধতিগুলির নিম্নে বর্নিত হল—

(১) স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন—শিশুর পিতামাতা ও পিতামাতার পরিবর্তস্বরূপ শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধকে রক্ষা করতে হবে। পেষ্টালোৎসি, ফ্রয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদগণও এ সম্বন্ধে বহু পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

(২) প্রবৃত্তির গতি-শক্তিকে যথার্থরূপে ব্যবহার করা।

(৩) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মর্য্যদা দেওয়া।

(৪) শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলা।

(৫) শাস্তি অপেক্ষা পুরস্কার, নিন্দা অপেক্ষা উৎসাহদান ও প্রশংসাসূচক অভিব্যক্তি অধিক কার্য্যকরী। শিক্ষার্থী প্রশংসা ও পুরষ্কারের যথার্থ যোগ্য হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে নিজের গুণাগুণকে পুষ্ট করার অভিপ্রায় পরিশ্রমী হয়ে ওঠে।

(গ) বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার শক্তির পার্থক্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। এ পার্থক্যের কারণ বুদ্ধির পার্থক্যের জন্য হয় এটাই আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল, মনঃসমীক্ষণ এ সত্য অস্বীকার করেছে। তাঁদের মতে বিষয়বস্তুর সাথে নির্জ্ঞান মনের কতটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, নির্জ্ঞান মনে থেকেই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভালবাসার সঞ্চার হচ্ছে কিনা তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু গ্রহণ করার শক্তি।

এ বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ব্লান্‌চার্ড (Blanchard) দেখেছেন যে, কোন বিষয় পড়তে গিয়ে ব্যক্তির অসুবিধার কারণ মূলত আবেগগত। দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্বের জটিলতা থেকেই পড়তে গিয়ে বাধো বাধো ভাব, ভুল পড়া, লিখতে

গিয়ে ভুল লেখা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এ সকল দ্বন্দ্ব ও আবেগ জর্জ্জরতা অধিকাংশক্ষেত্রেই শিশুর সাথে পিতামাতার অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হয়। পিতামাতার কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত স্নেহ ভালবাসা না পাওয়া, তাদের নির্মম আচরণ শিশুকে মানসিক দিক থেকে আহত করে, শিশু নিজেকে অত্যন্ত নিরাশ্রয় বোধ করে—পিতামাতা সম্পর্কে একটা ক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়। একটা অনুচ্চারিত দ্বন্দ্ব একদিকে পিতামাতাকে ভালবাসা, অপরদিকে তাদের সম্বন্ধে ঘৃণাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। এ দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য অবদমন আরম্ভ হয় এবং স্বভাবতঃই এ অবদমনে প্রচুর মানসিক শক্তি অপচিত হয়। অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ মানসিক শক্তি নিয়ে পড়াশুনা ও লেখাপড়া যাই করা হয় তাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যায়। পড়াশুনার জন্য যে মনঃসংযোগ প্রয়োজন সে একাগ্র মনোযোগ এরা দিতে পারে না।

(ঘ) মনঃসমীক্ষণ যথার্থ শিক্ষার জন্য সুস্থ পরিবেশ রচনায় আগ্রহী। বিদ্যালয়ের ও গৃহের পরিবেশকে এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন শিশুর মধ্যে অবদমনের প্রকোপ যথাসম্ভব কম ঘটে এবং প্রবৃত্তির উদ্গতি সাধনের সমস্ত প্রকার সুযোগ থাকে। সৃজনশীল আনন্দমুখর খোলামেলা পরিবেশই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল। 'এটা কোরো না, সেটা কোরো না' এ রকম সব সময় বিধি নিষেধ আরোপ অপেক্ষা, কি করবে সেটা নির্দেশ দেওয়াই স্বাস্থ্যকর। সৃজনশীল কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তার মধ্য দিয়ে যাতে সে তার যৌন প্রবৃত্তির গতি-শক্তিকে তার জৈবিক পথ থেকে সামাজিক ও আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দিতে পারে সেই দিকেই শিক্ষকের নির্দেশনা ও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া সমীচীন।

(ঙ) শিশুদের শিক্ষাদানে খেলার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য মনঃসমীক্ষণ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর মনের ইচ্ছা অভিলাষ, আবেগ উচ্ছলতা প্রকাশ পায়। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে। কেননা খেলার মাধ্যমেই শিশু তার ইচ্ছা, আনন্দ-উদ্বেলতা, ভয়-ভাবনা, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রতিন্যাসের প্রকাশ করে। বিভিন্ন বয়সে শিশুর স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর মনঃসমীক্ষণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বয়সের ধর্ম অনুযায়ী শিশুর খেলার সরঞ্জাম যোগাতে হবে যাতে করে তার স্বাভাবিক

বিকাশ হতে পারে। খেলার সরঞ্জাম এমন হবে যা শিশুকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ নির্বাধ কল্পনাশ্রয়ী খেলায় আগ্রহী করতে পারে। আবার এমন সব সরঞ্জাম থাকবে যা দিয়ে খুব নিয়ম নিবদ্ধ খেলাধূলাও করা যেতে পারে। মেলানি ক্লেইন (Melanie Klein) প্রমুখ মনঃসমীক্ষকগণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানসিক বৈকল্য সারিয়ে তোলার জন্য খেলা-ভিত্তিক মানসিক চিকিৎসার প্রবর্তন করেছেন।

(চ) মনঃসমীক্ষণের নূতন অলোকই 'শিশু-নির্দেশনা' (Child Guidance), মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা এবং শিশুর স্বাধীনতা বা তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দগতি প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলনের সূচনা করেছে। শিশু নির্দেশনা আন্দোলন থেকেই শিশু-নির্দেশনা চিকিৎসাগার (Child guidance clinic) স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধ হয়েছে এবং এ থেকে বস্তুতঃ বহু শিশু-নির্দেশনা চিকিৎসাগার স্থাপিত হয়েছে। শিশুর মূল্যায়নে, শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণ আধুনিক মানুষকে আরও সজাগ করেছে। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা, যা আধুনিক শিক্ষা-ধারার মূল বৈশিষ্ট্য তার সাথে মনঃসমীক্ষণও সুর মিলিয়ে এই সত্যকে আরও সোচ্চার করে তুলেছে।

নিয়ম শৃঙ্খলা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন মনঃসমীক্ষণই করেছে। শাসন তর্জন গর্জনের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা আনয়নের যে চেষ্টা-পূর্বে প্রচলিত ছিল তা যে মানসিক দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর এবং এরূপ আপাত শৃঙ্খলাপরায়ণতার আড়ালে অধিক বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনাই যে অধিক লুক্কায়িত, এবিষয়ে মনঃসমীক্ষণ তার পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে আলোকপাত করেছে। এখন শিশুর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতিশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তার মধ্যে সুন্দর সুস্থ স্থায়ী অনুভূতি (sentiments), জীবন সম্বন্ধে সুস্থ বোধ ও প্রতিন্যাসের উন্মেষ ঘটাতে হবে। শৃঙ্খলাকে এইভাবে অন্তর্জাত, জীবনকে সুস্থ পথে নিয়ন্ত্রণকারী একটা স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি রূপে তৈরী করতে হবে। ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা শৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটি সুস্থ ধারণার প্রবর্তন করে বিদ্যালয়ের কর্মধারা, শিক্ষকের দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন দিকের উন্মোচন করেছেন। শিক্ষক এখন আর কেবল বিষয়জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে শিক্ষার্থীকে তথ্যজ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করার কাজে নিযুক্ত নন। শিক্ষকের সমগ্র ব্যক্তিত্ব প্রভাবে, তার নিপুণতা দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্থ জীবন বোধ ও সুস্থ আচরণের উন্মেষ ঘটানোও শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক জীবন-শিল্পী।

(ছ) জীবনের অতি প্রত্যুষকালের জীবনাচরণ, পরিবেশ প্রভাবই

ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। ফ্রয়েডের মতে শিশুর পাঁচবৎসর কালের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের কাঠামো তৈরী হয়ে যায়। মনঃসমীক্ষকদের মতে শিশুর প্রথম পাঁচবৎসরে বিশেষ প্রযত্ন ও পরিচর্য্যা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়—শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সকল অপসঙ্গতি দেখা যায় তার বীজ প্রথম পাঁচবৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত থাকে। গৃহ-পরিবেশের ও পরিচর্য্যার অসুস্থতার জন্য যে অপসঙ্গতির উদ্ভব হয়, পরে বিদ্যালয়ে তার নিরাময় করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।[১] প্রাক-প্রাথমিক পর্য্যায়ের শিক্ষার গুরুত্ব যে প্রাথমিক স্তর অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, এ সত্য মনঃসমীক্ষণই উদ্ঘাটন করেছে। পিতামাতার ব্যক্তিত্ব, তাদের জীবন-ভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী শিশুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে শিক্ষিত করে তোলে—পিতামাতাই শিশুর প্রথম শিক্ষক। শিক্ষাক্ষেত্রে পিতামাতার শিক্ষাদান, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক যে কত গভীরভাবে কাজ করে, এ সম্বন্ধে মমঃসমীক্ষণই যথার্থভাবে আলোকপাত করে। এদিক থেকে মনঃসমীক্ষণ সন্তান প্রতিপালনের স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি জানার জন্য পিতামাতার নিজেদের যথার্থভাবে শিক্ষিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্তানের বয়ঃক্রমঅনুযায়ী খাদ্য-তালিকা, সন্তানের আবেগ-জীবনকে সুস্থ করে তোলার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও উপায়, শিশুর মধ্যে সুস্থ অভ্যাস গঠনের কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে এক কথায় শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পিতামাতাকে যে যথার্থভাবে জ্ঞানী হতে হবে, এ বিষয়ে মনঃসমীক্ষণ গভীরভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

(জ) শৈশবকালেই মূল্যবোধের জন্ম হয়। এ মূল্যবোধের ভিত্তি হল, অধিশাস্তা (Super-ego)। অধিশাস্তা শৈশবেই বহুল পরিমাণে গঠিত হয়ে যায়। সুষম অধিশাস্তা গঠনের জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকের অনেক দায়িত্ব আছে। ইতিবাচক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে, পিতামাতা ও শিক্ষকের সুস্থ জীবনাচরণের মধ্য দিয়েই সুস্থ ও সুষম অধিশাস্তা তথা সুস্থ মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। কেবল ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে সুস্থ মূল্য বোধ গড়ে তোলা যায় না। অধিশাস্তা গঠন, ও জীবনে তার যে কত গভীর প্রভাব এ সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণই প্রথম আলোকপাত করে।

(ঝ) আধুনিক যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও মনঃসমীক্ষণ যথার্থ

[১]Many of child's class room difficulties are the surface manifestations of a deep-rooted Problem which has its origin in his Pre-school experiences, Rivlin, Educatiou for Readjustment.

গুরুত্ব আরোপ করেছে। শৈশবকালীন যৌন-জীবনের সত্যকে মনঃসমীক্ষণ স্বীকার করায়, যৌন-বিষয়ক জ্ঞান পূর্বে যতটা ধিকৃত হত, এখন আর ততটা হয় না। এখন একটা বয়স পর্যন্ত এরূপ আচরণ অস্বাভাবিক নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ফলে এ সকল বিষয়ে, অযথা পাপ-বোধের সৃষ্টি না করে যৌন-জীবনের স্বাভাবিক গতি-বিধি ও যৌন-মানস শক্তির (Libido) যথার্থ উদ্গতির জন্য সুস্থ পরিবেশ রচনা করতে হবে। নবযুবকযুবতীদের যৌন-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতা (Infantile Sexuality) বিষয়ে মনঃ-সমীক্ষণ প্রদত্ত জ্ঞান, শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো, তা ছাড়ানো, মল-মূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়েও মাকে বিশেষ ভাবে সচেতন করে তুলেছে।

(ঞ) মনঃসমীক্ষণের জ্ঞান শিক্ষককে শিশু-আচরণের কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। শিশুর নির্জ্ঞান-মানসকে যথাসাধ্য জানার চেষ্টা করতে হবে। ঠিক ঠিক ভাবে শিশুকে পরিচালনা করতে হলে শিশুর নির্জ্ঞান মানসকে জানতে হবে। শিশুর নির্জ্ঞান আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে।[২]

তাছাড়া মনঃসমীক্ষণের জ্ঞান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠনেও সাহায্য করতে পারে। শিক্ষকের নিজের মধ্যেই যদি গূঢ়ৈষা বা জট থাকে, সে জটের কারণ নির্ণয় ও তার মুক্তি-পথ শিক্ষক আত্ম-সমীক্ষণের মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণে আবিষ্কার করতে পারেন।

অনুশীলনী
দ্বাদশ অধ্যায়
সমস্যামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার

1. What is a problem behaviour ? Give examples of a few problem behaviours and suggest their remedies.

2. Whom do you call problem children ? Briefly discuss the procedure you would follow for guiding such children.

[২] "The Content of the unconscious is an essential part of the pupil's nature, and must be known in a general way if the pupil is to be intelligently handled". Adams, Modern Development in Educational Practice

3. How do problem children create poblem? How should a teacher guide problem children?

4. Elucidate the main causes of problem behaviour. Suggest a few remedial measures.

5. Show how the school may be a cause of maladjustment among its pupils. Illustrate your answer.

6. Indicate the chief factors that led to the retardation of the mental development of the child.

7. Elucidate the main causes of indiscipline in educational institutions. Mention a few remedial measures.

8. What are the causes of mental diseases and difficulties of the children?

9. Give a brief account of some problems of maladjustment of adolescent students to their academic and social surroundings.

10. What is maladjustment? Explain in this content the connotation of the term 'adjustment'. What are the common types of school maladjustment?

11. Write notes on:

Negativism.
Compensation
Truancy
Lying
Stealing
Enuresis
Day-dreaming.

অনুশীলনী

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়

শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও ক্রোধ—এর প্রতিকার

1. Describe some abnormal forms of fear. Suggest probable causes and remedial measures,

2. Describe some undesirable fears in school children. Suggest a few remedial measures.

3. Discuss the role of anger in the child's mental life. How will you control anger in children?

4. What are the origins of fear in the child? Discuss the uses of fear in the social and mental life of the child.

5. Discuss the importance of anger in the child's life. How does anger help and inhibit the proper adjustment of the child?

6, Write notes on:

Temper Tantrum
Castration fear
Phobia
Reconditioning of fear
Jealousy
Fear and Anxiety.

অনশীলনী (১)

পঞ্চদশ অধ্যায়

1. Write an essay on Freud's concept of the unconscious.

2. Discuss the role of the unconscious in the normal life of man.

3. Elucidate the modern concept of the unconscious and its normal functions in the life of man.

4. Give a short account of the concept of the unconscious and the basic principles of psycho-analysis.

5. What are conflicts? How are they generally formed? Suggest a general method for solving conflicts in children.

6. Indicate the effect of mental conflict on the mental health of an individual.

7. What are complexes? How are they formed? Describe the detrimental effects of complex in the life of an individual.

8. Define a complex. Explain how repressed complexes manifest themselves.

9. Delineate the basic principles of Psycho-analysis.

10. Write an essay on the influence of the psycho-analytic school of psychology upon educational practices.

11. Estimate the impact of the knowledge of psycho-analytical principles in understanding and manipulating school-problems in an effective way.

12. Does the knowledge of psychology of the unconscious help the teacher to understand some problem behaviour of his students in a better way? Does this knowledge help him too to devise a suitable method of treatment for the problem children?

13. Discuss according to Freud different stages of the development of libido.

14. Discuss the concepts of Fixation and Regression. What role do they play in the personality development of a child.

15. Delineate the concept of Libido after Freud. In this connection discuss the views of Adler & Jung on either concept of libido.

16. What do you mean by the term "Psycho dynamics of unconscious mental function?" What is unconscious dynamics? Illustrate your answer.

17. Give Freud's account of Instincts? Explain in this connection his principle of dualism.

18. Describe the phenomenon of the development of super-ego. How is its development related to the mental health of an individual?

19. Explain the significant characteristics of Id, Ego & Super-ego and point out their mutual relations.

20. Give a brief account of the psycho-analytical conception of mind. Add your comments.

21. Elucidate the basic concept of Psycho-analysis. How is the concept useful in Mental Hygiene?

22. Write notes on :

(1) Resistance.
(2) Transference.
(3) Psycho-analysis & Education.
(4) Infantile sexuality.
(5) Eros & Thanatos.
(6) Pleasure & reality principle.
(7) Dream-analysis,
(8) Development of Mind.

ষোড়শ অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস

(Defence Mechanism)

কতকগুলি বিশেষ অবস্থা ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ পথে প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করে এবং এ অবস্থা হতাশা ও দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায়। এই দ্বন্দ্ব ও হতাশা ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা আছে যা এই সকল মানসিক বিপর্যয় থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করার প্রয়াস করে। এ সকল প্রয়াস ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উদ্দিষ্ট যে ভারসাম্য একদিকে অদস ও অন্যদিকে অহম—অধিশাস্তার বিপরীতমুখী ইচ্ছার দ্বন্দ্বের দ্বারা বিপর্যস্ত। এ সকল প্রয়াস অহমের (Ego) প্রয়াস। অদস ও অধিশাস্তার দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের প্রয়াস অহম করে থাকে। নির্জ্ঞানস্থিত অহমের ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণপ্রয়াসকেই ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস (Defence Mechanism বা Ego defence) বলে।

শরীরের ভারসাম্য রক্ষা, তার সুস্থতা বজায় রাখার জন্যও শরীরের মধ্যে কতকগুলি উপায় আছে। শারীরিক গঠন-বিন্যাস আমাদের এরূপ যে, বাইরের বিপদের সম্মুখে শরীরের মধ্যেই এমন কতকগুলি প্রক্রিয়া ঘটে যায়, যার ফলে শরীরের ভারসাম্য আবার ফিরে আসে। যেমন, শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্তবন্ধ-হওয়ার চেষ্টা বাইরে থেকে করার জন্য ঔষধ পত্র দেওয়া হয় বটে, কিন্তু শরীরের মধ্যে এমন শরীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে যে, রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রবণতা শরীরের মধ্যেই উপস্থিত হয়। যদি শরীরের পক্ষে অহিতকর কোন খাদ্যবস্তু কেউ খেয়ে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বমির উদ্রেক হয়। শরীরের পক্ষে মারাত্মকভাবে যা ক্ষতিকর তাকে পাকস্থলী বের করে দিতে চায়। শরীরে যদি কোন দূষিত জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে অনেক সময় শরীরের মধ্যেই এমন রাসায়নিক বস্তু (anti-body) সৃষ্ট হয় যা সেই জীবাণুর অহিতকর ক্রিয়াকে প্রতিহত করে।

শারীরিক দিকে যেমন শারীরিক ভারসাম্য ও সুস্থতা রক্ষার কতকগুলি উপায় আছে, মানসিক দিক থেকেও মনের কতকগুলি শক্তি আছে। মানসিক কতকগুলি ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঘটে, যা ব্যক্তিকে মানসিক দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, জর্জ্জরতা

থেকে রক্ষা করে, ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করে। অহং সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হওয়ার আগেই এমন কতকগুলি প্রয়াস পর্বের অবতারণা করে যা ব্যক্তির দ্বন্দ্বজর্জ্জরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করে। ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা রক্ষা করার চেষ্টা করে, এবং অস্বস্তিকর অবস্থায় সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে সাহায্য করে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে জিনিসটা আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে। কোন একটা সমস্যার সম্মুখীন হলে বা কোন অস্বস্তি উদ্রেককারী ঘটনার দ্বারা পিষ্ট হলে ব্যক্তি নানা উপায়ে সে অবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে—নানাভাবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। যেমন ধরা যাক, একজন ছাত্র তার বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়ন নিয়ে নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সে বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষার ফলও খুব খারাপ করছে। এ রকম অবস্থায় ছাত্রটির মধ্যে নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সে তার ব্যর্থতাকে নানাভাবে নিতে পারে এবং এ ব্যর্থতা বিদূরণের জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারে। সকাল সন্ধ্যা সব সময় পাঠে রত হতে পারে, আবার এমন একটা মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে পারে যাতে সে ভেবে আনন্দ পাবে বিজ্ঞান বিষয়গুলি তেমন একটা প্রয়োজনীয় কিছু নয়, কাজেই ও সব বিষয়ে পড়াশুনার সার্থকতাই বা কি! এমনও হতে পারে, সে নিজে পড়াশুনা কিছু করল না কেবল পড়াশুনায় ভাল এমন সব ছেলেদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করল এবং একটা ভাব দেখাতে থাকল যেন ভাল ছেলেদের সাথে মিশে মিশে সে-ও ভাল হয়ে গেছে। আবার যে অধ্যাপক পড়ান তাঁর পড়ানো সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিযোগের অবতারণা করতে পারে। তার মত আরও অনেক ছাত্রেরও যে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার অসুবিধা হচ্ছে তার উল্লেখ করেও নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টা করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, সে অসুস্থ হয়ে গিয়ে পরীক্ষায় যাতে না বসতে হয় তার সব ব্যবস্থা করতে পারে। কিংবা কল্পনায় সে নিজেকে একজন কৃতী ছাত্র ভেবে মশগুল থাকতে পারে।

ব্যর্থতার সাথে সম্মুখীন হওয়ার কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পথ, কত বিভিন্ন প্রকারের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শ্রেণীকরণ সম্বন্ধে সকল মনোবিদ যদিও একমত নন, তবু কতকগুলি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকলেই একমত।

প্রতিরক্ষা কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু-প্রকার। (১) অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার চেষ্টা। (২) অদসের ইচ্ছার যতটা সম্ভব চরিতার্থ করা। মোটের উপর বাস্তবের সাথে যতটা

সম্ভব মানিয়ে চলাই এ উপায়গুলির উদ্দেশ্য। এই কারণেই এ প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিযোজন প্রক্রিয়াও (Adjustment mechanism) বলা হয়ে থাকে। এ সকল প্রক্রিয়ার মধ্যে পূরণ-প্রয়াস (Compensation), অপযুক্তিকরণ (Rationalisation), অভিক্ষেপ (Projection), একাত্মকরণ (Identification), উদ্গতি সাধন (Sublimation), অবদমন (Repression), প্রত্যাবৃত্তি (Regression), স্বপ্নচারিতা (Phantasy & Day dreaming), রূপান্তর (Conversion), বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন (Reaction Formation), প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক এক ক'রে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

পূরণ-প্রয়াস (Compensation) :

কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের কম্‌তিকে অন্য বিষয়ে (যাতে তার কোন কম্‌তি নেই) ব্যুৎপত্তি লাভের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে তখন সে প্রয়াসকেই পূরণ প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয়। ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ে ব্যর্থতাকে বা অক্ষমতাকে অন্য কোন বিষয়ে স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের সম্বন্ধে ধারণাকে উচ্চমার্গী করতে চায় তখন সে অবস্থাকেই বলা হয় পূরণ-প্রয়াস। যেমন কোন ছেলের যদি শারীরিক কোন খুঁৎ থাকে, তাহলে তার যে অক্ষমতা ও অসমতা তাকে পরিপূরণ করে নিজের মানকে সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পড়াশুনায় ভাল করার প্রয়াস চালাতে পারে। খেলাধূলা, নাটকানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কিংবা চলাফেরা কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা চমক আনার চেষ্টা করতে পারে যাতে বস্তুতঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং সেও যে একটা কম কিছু নয় এটাকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

এ পূরণ প্রয়াস অনেক সময় ভালর দিকে হতে পারে যেমন পরীক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে এমন ছেলে পড়াশুনায় খুব মনোযোগী হয়ে উঠে, পড়াশুনায় খুব ভাল ফল করতে পারে। ডেমোস্থেনিস্ প্রথমদিকে ছিলেন তোৎলা, পরে সেই ডেমোস্থেনিস (Demosthenes) প্রতিজ্ঞার দ্বারা চালিত হয়ে আপন প্রয়াসে গ্রীসদেশের বড় বাগ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কখনো কখনো, এ পূরণ প্রয়াস অস্বাস্থ্যকর ও অসামাজিক রূপও নিতে পারে। যেমন কোন ছেলে বাবা ও মার স্নেহ প্রযত্ন থেকে বঞ্চিত, বাবা মা তার সাথে অত্যন্ত নির্মম আচরণ করে থাকে, এ অবস্থায়, বাবা মার স্নেহ-বঞ্চনাজনিত যে ক্ষত, নিজের সম্বন্ধে যে হীনতাবোধ তাকে পূরণ করার

জন্য সেও ক্লাসের ছেলের সাথে অত্যন্ত বিরূপ আচরণ ও নির্মম আচরণ করে থাকে। মারধর করা, গালমন্দ করা, এবং তার থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছেলেদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা প্রভৃতি সংলক্ষণমূলক (Symptomatic) আচরণের মধ্য দিয়ে সে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে।

অপযুক্তিকরণ (Rationalisation):

কোন ব্যক্তি যখন তার প্রযুক্ত কাজে ব্যর্থতা বোধ করে, কিংবা কোন সমস্যার সমাধান সঠিক ভাবে করতে পারে না, বা সমাজ ও আত্মিক অনুশাসন বহির্ভূত কোন কাজ করে, তখন নিজের দোষস্খালনের জন্য, কখনও বা ব্যর্থতা বোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য স্বপক্ষে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। যথার্থ যুক্তি অপেক্ষা যাহোক করে একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার প্রবণতাই বেশী পরিলক্ষিত হয়।

'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা'; 'আঙুর ফল টক' এ ধরণের যুক্তির অবতারণা অপযুক্তিকরণের উদাহরণ। কোন ছাত্র হয়ত পরীক্ষায় দু'তিনবার উত্তীর্ণ হতে পারল না, তখন সে নিজে এ রকম একটা যুক্তির অবতারণা করে স্বস্তি পেয়ে থাকে যে, যারা বোকার মত না বুঝে সুঝে মুখস্থ করতে পারে, আজকাল তারাই কেবল পাশ করতে পারে—ভাবখানা তার এ রকম যে, বুঝে সুঝে পড়ে বলেই সে পাশ করতে পারছে না।

কেউ হয়ত একটা বড় চাকুরীর জন্য ইণ্টারভিউ দিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরীতে নির্বাচিত হ'ল না। এরকম অবস্থায় সে হয়ত মনকে প্রবোধ দিতে থাকল, চাকরীটা না হয়ে ভালই হয়েছে। হলে পরে কতদূরে যেতে হত, মাইনে হয়ত অনেকটা বেশী হত, কিন্তু তাতে টাকার গরমটাই বেড়ে যেত, আসল উন্নতি কিছু হত না।

এ রকম যুক্তির অবতারণা ব্যক্তি যে জেনে শুনে ভেবে চিন্তে করে তা নয়, আপনা আপনি এটা হয়ে যায় এবং ব্যক্তি যে আসল ঘটনাকে বিকৃত করছে ও আত্মপ্রবঞ্চনা করছে সেটা অবহিত থাকে না। এরকম অবস্থায় ব্যক্তি তার আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার আসল বাস্তব সম্পর্কযুক্ত কারণ সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত থাকে না এবং এরকম কিছুদিন চলতে থাকলে তার মধ্যে ভ্রান্তবীক্ষণও দেখা দিতে পারে (Illusions)।

অভিক্ষেপ (Projection):

অভিক্ষেপ অপযুক্তিকরণের এক বিশেষ উপায়। কোন ব্যক্তির নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, ঢাকার জন্য অদসের ইচ্ছার প্রকোপ ও অধিশাস্তা ও অহমের

তাতে বাধাদান এবং তজ্জনিত যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা তা থেকে মুক্তি অভিলাষে ব্যক্তি অপরের ওপর নিজের ইচ্ছাকে আরোপ করে থাকে। নিজের ত্রুটিকে না দেখে, সেই ত্রুটি অপরের মধ্যে সে দেখে নিজেকে হাল্কা করতে চায়।

একজন ব্যক্তি হয়ত মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত। সেই ব্যক্তিই আবার অন্যকে মিথ্যা কথা বলার দায়ে অভিযুক্ত করছে। একজন ছাত্র পরীক্ষায় নকল করে, সেই আবার বলে বেড়াতে থাকল যে ক্লাসের সকলেই নকল করেছে, সকলেই বই দেখে লিখেছে। এটা প্রায়ই দেখা যায় যাদের মধ্যে দোষত্রুটি বেশী তারাই অপরের সমালোচনায়, অপরকে গালমন্দ করায় অগ্রণী ও সদা রত হয়। নিজের দোষস্খালন ও ঢাকার এটা একটা প্রশস্ত পথ হিসাবে এরা বেছে নেয়। কোন ব্যর্থতা ত্রুটির জন্য নিজের দোষ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে দায়ী না করে যখন অপরকে দায়ী করার চেষ্টা করা হয়, তখনই অপরকে দায়ী করে নিজের অসামাজিক ইচ্ছাজনিত যে মানসিক যন্ত্রণা ও অসমতা দেখা দেয় তা থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াস করা হয়। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে অভিক্ষেপ (Projection) বলা হয়। কোন স্ত্রী স্বামীকে এই বলে ঘৃণা করে যে তার স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত এবং তার প্রতি যথাযথ মনোযোগ নেই। আসলে স্ত্রীলোকটির অবচেতন মানসে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি রয়েছে, স্বামীর প্রতি যথাযথ মনোযোগ নেই—এই ত্রুটি, এই অবৈধ ও অসামাজিক ইচ্ছা মনে উঁকি দিচ্ছে দেখে তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার উদ্রেক হয় তা থেকে নিজেকে হাল্কা করার জন্য নিজের ইচ্ছাকে স্বামীর মধ্যে অভিক্ষেপ করছে। ব্যক্তির মধ্যে অভিক্ষেপ (Projection) ক্রিয়াটি কাজ করে।

একাত্মকরণ (Identification) :

ইচ্ছা পূরণের এটা একটা পরোক্ষ উপায়। অদসের অনেক ইচ্ছা যা সমাজে চরিতার্থ হবার পথে অনেক বাধা ও প্রত্যক্ষভাবে যা বস্তুতঃ চরিতার্থ করা যায় না, তাকে পরোক্ষভাবে একাত্মকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অবচেতন ভাবে চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। নিজেকে অভিপ্রেত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম করে। তার মধ্য দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করা হয়। নিজেকে পিতার সাথে একাত্ম করে শিশু তার অক্ষম বাসনাকে চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। পিতার সাথে নিজেকে এক ভেবে শিশু পরম আত্ম প্রসাদ লাভ করে। সিনেমা দেখতে গিয়ে, কোন উপন্যাস পড়তে পড়তে নায়ক নায়িকার সাথে একাত্ম হয়ে নিজেদের অবদমিত পুঞ্জীত বাসনাকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি ডানা

মেলে উড়তে চায়। অক্ষম বাসনার পরিতৃপ্তিতে একাত্মকরণ অনেক পরিমাণে কাজ করে। ছেলে পিতার সাথে মেয়ে মা'র সাথে একাত্মকরণ করে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে একাত্মকরণ করে থাকে এবং তাঁদের চিন্তা ভাবনা আচার আচরণকে অনুসরণ করে। আমাদের যে সব গুণপনা নেই, অথচ যে সব গুণপনার অধিকারী হতে আমরা সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করি, সেই সব গুণান্বিত ব্যক্তিদের সাথে একাত্মকরণ করে আমাদের অভাব পূরণ করার প্রয়াস করে থাকি। বীর পূজা (Hero worship) একাত্ম-করণের একটি প্রকার।

একাত্মকরণের মধ্য দিয়েও চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন একদিকে যেরূপ ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় একাত্মকরণে ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হয়। যেমন যে গুণপনা ব্যক্তি নিজেই অর্জন করতে পারে, সে ওই গুণপনা অর্জনে প্রয়াসী না হয়ে, অভিপ্রেত গুণপনা যে ব্যক্তির আছে তাঁর সাথে একাত্মকরণ করেই কল্পনায় সেও যেন ঐরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে গেছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়।

উদ্গতিসাধন (Sublimation) :

কোন ইচ্ছার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধন যদি কোন কারণে ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেই ইচ্ছার কাছাকাছি বা প্রায় সমধর্মী কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াস ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। একেই বলা হয় পরিবর্ত উদ্দেশ্য সাধন (Substitution)। যদি কোন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বিজ্ঞানবিষয়ক পরীক্ষায় বার বার অকৃতকার্য হতে থাকে, সে তখন কোন সমধর্মী কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের প্রয়াস করে। একটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে মানসিক যন্ত্রণা দেখা দেয় তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সে অন্য একটি সমধর্মী বিষয়ে সাফল্যলাভের প্রয়াস করে।

উদ্গতি সাধনের ক্ষেত্রেও আমরা মূলত এই প্রক্রিয়ারই একটু ভিন্নতর রূপ দেখি। পরিবর্ত উদ্দেশ্য সাধন প্রয়াসই উদ্গতিসাধন প্রক্রিয়ায় দেখা যায়। যে সব ইচ্ছা সমাজে সরাসরি চরিতার্থ করা যায় না, সামাজিক ও আত্মিক বিধিনিষেধ অদমের সেই সব ইচ্ছাগুলির জৈবিকভাবে নির্ধারিত পথে বাধা দেয়। ফলে এ ইচ্ছাগুলির পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যর পট পরিবর্তন করতে হয়। জৈবিক নির্ধারিত উদ্দেশ্য-পট পরিবর্তন করে সামাজিক নির্ধারিত পথে অদমের ইচ্ছার চরিতার্থ প্রয়াসকেই উদ্গতি সাধন বলে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের যৌনমূলক বা আক্রমণধর্মী ইচ্ছাবেগকে মানুষ সরাসরি যখন তখন প্রকাশ করতে পারে না। সমাজের অনেক বিধিনিষেধ তাকে মেনে চলতে হয়। এ সকল ইচ্ছাবেগকে নিরুদ্ধ করতে হয়, অবদমিত করতে হয়। অবদমিত ইচ্ছাবেগের সাথে যে অবরুদ্ধ শক্তি থাকে তা ব্যক্তির মধ্যে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার উদ্রেক করে এবং ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। এই সময়ে এই নিরুদ্ধ শক্তিকে সমাজ অনুমোদিত পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করাকেই উদ্গতি সাধন বলা হয়। সন্তানহীন অনেক বিবাহিত মহিলার নিরুদ্ধ মাতৃত্ব, শিশু কল্যাণ কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে শিশু পরিচর্যার মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে পুঞ্জীত ক্রোধাবেগ, খেলাধূলা, শিল্পকর্ম, উদ্যান-চর্চা প্রভৃতি কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবদমিত যৌনাবেগকেও সমাজ অনুমোদিত ও সংস্কৃত পথে, যেমন সংগীত, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ-কল্যাণকর কর্ম-কাণ্ডের মধ্য দিয়ে উন্নীত করা যেতে পারে। উন্নতিসাধনে একদিকে ব্যক্তি যেমন পরোক্ষভাবে ইচ্ছা চরিতার্থ করায় সন্তোষ লাভ করে অন্যদিকে শক্তির উদ্গতি কল্যাণকর পথে নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক কল্যাণও সাধিত হয়। মহৎ সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, বিজ্ঞান গবেষণা সবকিছুই আদিম অদসশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরনের ফলস্বরূপ। কবি দান্তে (Dante) সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি ফ্লোরেন্সের পথ দিয়ে যেতে যেতে বিয়াত্রিস্ (Beatrice) নাম্নী এক যুবতীকে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়েন। বিয়াত্রিস্ সামাজিক মর্যাদায় দান্তে অপেক্ষা উঁচুতলার ছিলেন।

দান্তে তার সাথে কোনদিন একটি কথাও বলেন নি, একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র দেখে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে না পাওয়ার যে বেদনা, বিয়ত্রিসকে কেন্দ্র করে তাঁর ইচ্ছা নিরুদ্ধ হওয়ার যে মানসিক যন্ত্রণা, তা নিরসনের জন্য ইচ্ছাবেগকে আরও উন্নতপথে দান্তে মুক্তি দিতে প্রয়াস করেছিলেন। তাঁর কয়েকখণ্ড কবিতাগ্রন্থ এ প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি।

এ প্রসঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে, উদ্গতি সাধনের জন্য, সুন্দর সুস্থ পরিবেশ থাকা দরকার। শিক্ষিত ও সংস্কৃত হওয়ার সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা যাতে পায় সে দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য-রক্ষাকারী ক্রিয়া কৌশলের মধ্যে উদ্গতি সাধন প্রক্রিয়াই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, সামাজিক ও আত্মকল্যাণকর।

অবদমন (Repression) :

অবদমন সঙ্গতি রক্ষার সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর উপায়।

প্রক্রিয়া—পূর্বে আলোচিত হয়েছে—।

পৃ : ......

প্রত্যাবৃত্তি (Regression) :

লিবিডো বা যৌনমানস শক্তির বিকাশ পথে, শক্তি যখন কোন পর্যায়ে গিয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে বা বলা যেতে পারে শক্তির যখন সংবন্ধন (Fixation) ঘটে, তখন যৌন মানস শক্তির অগ্রগতি যথাযথভাবে হতে পারে না। সর্বদাই তার পিছনে ফেরার একটা প্রবণতা থাকে। বাস্তবের কোন সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না অর্থাৎ লিবিডো যখন আর বাস্তবের সাথে তাল রেখে চলতে পারে না তখন সে এ অবস্থা ছেড়ে অতীতের সেই স্তরে ফিরে যায় যেখানে গিয়ে লিবিডো সর্বাপেক্ষা আরাম পেয়েছে বা যে স্তরে এতটুকু আরাম আয়াস না পাওয়ার জন্য একটা প্রবল আকুতি রয়েছে (সংবন্ধন বা fixation স্তর)। লিবিডোর এরূপ পিছন পানে যাওয়াকেই প্রত্যাবৃত্তি বলে।

অনেক ব্যক্তিই জীবনের সমস্যা সঙ্কুল অবস্থার সঙ্গে পরিণত ভাবে বা সাবালকের মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে মুখোমুখী হয়ে যুঝতে পারে না। এ রকম অবস্থা দেখলেই এ ধরনের ব্যক্তিরা শিশুসুলভ আচরণে ফিরে যায়। শিশুর মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এ রকম আচরণকেই প্রত্যাবৃত্তি আচরণ বলে। ব্যক্তি পূর্বে এরূপ আচরণ অপেক্ষাকৃত কম সমস্যাজর্জ্জর অবস্থায় করে কিছু ফল পেয়েছে। এরকম হতে পারে যে একজন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে ভেবে পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মধ্যে পেটের গণ্ডোগোল বা মাথা ধরা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এ রকম আচরণের মধ্য দিয়ে সে পরীক্ষার যে আসল সমস্যা তা থেকে দূরে থাকতে পারে।

একটি পাঁচ বৎসরের ছেলে যদি অনুভব করে যে তার একটি নূতন ভাই জন্মাবার পরই তার আদর যত্ন কমে গেছে, তাহলে সে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করে, অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করে। নিরাপত্তা বোধের অভাব তার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠে, এরকম অবস্থায় সে আরও অল্প বয়স্কের শিশুর মত আচরণ করে, যাতে এরকম করে বাড়ীর লোকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তার মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব করা, খাওয়াতে নানা প্রকার জটিলতা প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

কখনো কখনো এরূপ আচরণ যে দেখা যাবে না এমন কথা নেই, কিন্তু সর্বদা যদি প্রত্যাবৃত্তিমূলক আচরণ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় তা হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ যে নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে এ সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এবং সর্বদা এরূপ আচরণ ব্যক্তির মধ্যে তখনই দেখা যায় যখন ব্যক্তির অতি শৈশবকালে যৌন মানস শক্তির বিকাশ পথে কোন স্তরে সংবন্ধন ঘটে।

স্বপ্নচারিতা বা দিবাস্বপ্ন (Phantasy or Day dreaming) :

স্বপ্নচারিতায় ব্যক্তি নিজেকে বাস্তব জীবন থেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মন-গড়া জগতে বিচরণ করতে থাকে। যে সকল ইচ্ছা-পূরণ বাস্তবে করা সম্ভব নয়, সে সব ইচ্ছাকে দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস করে। অবদমিত অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি স্বপ্নে নভোচারী হয়ে ওঠে। দিবাস্বপ্নে ব্যক্তি খুব সহজে এ সকল ইচ্ছার পরিতৃপ্ত ঘটাতে পারে।

দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে সঙ্গতিরক্ষার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তির অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তিতে স্বপ্নচারিতা একটা সহজ ও নির্দোষ উপায়। দিবাস্বপ্ন ব্যক্তিকে ব্যর্থতা ও অবদমিত বাসনাজনিত দ্বন্দ্বজর্জ্জরতা থেকে অনেকটা হাল্কা করে। ব্যক্তিত্বের ভার সাম্য রক্ষা বিষয়েও অনেক পরিমাণে সাহায্য করে। সিনেমা, গল্প উপন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্বপ্নচারিতা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে। বর্তমান জীবনের জটিলতার মধ্যে মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিমিত স্বপ্নচারিতা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এ স্বপ্নচারিতা যদি মাত্রাধিক হয়, বাস্তব জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে কেবল যদি দিবাস্বপ্ন ও স্বপ্নচারিতাতেই সব আশা, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটাবার প্রয়াস করা হয় তা হলে তা অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সিজোফ্রেনিয়াতে স্বপ্নচারিতা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা যায়।

রূপান্তরণ (Conversion) :

অনেক অবদমিত বাসনা মানসিক দিক থেকে অভিব্যক্ত না হয়ে শারীরিক দিক দিয়ে প্রকাশ লাভের চেষ্টা করে। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়াতে মানসিক দ্বন্দ্বে শারীরিক অসুস্থতা যেমন আলসার, কোলাইটিস্, হাত পা অসাড় হয়ে যাওয়া, প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ব্যক্তির মধ্যে পাপবোধ যদি খুব প্রকট থাকে তাহলে যে কাজ করতে অনীহা ও পাপবোধ হয় সে কাজের জন্য ব্যক্তির যে অঙ্গ ক্রিয়াশীল তা অকেজো ও অসাড় হয়ে যেতে পারে।

(Conversion Hysteria—বিষয়ে "মানসিক রোগের প্রকার" অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে)

বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন (Reaction formation) ঃ

যে ব্যক্তি এককালে অতি কদর্য যৌন জীবন যাপন করত, তাকেই হয়ত পরবর্তীকালে দেখা গেল অত্যন্ত শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন করতে। এরূপ আচরণকেই বলা হয় বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন। যে ইচ্ছাটি অবদমিত, সেই ইছার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কোন ইচ্ছাকে ব্যক্তি অত্যন্ত প্রশ্রয় দেয় ও পোষণ করে থাকে। এরূপ করে ব্যক্তি অবদমিত অস্বস্তিকর ইচ্ছার তীক্ষ্ণতাকে হ্রাস করতে প্রয়াস করে। ইচ্ছাটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যৌনেচ্ছার প্রকট অবদমন থেকে কখনও কখনও স্বাভাবিক যৌন জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিপরীতমুখী প্রবল ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। এ থেকে যৌনজীবন সম্পর্কে একটা ভয়ের উদ্রেক হতে পারে।

এরকম আচরণ আমরা অন্যবিধ বিষয়ও দেখতে পাই ; যেমন কোন ছেলে স্কুলে রোজ দেরী করে আসে, কঠোর শাস্তির ভয়ে দেখা গেল সে রোজ স্কুল আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে এসে স্কুলে বসে থাকে।

অনুশীলনী

1. Explain the term 'defence mechanism'. Describe a few defence mechanisms with illustrations.

2. Elucidate the various psychic mechanism involved in the fulfilment of repressed wishes.

3. Define a complex. Explain how repressed complexes manifest themselves.

4. Are defence mechanisms simply adjustment mechanisms ? Justify your answer.

5. Write notes on :

Sublimation.
Projection.
Repression.
Regression.
Rationalization.
Compensation.
Identification.
Conversion.
Day-dreaming.

সপ্তদশ অধ্যায়

মানসিক বৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ—পারিবেশিক ও গাঠনিক (Causes of mental diseases and difficulties—Environmental and Constitutional):

দেহের রোগের যেমন কোন না কোন কারণ আছে, মানসিক রোগেরও কারণ আছে। বহু ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, জন্ম থেকেই তাদের এমন দুর্বল শারীরিক গঠন যে সামান্য অনিয়ম বা আঘাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ বহু অনিয়ম ও আঘাতকেই অনেক দিন সহ্য করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে জন্মগত গাঠনিক শারীরিক কাঠামো দৈহিক সুস্থতা অসুস্থতার কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ নির্ণায়ক। কিন্তু শক্ত সুঠাম শারীরিক গঠন থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ হয়ে থাকে, এহেন ব্যক্তি যদি নিয়ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকে, যেমন অসময়ে বহুদিন খাওয়া দাওয়া, অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া, কিংবা খুব ঠাণ্ডা লাগানো, এরকম অবস্থায় দৈহিক গঠন সুদৃঢ় হলেও, পারিবেশিক অস্বাস্থ্যকর প্রভাবের জন্য ব্যক্তির মধ্যে নানা প্রকার দৈহিক রোগ দেখা দেয়। অবশ্য জন্মগতিতেই যদি কেউ খুব দুর্বল হয় তা হলে সে খুব তাড়াতাড়ি অসুস্থ পারিবেশিক প্রভাবের শিকার হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া কিছু কিছু দৈহিক রোগ আছে যা বংশগতিতে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে বর্তায়।

এরূপভাবে দেখা যায় যে, দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে জন্মগতি ও পরিবেশ উভয়ই কারণ হিসাবে কাজ করে—কোন ক্ষেত্রে জন্মগতি অধিক দায়ী, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবেশিক শক্তি বেশী কাজ করে।

মানসিক বৈকল্য ও রোগের ক্ষেত্রেও একইরূপভাবে জন্মগতি ও পরিবেশ কাজ করে। অনেক মানসিক রোগের জন্মগতি থেকে জন্ম হয়। অনেক মানসিক বৈকল্যও জন্মগতি থেকেই হয়ে থাকে। যদি কারও মস্তিষ্কের গাঠনিক কোন বিকৃতি থাকে, তা হলেও তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। যৌন রোগ, মস্তিষ্কে আঘাত, অতিরিক্ত মদ্যপান প্রভৃতির জন্যও মানসিক রোগ হতে পারে। নালীবিহীন (Endocrine glands) গ্রন্থিরাজির কোনটির অতিমাত্রিক বা নিম্নমাত্রিক কার্য্যকলাপের জন্যও মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর জন্যও মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

এ ছাড়া শিশুর মধ্যে যদি অঙ্গগত ও গাঠনিক দিক থেকে বিকৃতি থাকে, তা হলে সে নিজেকে আর সকল থেকে হীন বোধ করে এবং এই হীনমন্যতার ফলে তার প্রতিযোজন প্রয়াস অস্বাভাবিকরূপ পরিগ্রহ করে।

মস্তিষ্কে যদি খুব শক্ত আঘাত লাগে, বা হঠাৎ কোন উঁচু জায়গা থেকে শিশু যদি মাটিতে পড়ে যায় তা হলে মানসিক দিক থেকে তার মধ্যে যে ভয়ের উদ্রেক হয় তা থেকেও মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

জন্মগতি ও পরিবেশ ঘটিত কারণ ঃ

মানসিক রোগ বংশগতি সূত্রে আসে কি-না এ বিষয়ে ভিন্ন মতামত আছে। বংশগতি ও পরিবেশ এ দুটি শক্তির মধ্যে কোনটি ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি, সুস্থতা অসুস্থতা নির্ণয়ে অধিক কাজ করে সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং মোটামুটিভাবে এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, বংগশতি ও পরিবেশ দুটিই ব্যক্তিত্ব গঠনে সমানভাবে কার্যকরী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব বেশী, যেমন বুদ্ধির ক্ষেত্রে, দৈহিক গুণাগুণের (Physical traits) ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাবই অধিক। মেজাজ বা মনঃপ্রকৃতি (Temperament) কতটা বংশগতি ও কতটা পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় এ বিষয়েও মতবিরোধ আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, যৌনচ্ছার মূলে দৈহিক গঠন, (বিশেষ করে গ্রন্থির রস নিঃসরণের তারতম্য, স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক কার্য্যের হেরফের) বিশেষ ভাবে কাজ করে। দেহের চাহিদা পরিপূরণের জন্য যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তা থেকে দেহকে স্থিতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যক্তির যে উদ্যম আচরণ তাকেই মনোবিদরা কর্মাবেগ (Urges or Drives) বলেছেন। দৈহিক গাঠনিক তারতম্যের জন্য, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কর্মাবেগের পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন কারো মধ্যে যৌনস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল—কারো রাক্ষুসে ক্ষুধা। দৈহিক গঠন থেকে যেহেতু এ সকল স্পৃহার উদ্ভব ঘটে, সেই হেতু এ সকল স্পৃহা বংশগতির দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত এটা বলা যেতে পারে। অবশ্য এটাও সত্য যে, এই সকল ইচ্ছা বা স্পৃহা গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়, সমাজ পরিবেশের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। এসকল স্পৃহার কম বেশী সংযুক্ত ক্রিয়াকলাপ থেকেই আবার মেজাজ বা মনঃপ্রকৃতির সৃষ্টি হয়। ফ্রিমেন (Freeman), নিউম্যান (New man), হল্‌জিনজার (Halzinger) প্রমুখ মনোবিদগণ উনিশ জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন। যমজ সন্তানদের একজনকে এক পরিবেশে, অপর জনকে ভিন্ন

পরিবেশে রেখে দেখলেন অন্যদিকে অপর পঞ্চাশ জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানকে এক সঙ্গে বড় করে তোলা হ'ল। এই উনসত্তরটি জোড়া যমজ সন্তানের উপর পরে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা দেওয়া হ'ল। তুলনামূলক বিচার করা হ'ল এই তুটি দলের মধ্যে। প্রথম দলে আছে সেই সব যমজ সন্তান যারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে, আর দ্বিতীয় দলে আছে সেই সব যমজ সন্তান যারা এক সঙ্গে একই প্রকার পরিবেশে মানুষ হয়েছে। দেখা গেল যদিও একের সাথে অপরের মেজাজ বা মনের প্রকৃতির দিক থেকে অনেক তফাৎ রয়েছে, তবু দলগত ভাবে অর্থাৎ যারা একসাথে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল, আর যারা যারা আলাদাভাবে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল। সমকোষী যমজ সন্তানের তুজনের মধ্যে যে পার্থক্য তা পরিবেশের জন্য। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, বংশগতি ও পরিবেশ তুই-ই সমানভাবে এদের মনঃপ্রকৃতি গঠনে কাজ করেছে।

বুদ্ধির দিক থেকে বংশগতিই বেশী কার্যকরী। Dr. A. F. Tredgold-এর মতে "The great majority of cases of mental defect are due to inheretance." বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু অনেক অপসঙ্গতি আসতে পারে। তুষ্ক্রিয়তা, সমস্যামূলক আচরণের কারণ অনেক সময় দেখা যায় ক্ষীণ বুদ্ধি।

কাজেই মনঃপ্রকৃতি ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে বংশগতির যথেষ্ট কার্যকরী অবদান রয়েছে, এবং যেহেতু ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা মনঃপ্রকৃতির গড়নের উপর, তার বিকাশ পর্বের উপর নির্ভর করে, সেই হেতু বলা যায়, মানসিক রোগের কারণ একদিকে যেরূপ বংশগতি অপরদিকে সেইরূপ পরিবেশও বটে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানসিক বৈকল্য, শিশুদের সমস্যামূলক আচরণ, উদ্বায়ু রোগ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্থাৎ যে পরিবেশে মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নেই এবং যে পরিবেশে মানবিক সম্পর্ক দূষিত ও বিপর্যস্ত (পিতা-মাতার সম্পর্ক, পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, ভাই বোনের সম্বন্ধ; বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক প্রভৃতি)। কঠিন মানসিক রোগ বিশেষ করে বাতুলতার (Psychoses) ক্ষেত্রে বংশগতিই দায়ী। সিজোফ্রেনিয়া, মৃগীরোগ যে বংশগত কারণে হয়ে থাকে তা আজকাল প্রায় প্রমাণ সিদ্ধ। দেখা গেছে যে, সমকোষী যমজ সন্তানদের (Identical twins) একজনের মধ্যে যদি সিজোফ্রেনিয়া দেখা যায়, তা হলে অপর জনের মধ্যেও তা পরিলক্ষিত হয়।

পরিবেশগত কারণগুলি সমস্যামূলক আচরণ ও দুক্রিয়তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কালে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ করব।

(ক) ভৌতিক পরিবেশ

(খ) মনস্তাত্বিক পরিবেশ

জীর্ণ ও বদ্ধ গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ দৈহিক বিকাশ তথা মানসিক বিকাশকে বিঘ্নিত করে, এবং তা থেকে নানা প্রকার মানসিক বিকৃতি ও বৈকল্য দেখা দেয়। যে সকল পারিবেশিক অবস্থা মানসিক বিকৃতির কারণ হিসাবে কাজ করে তা নিম্নে বর্ণিত হ'ল :

(ক) সঙ্কীর্ণ ও জীর্ণ বাসস্থান—আলো হাওয়া ও পরিসরের অভাব

(খ) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব

(গ) খেলাধূলা, আনন্দ আহ্লাদের কোন ব্যবস্থা না থাকা

(ঘ) গৃহে ও বিদ্যালয়ে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব

(ঙ) পিতামাতার মধ্যে সর্বদা বিবাদ ও তজ্জনিত নিরাপত্তাবোধের অভাব।

(চ) সন্তানের প্রতি নির্মম আচরণ ও প্রত্যাখ্যান—স্নেহ প্রযত্ন থেকে বঞ্চনা ও এর জন্য ভয় ও দুশ্চিন্তা।

(ছ) সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার মধ্যে কোন নীতিগত সামঞ্জস্য-হীনতা—কখনো অতিমাত্রিক শৃঙ্খলা, কখনো কোন রকম শাসন না থাকা—জীবনাদর্শ ও আচরণবিধি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি।

(জ) পিতামাতার অসুস্থ ব্যক্তিত্ব

(ঝ) ছিন্নমূল গৃহাবস্থা—নিরাপত্তাবোধের অভাব।

(ঞ) অসৎ সঙ্গীসাথী—উপযুক্ত নৈতিক মানের অভাব।

(ট) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাব—অনুপযুক্ত পাঠক্রম—ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি—সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা না থাকা—শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশণার অভাব—শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অসুস্থ সম্পর্ক।

(ঠ) যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা—শিশুর মধ্যে অহেতুক অস্বাস্থ্যকর অপরাধবোধের উদ্রেক করা। গৃহে সর্বদা সমালোচনা, নিন্দা, উপহাস, অপরের সাথে তুলনামূলক বিচারে হেয় করা—এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে হীনতাবোধ ও অপরাধবোধ।

(ড) অনুন্নত সামাজিক পরিবেশ।

মানসিক বৈকল্যের কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত।

ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত (Freud's theory) :

শৈশবকালীন যৌন-জীবনে বা বয়ঃপ্রাপ্তকালীন যৌন-জীবনে যদি কোন বিচ্যুতি বিকৃতি ঘটে, তা হলে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও অবদমন দেখা দেয় এবং অবদমিত ইচ্ছাগুলি মানসিক রোগ সংলক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছাগুলি মনের প্রতিবন্ধক (Censor) এড়িয়ে বা পেরিয়ে চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। এ প্রয়াস পর্বে অবদমিত ইচ্ছাগুলি যেভাবে প্রকাশ পায় সেগুলিই হ'ল, ফ্রয়েডের মতে মানসিক রোগ সংলক্ষণ।

মানসিক রোগে দুই প্রকার কারণ কাজ করে (ক) তাৎক্ষণিক কারণ (Precipitating) ও অতীতকালীন কারণ (Predisposing)।

উদ্বায়ুরোগের কারণ

- অতীতকালীন কারণ
  - যৌন-গঠন (পূর্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতা)
  - শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা
- তাৎক্ষণিক বা আকস্মিক কারণ
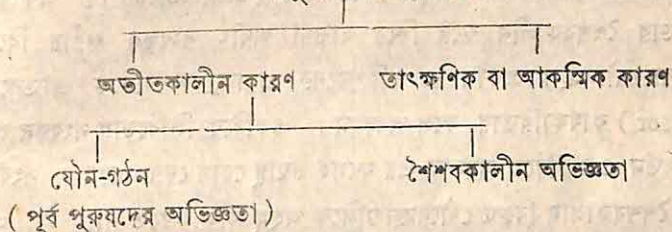
তাৎক্ষণিক কারণের মধ্যে পড়ে ব্যক্তির জীবনে কোন বড় রকমের শোক, আঘাত, ব্যর্থতা, আর্থিক ক্ষতি, দুর্ঘটনা প্রভৃতি। আর অতীতকালীন কারণ বলতে বুঝায় ব্যক্তির অতি শৈশবকালীন ব্যক্তিত্ব বিকাশ পর্ব—এই সময়ে শিশু তার যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তিতে যদি কোন বাধা পায়, যদি সে আঘাতের সম্মুখীন হয় তাহলে ব্যক্তির মনের মধ্যে জটের বা গূঢ়ৈষার সৃষ্টি হয়। মানসিক রোগীর অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে প্রায়ই দেখা যায় যে রোগীর মন শৈশবকালীন কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। একে বলা হয় সংবন্ধন (Fixation)। এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের লিবিডো বা যৌন-মানস শক্তির বিকাশ পর্বের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এ যৌন-মানস শক্তির প্রবাহধারা কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়—অর্থাৎ শিশুর যৌনতা তার শরীরের মুখ, পায়ু ও পরে সামগ্রিকভাবে নিজেকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হয় এবং তার পরে মা বাবার প্রতি, সর্বশেষে স্বকামের মধ্য দিয়ে ইতর কামে এর পরিণতি আসে। এই লিবিডোর প্রবাহ পর্যায়ের কোন স্তরে যদি লিবিডোর সংবন্ধন ঘটে অর্থাৎ ঐ স্তরে যদি যৌনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবলভাবে মাত্রাধিক

পরিতৃপ্ত হয় কিংবা যৌনেচ্ছা ঐ স্তরে যদি একেবারে পরিতৃপ্ত না হয় তাহলেই লিবিডোর সেই স্তরে সংবন্ধন ঘটলো বলে অভিহিত করা হয়। অতীতকালীন কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েড বলেছেন, যে ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা পরবর্তীকালে দেখা দেবে তার লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন বিশেষ করে ঈডিপাস্ পর্যায়ে সংবন্ধন থাকবে। এর ফলে, একদিকে অতৃপ্ত যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তির নিয়ত প্রয়াস, অপরদিকে অহমের ও অধিশাস্তার দ্বারা নিয়ত প্রতিবন্ধ (Censor), দুই বিপরীতধর্মী ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে নিরত অবদমন (Repression)। এই অবদমনের ফলে স্বভাবতই ব্যক্তির অহম অত্যন্ত অপুষ্ট ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অপুষ্ট ও দুর্বল অহম বাস্তবের স্বাভাবিক ঘাত প্রতিঘাতকেও সহ্য করতে পারে না। সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে এবং লিবিডো শৈশবকালীন সংবন্ধন স্তরে ফিরে যায় (Regression)। একদিকে লিবিডোর শৈশবকালীন স্তরে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ সংবন্ধন স্তরীয় বিশেষ প্রকারের যৌনেচ্ছার প্রকাশ ও পরিপূরণের প্রয়াস, অপরদিকে প্রতিবন্ধের (Censor) কার্যকারিতার ফলে অবদমন। একদিকে লিবিডোর সংবন্ধন স্তরে প্রত্যাবর্তন ও অন্যদিকে অবদমন এর ফলেই উদ্বায়ু রোগ দেখা দেয়। সংবন্ধন স্তরীয় শৈশবকালীন বিকৃত যৌনেচ্ছাগুলিকে অহম্ গ্রাহ্য করতে পারে না, এবং এর ফলেই আরম্ভ হয় অবদমন। স্বপ্নের মধ্যে যেমন ব্যক্তির নির্জ্ঞান বাসনার পরিপূরণের প্রয়াস থাকে ঘুমের মধ্যে অহম্ যখন আর ততটা সক্রিয় থাকতে পারে না, তখন অহম্ ও অধিশাস্তার প্রতিবন্ধকে (Censor) ফাঁকি দেবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে নির্জ্ঞানের অবদমিত বাসনা প্রকাশ লাভ করতে চায়, চরিতার্থ হতে চায়। মানসিক রোগের সংলক্ষণ হচ্ছে অবদমিত বাসনার পরোক্ষ পরিপূরণ প্রয়াস। কি প্রকারের রোগ সংলক্ষণ প্রকাশ পাবে তা নির্ভর করে লিবিডোর সংবন্ধন কোন স্তরে ঘটেছে। যেমন হিস্টিরিয়াতে লিবিডোর সংবন্ধন ঈডিপাস স্তরে ঘটে থাকে, অবসেসনে পায়ুস্তরে, প্যারানইয়াতে স্বকামস্তরে, সিজোফ্রেনিয়াতে মৌখিক স্তরে ইত্যাদি।

ফ্রয়েডের মতে তাৎক্ষণিক কারণ বলতে আমরা যা বুঝি তা সকলের জীবনেই কিছু না কিছু ঘটে থাকে। বাস্তবের আঘাত সকলের জীবনেই আসে—ব্যর্থতা, হতাশা, আঘাত, অপমান, ক্ষতি সকলের জীবনেই আসে। কিন্তু সকলের মধ্যে একপ্রকারের প্রতিক্রিয়া হয় না—সকলের মধ্যে মানসিক রোগও দেখা দেয় না। কারো কারো মধ্যে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মতে,

যাদের মধ্যে অতীতকালীন কারণ বর্তমান থাকে তারাই তাৎক্ষণিক কারণের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘুণে ধরা মানসিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, তাতে নানাপ্রকারের জটিলতার সৃষ্টি হয়। লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন হ'ল মানসিক রোগের মূল কারণ (Predisposing), বাস্তবের আঘাতজনিত যে কারণ তা হ'ল তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ কারণ।*

এ্যাড্‌লারের সিদ্ধান্ত (Adler):

এ্যাড্‌লার প্রথম দিকে ফ্রয়েডের অনুগামী ছিলেন, কিন্তু পরে কতকগুলি বিষয়ে ফ্রয়েডের সাথে তাঁর মতের অমিল হয়।

শৈশবকালীন যৌনতা, লিবিডো বা যৌন-মানস শক্তি, সংবন্ধন প্রভৃতি ফ্রয়েডের মূল ধারণাগুলিকে এ্যাড্‌লার অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলে অভিহিত করেন। সবকিছুর মধ্যেই যৌনতা আনয়ন এ্যাড্‌লারের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তাঁর মতে কর্ম-শক্তির উৎস যৌন-মানসশক্তি নয়; কর্মশক্তির উৎস হ'ল হীনতাবোধ (Sense of Inferiority)। এই হীনমন্যতা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং এই মাত্রা ছাড়ানো হীনমন্যতাবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণকারী নানারূপ অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে, তখনই তাকে মানসিক দিক থেকে বিকৃত বলে পরিগণিত করা হয়। মাত্রাধিক বিকৃত হীনতাবোধকে পরিপূরণ করার জন্য ব্যক্তি তার সামর্থ্যের বাইরে নানারূপ কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে থাকে—আপন সামর্থ্যের সাথে লক্ষ্যের কোন সামঞ্জস্য থাকে না, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিপুল ফারাক থেকে যায়। এর ফলে জীবন ধারণ ও আচরণের মধ্যে নানারূপ বিকৃতি প্রকাশ পায়, ক্রমাগত ব্যর্থতা ও হতাশা মানসিক রোগের সৃষ্টি করে।

এ্যাড্‌লারের কাছে যৌনেচ্ছা অপেক্ষা আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই মানুষের জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি। এবং এই প্রেরণা পরিবেশের প্রতিকূলতা ও ব্যক্তির স্পর্শকাতরতার জন্য বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই প্রেরণা বিপর্যস্ত

---

*অবদমন, প্রত্যাবর্তন, সংবন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব পৃঃ আলোচনা করা হয়েছে।

Like dreams, the symptoms "owe their origin to a conflict between Ego and sexuality" and are compromises between the repressing censoring agency, the Ego, and the infantile libidinous tendencies, compromises in which "the unconscious" finds a partial satisfaction. In this way, the symptom comes into being as a derivative distorted in manifold ways, of the unconscious libidinal wish-fulfilment, as a cleverly chosen abiguity."

হলে ব্যক্তির মধ্যে আসে হীনতাবোধ। এই হীনতাবোধ থেকে মুক্তির জন্য ব্যক্তির মধ্যে আসে গঠনাত্মক কর্মপ্রেরণা, কখনও বা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ।

এ হীনতাবোধের উৎস কি? এ্যাড্লারই প্রথম ক্রমবর্ধমান শিশুর উপর তার পার্শ্বস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর বিশেষ আলোকপাত করেন। পিতামাতার আচার আচরণ, পিতামাতার সাথে শিশুর সম্পর্কের উপর শিশুর ব্যক্তিত্বের গড়ন নির্ভর করে। পিতামাতার কোন্ কোন্ আচার-আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল ও কোন্ কোন্ আচরণ প্রতিকূল সে সম্পর্কে এ্যাড্লার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। পিতামাতা যদি শিশুকে অতি আদর দেন, কিংবা সবসময় হাতের মধ্যে রাখতে চান, কিংবা শিশুকে প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণা করেন তাহলে শিশুর মধ্যে পরবর্তীকালে অসামাজিক ও বিকৃত আচরণ দেখা দেয়। সমব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতামাতা সর্বদা সন্তানকে স্নেহ প্রযত্ন, নিরাপদ আশ্রয় ও উৎসাহ দিয়ে তার মধ্যে অহেতুক হীনতাবোধ যাতে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং শিশুর এইভাবে স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করবেন। এ্যাড্লার শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক অবস্থায় মা'র ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা দানের উপর অধিক মূল্য আরোপ করেছেন।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে এ্যাড্লার বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রভাবের উপরও যথার্থ দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষকের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুতঃ পারিবারিক বিন্যাসে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতামাতার যে স্থান, বিদ্যালয়ের অবস্থাতে শিক্ষকদের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের ও অনুরূপ স্থান।

অস্বাভাবিক হীনতাবোধের কারণ ঃ

(ক) পিতামাতা কর্তৃক শিশু যদি অত্যন্ত আদর ও আস্কারা পায়, যদি সব সময় শিশুকে সব বিষয়ে বয়সের দিকে লক্ষ্য না রেখে অহেতুক সাবধান করা হয়, সে কিছু পারবে না মনে করে শিশুর সবকিছু পিতামাতা করে

[১]The problem of every neurosis is, for the patient, the difficult maintenance of a style of acting, thinking and perceiving which distorts and denies the demands of reality···As the work of Individual Psychologists has abundantly proved, an individual goal of superiority is the determining factor in every neurosis, but the goal itself always originates in....the actual experiences of inferiority....

Adler. A. : Problems of Neurosis

দেয় তাহলে পরোক্ষভাবে শিশুর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় ; শিশুর মধ্যে হীনতাবোধ দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে একটা ধারণা জন্মে যায় যে সে কখনো একা কিছু করতে পারে না ও পারবে না, তার পক্ষে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। অথবা—

(খ) পিতামাতা কর্তৃক শিশু যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, সর্বদা যদি শিশুকে উপহাস করা যায়, শাস্তি দেওয়া যায়, তাহলে শিশু নিজেকে ধিক্কতবোধ করে তার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক হীনতাবোধ দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা ও হতাশার ভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

সে যে হীন নয়, সে যে উপহাসের পাত্র নয়, সেটা প্রমাণ করায় জন্য ব্যক্তি গঠনাত্মক কার্যক্রম অবলম্বন না করে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উপায়ে দৃষ্টি আকর্ষণী কার্যক্রমের অবতারণা করতে থাকে। এ থেকেই মানসিক অসুস্থতার উদ্ভব হয়।

ইউঙের সিদ্ধান্ত (Jung) :

ফ্রয়েড অতীতকালীন কারণের উপর (Predisposing cause) অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাৎক্ষণিক কারণের তেমন কোন গুরুত্ব ফ্রয়েড দেন নি। লিবিডোর সংবন্ধনই মানসিক রোগের কারণ, ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্তকে ইউঙ স্বীকার করেন নি। ইউঙের মতে, কোন ব্যক্তির মধ্যে শৈশবকালের অসুস্থ পারিবেশিকতার জন্য প্রতিযোজন ঠিক ভাবে না হতে পারে, কিন্তু এই শৈশবকালীন অপসঙ্গতির জন্য পরবর্তীকালেও তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেবে এমন কোন কথা নেই। বর্তমানের পরিবেশের মধ্যেই এমন কোন জটিলতা ও চাপ থাকে, যার সঙ্গে ব্যক্তিকে নূতন করে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হয়। ব্যক্তি এরূপ নূতন অবস্থার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করে, কিন্তু যে শক্তি এরূপ অবস্থার সাথে প্রতিযোজনে প্রয়োজন, ব্যক্তির মধ্যে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সে এরূপ অবস্থায় প্রতিযোজন প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে, অতীতকালে নূতন ও জটিল পরিস্থিতিতে যেভাবে প্রতিযোজন করার চেষ্টা করত, সেই পুরানো অভ্যাসে ব্যক্তি ফিরে যেতে চায়। সে শৈশবকালে পারিবারিক পরিবেশে যে উপায়ে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার চেষ্টা করত সেই ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করার চেষ্টা করতে থাকে। ইউঙ্‌ও প্রত্যাবর্তনের (Regression) কথা বলেছেন, কিন্তু ফ্রয়েড যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন, ইউঙ্‌ সে অর্থে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। যদি

বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যথার্থভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে, তাহলে তার মধ্যে শৈশবকালীন সঙ্গতি-প্রয়াসী যে আচরণ তার উপশম ঘটবে। ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। কাজেই ইউঙের মতে, বর্তমান অবস্থার জটিলতা দূর করা ও সে অবস্থার সাথে যাতে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হবে মনশ্চিকিৎসকের কাজ।[২]

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইউঙ্ ও ফ্রয়েডের মত 'মুক্ত অনুষঙ্গ' (Free Association) ও স্বপ্ন-বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। ইউঙ্ প্রথমে রোগীর বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ বিশ্লেষণে বিশেষভাবে ব্রতী হন। রোগীর স্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে কেবল তার অবদমিত যৌনেচ্ছা বা ঈডিপাস দুটই প্রতিভাত হয় তা নয়, বর্তমান পরিবেশ ও অবস্থা সম্বন্ধে ব্যক্তির নির্জ্ঞান প্রতিন্যাস কি সেটাও ধরা পড়ে। সমীক্ষার মধ্য দিয়ে রোগী তার বর্তমান পরিস্থিতি ও শৈশবকালীন অতীত অভিজ্ঞতাকে এক পটভূমিতে পরিস্থাপন করে বুঝতে পারে।

'লিবিডো' সম্পর্কেও ইউঙের ধারণা ফ্রয়েডের ধারণা থেকে ভিন্নতর ছিল। ইউঙের ধারণায় লিবিডো হ'ল সামগ্রিকভাবে জীবনী-শক্তি, কর্মশক্তি—যে শক্তি থেকে বিকাশবৃদ্ধি, বিভিন্ন কর্মে প্রেরণা ও বংশবৃদ্ধির প্রেরণা উৎসারিত হয়। লিবিডো সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে মৌল সিদ্ধান্ত—লিবিডো হ'ল যৌন-মানসশক্তি, শিশুর কর্মপ্রেষণা ও যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তি প্রয়াস,—এ সিদ্ধান্তের তিনি বিরোধিতা করেন।[৩]

---

[২] Take away the obstacle in the path of life and this whole system of infantile phantasies at once breaks down and becomes again as inactive and ineffective as before. But do not let us forget that, to a certain extent, it is at work influencing us always and everywhere....Therefore I no longer find the cause of the neurosis in the past, but in the present.

—Jung, C. G.: Collected Papers on Analytical Psychology.

[৩] A strictly Freudian analysis....is exclusively a sex-analysis, based upon the dogma that the relation of mother and child is necessarily sexual. Of course any Freudian will assure you that he does not mean coarse sexuality, but 'psycho-sexuality'—an unscientific and logically unjustifiable extension....

—Jung, C. G.: Contributions to Analytical Psychology.

সুলিভানের সিদ্ধান্ত (Sullivan):

মানবিক সম্পর্কের সুস্থতা অসুস্থতার উপরই ব্যক্তিবিকাশের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে। মানবিক সম্পর্ক রক্ষায় অক্ষমতা ও বিকৃতভাবে সম্পর্ক রক্ষার প্রয়াসই, মানসিক বিকৃতির সূচক।[১]

গভীর দুশ্চিন্তা থেকেই আসে মানসিক বিকৃতি। দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তি নানা প্রকারের প্রয়াস করে থাকে। সুলিভানের মতে যেখানেই মানসিক বিকার, সেখানেই দুশ্চিন্তা (Anxiety)। এই দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয় ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পৃক্ত পারিবেশিক জটিলতা থেকে। শিশুর যত্ন পরিচর্যার ভার থাকে পিতামাতার উপর—বিশেষ করে মা'র উপর। শিশুকে খাওয়ানো, ধোয়ানো, শোয়ানো এর সব কিছু মা'ই করে থাকেন। মা'র ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ না হয়—মা নিজেই যদি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাপরায়ণ হন, মা যদি শিশুর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দেন, কারণে অকারণে তার উপর নির্মম আচরণ করেন, বিদ্রূপে উপহাসে সর্বদা বিপর্যস্ত করেন, মৌলিক চাহিদা পরিপূরনের যদি ব্যবস্থা না থাকে তাহলে শিশুর মধ্যে যে গভীর দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয় তা তার চিন্তা, দৃষ্টি, সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রতিযোজন প্রয়াসে নানারূপ অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। পিতা মাতা ছাড়া শিক্ষক সমবয়সী বন্ধুবান্ধবের আচার আচরণ দ্বারাও শিশু গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

ডলার্ড ও মিলারের সিদ্ধান্ত (Dollard and Miller):

মানবিক সম্পর্কই মানসিক স্বাস্থ্যের মূল নির্ণায়ক। যে শিশু সুস্থ মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, তার মানসিক স্বাস্থ্যও সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে, মানসিক কোন প্রকার বিকার তার মধ্যে দেখা দেয় না। ব্যক্তির জীবনভঙ্গী ও জীবনাচরণ শিক্ষার ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফল। শিশুর প্রথম শিক্ষাদাতা তার পিতামাতা ও প্রথম শিক্ষা পরিবেশ পরিবার। পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যদি অসুস্থ হয়—তাদের জীবনধারণের মধ্যে যদি কোন সামঞ্জস্য ও সুস্থিরতা না থাকে তাহ'লে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশও বিঘ্নিত হয়। বাবার যদি

---

[১] Disorders are patterns of inadequate and inappropriate action in interpersonal relations (Sullivan);

Disorders are patterns of avoidance which serve to reduce fear but which are unadaptive (Wolpe),

Disorders are mistaken solutions to the problems of life and represent patterns (styles) which are inexpedient : (Adler) Systems of Psychotherapy, pp. 643

এক প্রকারের মতাদর্শ ও সন্তান পালনের বিধি নিয়ম থাকে, মা'র যদি অন্য প্রকারের মতাদর্শ ও সন্তান-প্রযত্ন বিধি থাকে, তাহলে শিশুর কাছে দুইটি ভিন্ন ও বিপরীতদর্শী পথ দেখা যায়, এবং এর ফলে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সে কোন্ পথ ধরবে ও কোন্টা ছাড়বে বুঝে উঠতে পারে না। তাছাড়া, পিতামাতার উপদেশনামা ও তাঁদের জীবনাচরণের মধ্যে যদি কোন সত্যাশ্রয় ও সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলেও শিশু হতবিহ্বল হয়ে পড়ে—শিশুর শিক্ষার মধ্যে কোন সংহতি থাকে না। পিতামাতার চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাচরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শিশুকে শিক্ষিত করে তোলে। অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতামাতার কুশিক্ষা, শিশুকে কুশিক্ষিত করে তোলে, তার মধ্যে অস্বাস্থ্যকর মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। যা স্বাভাবিক, তাকেও অস্বাভাবিক বলে বোধ করে। ফলে অহেতুক দ্বন্দ্বজর্জ্জরিত হয়ে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। সব সময় যদি শিশুকে কেবল বলা হয়, এটা করো না, সেটা করো না, এ পথে যাবে না, সে পথে যাবে না তাহলে শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তত। নষ্ট হয়ে যায়—স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিঘ্নিত হয়ে যায়।

কোন শিশুকে যদি অনবরত 'ছোট' 'খারাপ' বলে অভিহিত করা হয়—শিশুর চারদিকের সকলে যদি তাকে হেয় করে দেখে, তাহলে শিশুও নিজেকে সেইভাবে দেখতে শেখে—এবং এই শিক্ষা থেকে তার মধ্যে তীক্ষ্ণ হীনমন্যতা বোধের সৃষ্টি হয়। এর জন্যও পরে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার মানসিক বিকার দেখা দিতে পারে।

হর্ণের সিদ্ধান্ত (Horney):

ডলার্ড মিলারের মতে শিশু কি শিখছে তার উপর তার মানসিক সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে। হর্নের মতে, শিশু কি শিখছে তার উপরই নয়, কীভাবে তাকে শেখানো হচ্ছে তার ওপরও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। পিতামাতা যদি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও আক্রমণধর্মী হয়, শিশুকে ভয় দেখিয়ে যদি তারা তাঁদের মর্জিমত চালিয়ে নিতে চায়, তা হলে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকারের মানসিক বৈকল্যের বীজ উপ্ত হয়ে যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকও যদি ভয় দেখিয়ে, মারধর করে শিক্ষার্থীকে 'মানুষ' করে তুলতে চান তাহলে তার মধ্যে নানা প্রকার মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়ে থাকে।

অটো র‍্যাঙ্ক (Otto Rank):

এঁর মতে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের যন্ত্রণা প্রাক্ক্ষোভিক এবং সকল

রোগ সংলক্ষণের মূলে রয়েছে ভয়। যখন কোন ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নত করা যাচ্ছে না, আবার সে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণও করা যাচ্ছে না, এমন অবস্থাতেই উদ্বায়ু রোগ দেখা দেয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে ভয় ও অপরাধ-বোধ অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে, তখনই ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

যে সকল মনোবিদ মানসিক রোগের কারণ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের কেউ-ই আশ্চর্যজনকভাবে জৈবিক ক্ষুধা তৃষ্ণার বঞ্চনা যেমন তীব্র ক্ষুধা বা আর্থিক বঞ্চনা বা দারিদ্র্যের কথা বলেন নি। এর কারণ কি এই যে সকল মনোবিদই এমন সব জন-সমষ্টির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন যাদের আর্থিক দৈন্য বা জৈবিক বঞ্চনার কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু উদ্বায়ু রোগ বা বাতুলতা পারিবেশিক প্রভাবে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর শিক্ষার ফল হিসাবে দেখা দেয়। একজন ব্যক্তি যদি খাদ্য না পায় তা হলে সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ যদি তার পাশের মানুষের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পায়, পায় বঞ্চনা, অত্যাচার, নির্মম উপহাস ও অসম্মান, যদি পরিবারে সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, অমর্যাদা থাকে তাহলে সে পরিবারে ও সমাজে যে শিশু বড় হয়ে ওঠে, তার মানসিক রোগগ্রস্ত হওয়ায় সম্ভাবনা বহুগুণিত হয়।

তবে এটা ঠিক যে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র পরিবার পরোক্ষভাবে উদ্বায়ুরোগগ্রস্ত শিশু তৈরী করে, কেন না দারিদ্র্য ও ক্ষুধা পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য একে অপরকে আক্রমণ করার স্পৃহা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়।

ফ্রয়েড, এ্যাডলার, সুলিভান, ডলার্ড, মিলার সকলেই কোন না কোন ভাবে পারিবারিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। মানসিক সুস্থতা অসুস্থতার নির্ণায়ক হিসাবে পারিবারিক (পিতা মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক) সম্পর্কের সুস্থতার প্রসঙ্গ তুলেছেন।

It is interesting that so few of the theorists pointed to condition other than interpersonal interactions as the antecedents to disorder, for instance, protracted states of physiological deprivation such as intense hunger or economic deprivations such as poverty. One wonders whether this results from the fact that they worked within reasonably affluent segments of Western cultures or whether there lies within their observations a very useful conclusion, namely that learned disorders (neuroses psychoses) are a product of the way people interact with one another. If a person is deprived of food, he becomes hungry, if he is mistreated by others he can become neurotic. It is also possible that hungry and poor families can indirectly produce neurotic children, if these conditions cause them to hate, to neglect, and to punish each other unduly.

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিশু নির্দেশনা ও শিশু নির্দেশনা-কেন্দ্র

(Child Guidance & Child Guidance Clinic)

শিশু নির্দেশনার ধারণাটি মনোবিদ্যার গবেষণার একটি নূতন ফলশ্রুতি। ব্যক্তিত্ব গঠনের বিভিন্ন পর্যায়, ব্যক্তিত্ব গঠনে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে ততই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের জীবনে শৈশবকাল হ'ল ব্যক্তিত্বগঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়। বস্তুতঃ একটু নিবিষ্ট হয়ে দেখলে দেখা যাবে মানব-শিশু একদিকে যেমন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা নিতান্ত অসহায়, অন্যদিকে সকল প্রাণী অপেক্ষা নমনীয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানব-শিশু তার পিতা মাতার উপর তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। অন্যান্য প্রাণীদের যত অল্প প্রযত্ন পরিচর্যা হলে চলে, মানব শিশুর ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী মনোযোগ, অনেক বেশী সাবধানতা ও প্রযত্ন অধিক কাল ধরে প্রয়োজন হয়। পিতামাতার যত্নে ও নির্দেশে শিশু একদিকে যেমন বড় হতে থাকে, অন্যদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে শিশু বড় হয়ে উঠতে থাকে। নির্দেশনা ভিন্ন মানব শিশু তার পথে যথার্থভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও আধুনিক মনোবিদ্যার একটি মূল্যবান আবিষ্কার—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক গঠন ও আদলে যেমন পার্থক্য রয়েছে, মানসিক দিক থেকেও তেমনি পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সকল মানবশিশুর মৌলিক চাহিদা যদিও একরূপ, শৈশবকালীন আচার আচরণও প্রায় একরূপ, তবু প্রতিটি শিশুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সম্ভাবনা, বুদ্ধি, মেজাজ, রুচি, প্রবণতা। শক্তি সামর্থ্য সকলের সমান নয়—কারও বেশী কারও কম। প্রবণতা কারও একদিকে, প্রবণতা কারও অন্যদিকে। সকলকে যদি একই ভাবে, একই ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়, জীবনে ব্যর্থতা আসে বিকৃতি আসে, মানবিক শক্তির অফুরান অপচয় ঘটে। নির্দেশনা-সেই জন্যই মানব শিশুর পক্ষে অপরিহার্য।

তাছাড়া মানুষকে কেবল ভৌতিক পরিবেশের সাথেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয় না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথেও সামঞ্জস্যরক্ষা করে চলতে হয়। মানবিক সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষা করে চলার ক্ষমতা ও শক্তি

ব্যক্তির সুস্থ ভাবে বিকাশলাভের উপর নির্ভর করে। যে শিশু যথাযথ খাদ্য ও আশ্রয় পায় না, যে শিশু পারিবারিক অসুস্থ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, যেমন যে শিশু পিতামাতার আদর যত্ন থেকে বঞ্চিত বা পিতামাতার নির্মম বা উদাসীন আচরণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, যে পরিবারে পিতামাতার মধ্যে নিয়ত কলহ বিবাদ চলতে থাকে, সেখানে শিশুর মানসিক বিকাশে যে সব বিকৃতি আসে, তা থেকেই পরে নানাপ্রকারের অপসঙ্গতি দেখা দেয়। সে যথাযথ সামঞ্জস্য রেখে সকলের সঙ্গে চলতে পারে না।

একটি শিশুর জন্মগত শক্তি সামর্থ্য ও চাহিদা যদি পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সম্যকভাবে বিকাশ লাভের ও পরিতৃপ্তির সুযোগ না পায়, এবং শিশুটি যদি তার দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ-বৃদ্ধির সুযোগ না পায় তাহলেই শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী ও বয়স-ধর্ম্মানুযায়ী পরিবেশ নিয়ন্ত্রণই নির্দেশনা। নির্দেশনা অর্থে আমরা উপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া বুঝি না। কোন ব্যক্তির ইচ্ছা অভিরুচি অনুযায়ী শক্তি-সামর্থ্য-ইচ্ছা-প্রবণতা নির্ব্বিশেষে একভাবে, এক ছাঁচে তৈরী করার প্রচেষ্টা নির্দেশনা নয়। নির্দেশনা বলতে বুঝায় শিশুর আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারী—বিকাশকে সাহায্য করা—নিজের পায়ে নিজে যাতে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য সাহায্য করা—এ সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক, মনোবিদ ও শিক্ষকের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে উপদেশ ও নির্দেশ দান তাকেই বলা হয় নির্দেশনা বা Guidance।[১]

নির্দেশনার যেমন একটা ব্যাপক তাৎপর্য আছে আবার এর খণ্ড তাৎপর্যও আছে—যেমন শিক্ষা-নির্দেশনা, বৃত্তি নির্দেশনা, বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনা। নির্দেশনার ব্যাপক তাৎপর্য বলতে আমরা বুঝি পিতামাতা শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক স্থানীয় যে কোন ব্যক্তির তত্বাবধানে শিশুর সুনিয়ন্ত্রিত স্বপ্রকাশ বা বিকাশ। শিক্ষা-নির্দেশনা ব্যাপকভাবে গৃহে ও বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন বা

---

* Guidance is *not* direction. It is not the imposition of one person's point-of-view upon another. It is not making decisions for an individual which he should make for himself. It is not carrying the burden of another's life. Rather, guidance is *assistance* made available by competent Counsellor to an individual of any age to help him direct his own life, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own burden.

Crow D. L. & Crow A. An introduction to Guidance Principles and Practices.

বিদ্যালয়ের যে কোন কার্যক্রমই যেমন খেলাধূলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রম, পাঠক্রম নির্ধারণ, সব কিছুই শিক্ষা-নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শিক্ষা-নির্দেশনা বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'ল, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, প্রবণতা, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী তার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠক্রমে পরিচালনা করা। বৃত্তি নির্দেশনার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর রুচি, বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, সমাজ-প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সর্বাপেক্ষা উপযোগী বৃত্তিতে পরিচালনা করা।

বিপথগামী শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা বলতে বুঝায়, এমন শিশুর নির্দেশনা যার ব্যাপক অর্থে নির্দেশনার কোন না কোন স্তরে গণ্ডোগোল ছিল, যেমন গৃহের পরিবেশ বা বিদ্যালয়ের পরিবেশে সুস্থতা ছিল না ও যথার্থ নির্দেশনাও ছিল না। অর্থাৎ যে সকল শিশু যথার্থ সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারছে না। অপসঙ্গতিমূলক বা সংলক্ষণ মূলক আচরণ যাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে তাদের নির্দেশনা। অর্থাৎ তাদের পুনরায় সুস্থ করে তোলা, সুস্থ জীবনযাপনে ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা। বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনাই হ'ল Child Guidance Clinic এর কাজ। এখানে Clinic কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে—এর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। Clinic শব্দটির অর্থ হল চিকিৎসাগার. Child Guidance Clinic-এ এমন সব শিশুদের নির্দেশনা দেওয়া যায় যারা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, যাদের সমাজ-সঙ্গতি বিঘ্নিত, যাদের আচার আচরণ অস্বাভাবিক ও সংলক্ষণপূর্ণ। মানসিক দিক থেকে অসুস্থ শিশুদের জন্মগত শক্তিসামর্থ্য ত্রুটিবিচ্যুতি ও লালনপালনের ত্রুটি বিচ্যুতি, সমস্ত কিছু জেনে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করে তাদের নিরাময় ও পুনর্বাসন উদ্দেশ্যে নির্দেশনা দেয়। চুরি করা, স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, স্কুল পালানো, মারধর করা, অমনোযোগিতা, ভয়াকুলতা, স্বপ্নচারিতা, এরকম নানাবিধ সমস্যামূলক আচরণের প্রকাশ পেলে গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এর প্রতিকার করতে গিয়ে অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত বাবা-মা ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিগণ মনে করেন যে শিশু অত্যন্ত খারাপ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। একে শাস্তি দিয়ে ঠিক পথে না আনতে পারলে ছেলের ও বাড়ীর সমূহ ক্ষতি। কিন্তু মনোবিদ্যায় আলোক প্রাপ্ত অভিভাবক ও শিক্ষকগণের নিকট এগুলো মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা। শিশুর মনের গভীরে যে দন্দ্বজর্জরতা, যে গূঢ়ৈষা ও জটিলতা রয়েছে এ সকল আচরণ তারই অভিব্যক্তি। মনের গভীর প্রদেশের ক্রিয়া প্রক্রিয়া,

চিন্তা স্রোতের গতিবিধি, অবদমিত ইচ্ছা ও আচরণের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। শিশুমন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ মনোবিদ ও চিকিৎসকের নির্দেশনাই শিশু-নির্দেশনা চিকিৎসালয়ে নেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-নির্দেশনা বলতে বিপথগামী শিশুদের বিপথগামী হওয়ার কারণ নির্ণয় অর্থাৎ বিপথগামী শিশুদের মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতার কারণ নির্ণয় ও তার দূরীকরণের প্রয়াসকেই বুঝায়।[১]

সংক্ষেপে বলা যায়, ক্লিনিক বলতে বুঝায় একটি এমন সংস্থা যা রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়ে ও রোগ প্রতিরোধে রোগীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করে।

শিশু নির্দেশনা চিকিৎসালয় এমন একটি সংস্থা যা সেই সব বিপথগামী ও মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত শিশুদের নিরাময়মূলক, প্রতিরোধমূলক, শিক্ষা ও সামাজিক পুনর্বাসনমূলক প্রযত্নেরও সাহায্য করে যাদের মৌলিক চাহিদা অতৃপ্ত, যারা তাদের সমাজ পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারছে না—যাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ অসঙ্গতিপূর্ণ ও রুদ্ধ এবং যার ফলে এই সব শিশুদের মধ্যে নানাপ্রকারের অস্বাস্থ্যকর সংলক্ষণ দেখা দেয়। যার ফলে নানাপ্রকারের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার এদের মধ্যে প্রকাশ পায় ও সামাজিক ও বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন বিষয়ে প্রত্যাশিত সাফল্যমানের সাথে যারা তাল রেখে চলতে পারে না।

নির্দেশনার দুই দিক :

নির্দেশনা মাত্রেরই দুটি দিক আছে—(ক) ভবিষ্যকথন (Prediction) (খ) নিয়ন্ত্রণ (Control)।

শিশুর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশকে মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে, এর বিকাশ-বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যকে

[১] A Clinic in general is an institution that offers diagnostic, therapeutic or preventive treatment to ambulatory patients.

—Encyclopaedia Britannica

Child guidance clinic is an organisation which renders service for the treatment—therapeutic, preventive, educational, social—of those children "who are in distress because of unsatisfied inner needs, or are seriously at outs with their environment—children whose development is thrown out of balance by difficulties which reveal themselves in unhealthy traits, unacceptable behaviour, or inability to cope with social or scholastic expectations". Physical and intellectual difficulties are also considered along with emotional disorders.

নির্ধারণ করে, ভবিষ্যতে এ শিশু কিরূপ আচরণ করবে, শিশু কতটা বুদ্ধিমান হবে, সমাজে সে কতটা সার্থক নাগরিক হতে পারবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যকথন করা যেতে পারে। স্বাভাবিক বিকাশধারা থেকে যে কোন বিচ্যুতি নির্দেশনা কেন্দ্রে শিশুর সম্বন্ধে জানাতে হবে। যে সব পারিবেশিক অবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছে তার সম্বন্ধেও জানাতে হবে।

পরিবেশের এইসব অসুস্থ প্রভাবকে পরিবেশ থেকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ (Control) করতে হবে।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের ইতিহাস :

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিপথগামী শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা প্রথম আরম্ভ হয় আমেরিকায়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ডঃ উইলিয়াম হিলী (William Healy) প্রথম নির্দেশনা-কেন্দ্র জাতীয় একটি সংস্থা স্থাপন করেন। দুষ্ক্রিয়তা সৃজনে পরিবেশের প্রভাব ও পারিবেশিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ দুষ্ক্রিয়তা দূরীকরণে সাহায্য করে দেখে উইলিয়াম হিলী প্রথম চিকাগো সহরে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র জাতীয় একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দুষ্ক্রিয়তার পূর্বে গৃহে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়, বর্তমানে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র পরিস্থাপন করে এই সকল সমস্যামূলক আচরণকারী শিশুদের গোড়াতেই শোধন করার প্রয়াস করা হয়, যাতে এ সমস্যামূলক আচরণ (problem behaviour) ক্রমে দুষ্ক্রিয়তায় (delinquency) রূপান্তরিত না হয়। অনেক ক্ষেত্রে গৃহ-চিকিৎসক শিশুর সাধারণ ও মৃদু সমস্যামূলক আচরণের কারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ণয় করে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু সমস্যামূলক আচরণ যখন অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির হয় তখন তার কারণ নির্ণয় ও তার দূরীকরণের জন্য বিশেষ প্রকারের চিকিৎসা ও নির্দেশনা কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়।

এরও পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উইট্‌মার (Witmer) পেনসিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মনস্তত্ত্বভিত্তিক চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও আধুনিক কালের শিশু চিকিৎসা ও নির্দেশনা কেন্দ্রের মত মনোবিদ, চিকিৎসক ও শিক্ষক স্বতন্ত্রভাবে একটি বিপথগামী শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার জাতীয় সংস্থা যখন মানসিক স্বাস্থ্য-উন্নয়নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন তখনই প্রকৃতপক্ষে 'শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র' (Child Guidance Clinic) নামটির প্রথম অবতারণা

করা হয়। ক্রমে মনোবিদ্যার নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে এর কর্মবিন্যাস ও প্রসার ফলপ্রসূ হতে থাকে।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ ও তাঁদের কাজ :

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে বিভিন্ন ব্যক্তি মিলে একটা গোষ্ঠী ও সংস্থা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিপথগামী শিশুর বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে আরম্ভ করে। শিশুর আচরণ সমস্যাটিকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে তার নিগূঢ় কারণটি আবিষ্কারের প্রয়াস করে। এই জন্য শিশু নির্দেশনা সংস্থায় নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেন—

(ক) মনশ্চিকিৎসক অধিকর্তা—এঁর প্রধান কাজ হ'ল আনীত বিপথগামী শিশুর দৈহিক ও সাধারণ মানসিক পরীক্ষা।

(খ) মনোবিদ—এঁর কাজ হ'ল বিভিন্ন প্রকার মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিশুর বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, অর্জিত ক্ষমতা, প্রবণতা, মনঃপ্রকৃতি প্রভৃতি নির্ণয় করা। শিশুর শিক্ষা বিষয়ে অসুবিধার কারণ নির্ণয়, শিক্ষা-নির্দেশনা ও প্রয়োজন বোধে বৃত্তি-নির্দেশনা।

(গ) সমাজ-সেবী—এঁরা গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে শিশুর সামাজিক অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হন।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কার্যাবলী বিবিধ ও বহুমুখী। একটি শিশুকে যখন শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের জন্য উদ্দিষ্ট ও আনীত হয়, তখন প্রথমে শিশুটির অতি শৈশবকালীন ও শৈশবকালীন বিকাশ পার্বক পরিবেশ সম্বন্ধে যত বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়।

প্রথমেই মনোবিদ শিশুটির জীবন ইতিহাস সংগ্রহে প্রয়াসী হবেন।

(ক) ব্যক্তিগত জীবন পঞ্জী—(১) পরিবারে স্থান (সন্তানক্রমে তার স্থান কোথায়—বড়, মেজ, সেজ, ছোট ইত্যাদি)।

Child guidance clinics aim at the correction of such disorders before they reach serious proportions. While the general medical practitioner with his direct observation of the family situation can do much useful work in this field, difficult cases with more complex factors need fuller investigation in a special clinic —Dawson, W. S. : Aids to Psychiatry.

(২) জন্মক্ষণে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা (স্বাভাবিক প্রসব, না অস্ত্রোপচারে প্রসব)।

(৩) অতি শৈশবকালীন স্বাস্থ্য—প্রথম দাঁত ওঠার বয়স, প্রথম হাঁটার বয়স।

(৪) পরিপাক ও পুষ্টির কোন প্রকার অসুবিধা সংক্রান্ত তথ্য।

(খ) শৈশবকালীন স্বাস্থ্য (দৈহিক ও মানসিক)—

(১) শৈশবকালে কোন আঘাত বা কঠিন রোগাক্রান্তি।

(২) স্নায়বিক দুর্বলতা।

(৩) নখ-কামড়ানোর অভ্যাস।

(৪) আঙ্গুল চোষার অভ্যাস।

(৫) তোৎলামির অভ্যাস।

(৬) অস্বাভাবিক ভয়।

(৭) অনিদ্রা, ঘুমিয়ে ভীতিকর স্বপ্ন দেখা।

(৮) যৌন-অভ্যাস।

(গ) বিভিন্ন বিষয়ে মনোভাব ও প্রতিন্যাস—

(১) গৃহে ও বিদ্যালয়ে সঙ্গী-সাথী সম্বন্ধে মনোভাব—নেতৃত্ব করে না, নেতৃত্ব মেনে চলে ; নির্দেশ দিয়ে চলতে ভালবাসে, না নির্দেশ মেনে চলতে ভালবাসে।

(২) পারিবারিক সম্পর্ক—পিতামাতা সম্বন্ধে মনোভাব ; পিতামাতার সন্তান সম্বন্ধে মনোভাব।

(৩) খেলাধূলায় স্পৃহা, ক্লাব ও অন্যান্য আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ ও অংশ গ্রহণ।

(ঘ) সাধারণ ব্যক্তিত্ব—

(১) মনঃপ্রকৃতি/অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী।
(২) আত্ম-বিশ্বাস।
(৩) প্রাক্ষোভিক স্থিরতা/অস্থিরতা।
(৪) বুদ্ধির পরিমাপ/তীক্ষ্ণ-সাধারণ—সাধারণ অপেক্ষা কম।
(৫) মানসিক কোন জটিলতা—গূঢ়ৈষা, দ্বন্দ্ব।

(ঙ) গৃহ-পরিবেশ—

(১) গৃহ-সংস্থান ও চারিদিকের লোকালয় ও তাহার প্রকৃতি।
(২) কয়টি ঘর, থাকার ব্যবস্থা কিরূপ, শয়ন-কক্ষ ও শয়ন ব্যবস্থা অর্থাৎ একই ঘরে বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে নিদ্রা যায় কি না।
(৩) পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি।
(৪) নিয়মশৃঙ্খলা—নির্মম ও আচার-সর্বস্ব, স্বাভাবিক, অত্যন্ত ঢিলে-ঢালা ভাব।
(৫) গৃহে নির্মল আনন্দচয়নের আয়োজন—বেতার, গ্রামোফোন, শিশুদের উপযোগী বই-এর সংগ্রহ, ছবি-সংগ্রহ, খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ।
(৬) পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক — সহযোগিতাপূর্ণ — পরস্পর বিশ্বাস—একমুখী কর্ম-প্রবাহ, সন্তান প্রতিপালনে একমত/মতবিরোধ/পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক—নির্মম আচরণ, উদাসীনতা, প্রত্যাখ্যানের ভাব, অতিরিক্ত আদর, যা চাই তাই পাই এরূপ মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া।

(চ) পারিবারিক ইতিহাস—(১) পরিবারে কারো মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতা—পিতা মাতা, পিতামহ, মাতামহ, ভাই-বোন, মামা, মাসিমা, পিসিমার মানসিক কোন রোগ, আত্ম-হত্যার নজির, পরিবারের কেউ খুনী, মদ্যপ আছে কি না জানা।

(২) **পিতামাতার ব্যক্তিত্ব**—বিষাদপূর্ণ /অস্থির চিত্ত/আত্মবিশ্বাসহীন /আনন্দময় /স্থিরশান্ত/আত্মবিশ্বাসে সংহত।

উপরোক্ত বিষয়ে মনোবিদ সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করার পর আনীত শিশুর উপর কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন—গুণগত ও পরিমানগত পরিমাপনের জন্য মনঃপরিমাপনমূলক (Phychometric) অভীক্ষা, মনঃ-প্রক্ষেপণ মূলক (Projective) অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন। এর মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের একটা সামগ্রিক চিত্ররূপ পাওয়া যাবে। মানসিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতার স্বরূপ ও প্রকৃতিও এর মধ্যদিয়ে আরও নৈর্ব্যক্তিকভাবে আবিষ্কৃত হতে পারে।

চিকিৎসকের কাজ ঃ

শিশু পরিচালনা কেন্দ্রে **চিকিৎসকেরও** (Medical man) একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য-বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। অতি শৈশবে তার কোন কঠিন রোগ হয়েছিল কি না, হাঁপানী, টাইফয়েড, রিকেট্ রোগ ছিল কি না, দাঁত, চোখ ও কানের কোন গঠনগত বা কার্যকারিতার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কি না এ সকল বিষয়ে পুঙ্খনাপুঙ্খ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়া আনীত শিশুর ওজন উচ্চতা বয়স প্রভৃতি বিষয়েও সাধারণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সাথে সমতা অসমতা বিচার করে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। মোটের উপর চিকিৎসক শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন।

সমাজ-সেবীর কর্তব্য ঃ

(১) সমাজ-সেবীদের প্রথম কাজ হ'ল শিশুর গৃহ, শিশুর পাড়া-প্রতিবেশী, খেলার সাথী, বিদ্যালয়, ক্লাব ও অন্যান্য সংস্থা থেকে শিশুর ভৌতিক ও

মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার সম্ভাব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা। ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে বিচার্য্য হবে শিশুর বাসস্থানের প্রকৃতি, যেমন কয়টা ঘর, ঘরে আলো হাওয়া আছে কি না, বাড়ী স্যেঁৎস্তেতে না নূতন, বাড়ীতে খেলাধূলার স্থান কতটা আছে, খেলাধূলার সরঞ্জাম আছে কি না, বাড়ীটি কিরূপ লোকালয়ে অবস্থিত, শিল্প এলাকা ও ঘন বসতিপূর্ণ কি না, লোকালয়ের সংস্কৃতির মান ইত্যাদি। মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে পড়বে শিশুর মৌলিক মানসিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা গৃহে ও বিদ্যালয়ে আছে কি না সে সম্পর্কে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করা। পিতামাতার শিশুর প্রতি প্রতিন্যাস ও আচরণ, পিতা-মাতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাইবোনের মধ্যে সম্বন্ধ, গৃহে নিয়মশৃঙ্খলা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে দেখা হবে বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লোকালয় ও তার সাংস্কৃতিক মান, বিদ্যালয়ের ঘরের অবস্থা, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, খেলাধূলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমের ব্যবস্থা আছে কি না এসব বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

(২) আনীত শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে মনোবিদ, সমাজ-সেবী ও চিকিৎসকের তথ্যের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করা হবে তা প্রয়োগ করে কতটা ফল পাওয়া যাচ্ছে তার নিরীক্ষা করাও সমাজ-সেবীদের কর্তব্য।

(৩) সমস্যামূলক আচরণ, ক্লাবে খেলাধূলা ও অন্যান্য আনন্দ প্রদায়ী সংস্থায় যোগ দিয়ে বা যথাযথ কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে প্রশমিত হচ্ছে কি না তার পর্যবেক্ষণ করাও সমাজ-সেবীর কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) শিশু নির্দেশনাকেন্দ্রের অধিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, গৃহে বা বিদ্যালয়ে যদি কোন পরিবেশান্তরের প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা করা, পিতা-মাতার সন্তান প্রযত্নে যে ত্রুটি ধরা পড়বে তা শোধন করার জন্য পিতামাতার সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের এ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার আলোকে আলোকান্বিত করে সচেতন করে তোলা।

চিকিৎসক, মনশ্চিকিৎসক, মনোবিদ ও সমাজসেবী-চক্র
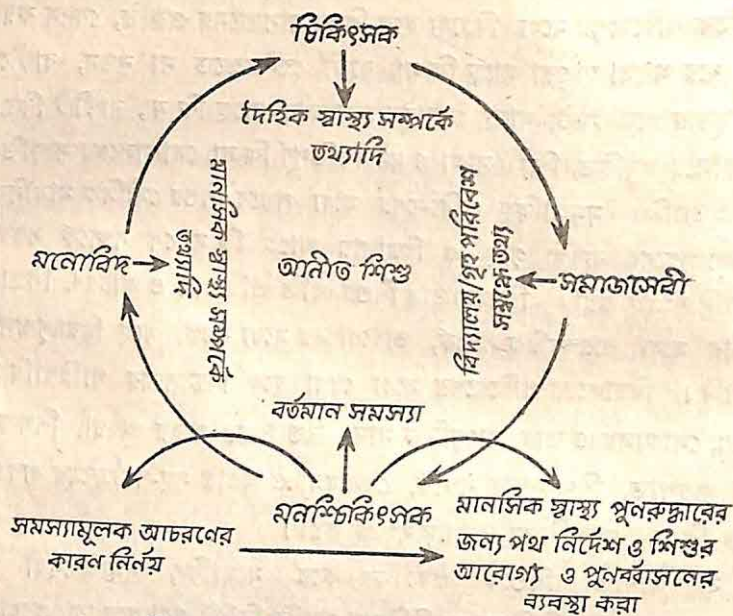
শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে আলোচনা-চক্র

আনীত শিশু সম্বন্ধে, চিকিৎসক, মনোবিদ ও সমাজসেবী-প্রদত্ত তথ্যাদি ও শিক্ষক বা পিতামাতা কর্তৃক শিশু সম্বন্ধে যে অভাব অভিযোগ ও বিকৃতির বিবরণ এবং শিশুর সাথে কথোপকথনের (Interview) মধ্য দিয়ে যে তথ্য আবিষ্কৃত হয় তার ভিত্তিতে চিকিৎসক, মনোবিদ, মনশ্চিকিৎসক ও সমাজ সেবীর মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা হয় এবং পরস্পর আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশুর সংলক্ষণ পূর্ণ (Symptomatic) আচরণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা হয়। এবং এই কারণ দূরীকরণের জন্য কোন পথ যথার্থভাবে অবলম্বিত হওয়া সমীচীন তাও নির্ধারিত হয়।

শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রে যে সব শিশু আনীত হয় তাদের মধ্যে দুই প্রকারের সমস্যা ও সংলক্ষণ দেখা যায়—(১) শিশুর আচরণে অত্যন্ত অস্থিরতা ও ধ্বংসাত্মক ভাব প্রকট হয়ে ওঠে, যেমন বদ মেজাজ, অবাধ্যতা, স্কুল পালিয়ে যাওয়া, চুরি করা, স্কুলের ও বাড়ীর জিনিসপত্র ভাঙ্গা প্রভৃতি (২) সব সময় ভয় ভয় ভাব, হাত-পা ঘামা, অল্পতেই অস্থির হয়ে যাওয়া।

প্রায়শঃই এই দুই প্রকারের সংলক্ষণই শিশুর মধ্যে মিশ্রিতভাবে দেখা যায় যে শিশু আপাত আক্রমণমুখী তার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে নিরাপত্তা বোধের

অভাব ও অপরাধবোধ প্রবলভাবে কাজ করে এবং উদ্বায়ুগ্রস্ত (Neurotic) শিশু তার অবদমিত ক্রোধকে চিকিৎসা কালেই নানাভাবে প্রকাশ করে। একটি শিশু প্রায়শঃই একটি সংলক্ষণ-পূর্ণ আচরণের জন্য যদিও শিশুনির্দেশনাকেন্দ্রে আনীত হয়, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায় যে আরও গভীর ও বিপজ্জনক অসুখ সেই শিশুর মধ্যে রয়ে গেছে। এই কারণে চিকিৎসা কখনই কেবল সংলক্ষণ দূরীকরণের দিকে উদ্দিষ্ট থাকে না, এই সংলক্ষণের পিছনে যে গভীর ও গোপন কারণ শিশুর বিকৃত ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং যে সব অবস্থা ও কারণ ব্যক্তিত্ব বিকৃতির কারণ, তার দূরীকরণে প্রয়াস করে। এই সব কারণ একদিকে যেমন কিছুটা শিশুর মধ্যে, অপর দিকে পরিবেশের মধ্যে; কিছুটা অতীতে, কিছুটা বর্তমানের মধ্যে নিহিত থাকে। কখনো দৈহিক বিকাশ-বিকৃতির জন্য, কখনো শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক স্বাভাবিক বিকাশ-বিচ্যুতির জন্য সংলক্ষণ পূর্ণ আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকটিত হয়ে ওঠে। সেইজন্য চিকিৎসায় শিশুর জীবনের কোন জায়গায় সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, এবং এর উপরই নির্ভর করবে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কার প্রয়োজন কোন ক্ষেত্রে কতটা লাগবে। অবশ্য সকল আনীত শিশুর ক্ষেত্রে নির্দেশনা-কেন্দ্রের সকল বিশেষজ্ঞই আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসবেন।[১]

শিশুনির্দেশণাকেন্দ্র স্থাপন—তার প্রয়োজনীয় উপাদান

(Organisation & establishment of a child guidance Clinic):

শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিক যে সব প্রয়োজন সেগুলির সংস্থান করার প্রয়াস যৌথভাবে করতে হবে। প্রথমতঃ শিশুনির্দেশনার সামাজিক উপযোগিতা ও এর ক্রিয়া কলাপের মধ্য দিয়ে যথার্থই যে, শিশু-স্বাস্থ্য উন্নীত হতে পারে, এ সম্বন্ধে সমাজ সচেতনতা নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পিত প্রচার কার্য চালাতে হবে। যথার্থভাবে মনোবিদ্যার প্রয়োগ বিষয়ে ও শিশু-নির্দেশনার উপযোগিতা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ না ঘটে ও এতে তাঁরা গভীরভাবে বিশ্বাস না করে তাহলে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

---

[১]Treatment is not so much based on the Symptoms, as on the degree and depth of the general disturbance in the child's personality and on the different causes or factors behind it. Now these causes are both in the child and in his environment; they are in the past and in the present; they are social, intellectual and emotional; hence the type of treatment will be directed according to where the main stresses are to be found, while the role of the different members of the team will vary accordingly.

Burns. C, L.: Maladjusted children.

দ্বিতীয়তঃ শিশু-নির্দেশনা স্থাপনের জন্য যে আর্থিক দায়-দায়িত্ব তা মেটাবার ভার এককভাবে সরকার নিতে পারেন, বা সরকারী ও বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টায়ও তা মিটতে পারে। আবার সমস্ত অর্থই বেসরকারী কোন জনকল্যাণ-কামী সংস্থার উদ্যোগে সংগৃহীত হতে পারে। কিন্তু এ অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ নির্ভর করে এ সম্বন্ধে সামাজিক চেতনার ওপর। কাজেই সরকারী ও বেসরকারী মহলে দেশ বিদেশে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র কি ভাবে গড়ে উঠছে ও তা কি ভাবে মানবিক শক্তির যথার্থ ব্যবহারে ও সমাজ-সুস্থতা রক্ষা করতে সাহায্য করেছে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

যদি এককভাবে শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন আর্থিক দিক থেকে একবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মানসিক চিকিৎসাগারের বহির্বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে, কিংবা বিদ্যালয়ের সাধারণ চিকিৎসা-কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রেখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থেকেও শিশুনির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এতে আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সাশ্রয় হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের সাথে জনসাধারণের পরিচিতি হতে পারে। শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের উপযোগিতা সম্বন্ধেও জনসাধারণ বুঝতে পারে। এ উপযোগিতা সম্বন্ধে সম্যক সচেতনতা আসলে এর দ্বারা যথার্থই যে শিশুর কল্যাণ সাধিত হয়, এ সম্বন্ধে জনসাধারণ যদি গভীরভাবে আস্থাশীল হয়ে উঠে, তা হলে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে একক শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনে প্রয়াসী হয়ে উঠতে পারে।

শিশু পরিচালনা গৃহ-সংস্থান ও তার উপকরণ ঃ

একটি শিশু পরিচালনা গৃহে অন্ততঃ চার থেকে ছয়টি বড় বড় ঘর থাকা প্রয়োজন। একটি ঘর হবে মনশ্চিকিৎসকের, একটি হবে মনোবিদের, একটি সমাজ সেবীদের, আর বাদ বাকী ঘর গুলির মধ্যে একটি হবে পিতা মাতা ও অভি-ভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের বসার ঘর। একটি অফিস ঘর ও একটি হবে মনস্তাত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগের ঘর। এছাড়া খেলা ধূলার জন্য খোলা কিছু জায়গা, ছোট একটু বাগান থাকবে। প্রতিটি ঘর সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো থাকবে। পরিচ্ছন্নভাবে সমস্ত কিছু পরিপাটি করা থাকবে। ঘরগুলোতে আলো হাওয়ার প্রাচুর্য থাকবে। মোটের উপর ঘরগুলো এমন সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে যে শিশুকে যখন সেখানে নির্দেশনার জন্য আনা হবে তখন সে আকৃষ্ট হবে। সমস্ত পরিবেশটি যেন প্রচ্ছন্নভাবে বন্ধুর মত তাকে হাতছানি দেবে।

এদিক থেকে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রটি একক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে বিদ্যালয়ের সাথেই শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এতে স্থান সঙ্কুলানের সমস্যাটি অত প্রকট হয় না। কিন্তু এতে অসুবিধাও দেখা দেয়, বিদ্যালয়ের প্রশাসনের সাথে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের প্রশাসন একত্রিত হলে নানা প্রকারের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, প্রায়শঃই বিদ্যালয়ের বিষয়েই কর্তৃপক্ষের অধিক মনোযোগ থাকে, এদিকে তেমন নজর দেওয়া সম্ভব হয় না, বিদ্যালয়ের ছেলেদের গণ্ডগোল অনেক সময় নির্দেশনা কেন্দ্রের কাজে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসাগারের সাথে কখনও কখনও শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হয়, এতেও স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা থাকে না, এবং দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলেই তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু এর অসুবিধা হ'ল যে, শিশুদের মনে প্রথম থেকেই চিকিৎসাগারের পরিবেশ দেখে একটা ভয় ভয় ভাবের উদ্রেক হতে পারে। মানসিক চিকিৎসাগারের সাথে শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হলে আরও অসুবিধা দেখা দেয়। পিতা মাতা ও অভিভাবকগণ মানসিক চিকিৎসাগার সংশ্লিষ্ট শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে ছেলেমেয়ে আনতে ইতস্ততঃ করেন। সামাজিক দিক থেকে এতে ছেলেদের সম্বন্ধে মস্তিষ্কের রোগ বা পাগল বলে আখ্যায়িত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বলে এঁদের একটা ভয় ও সংশয় থাকে। এই সব কারণে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয়।

নিম্নলিখিত উপকরণাদি শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে একান্ত ভাবে থাকা দরকার।

(১) দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য—যাবতীয় উপকরণ যেমন স্টেথোস্কোপ, চোখ, কান পরীক্ষা করার সব রকম সাজ সরঞ্জাম, ওজন নেওয়ার যন্ত্র, উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র, প্রভৃতি।

(২) মানসিক অভীক্ষা—বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা, (টারমান মেরিলের ১৯৬০ সালের সংশোধিত, সংস্করণ ওয়েসলার বেলভিউ টেষ্ট) সম্পাদনী অভীক্ষা (পাস-এ্যালঙ কালার মেটরেসিস্, ব্লক ডিজাইন) স্মৃতি অভীক্ষা (জাসট্রোস মেমোরি এ্যাপারেটাস্) ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (টি. এ. টি টেষ্ট, রসা, (Thematic Apperception Test, রসাক্ (Rorschach Test), নিউরোটিক ইন্ভেন্টোরী (Bernreuter Neurotic Inventory), প্রবণতার অভীক্ষা (Interest Inventory), প্রতিক্রিয়াকাল পরিমাপক অভীক্ষা (Reaction time vernier chronoscope), স্থিরতা পরিমাপক অভীক্ষা (Steadiness apparatus)।

এ ছাড়া কেসহিস্ট্রি ফর্মও (Case history form) থাকবে। এতে শিশুর বিকাশ ধাঁয়ের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ধারাবাহিক বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়। দিনলিপি যথাযথভাবে রাখার জন্য ডায়েরী সিটেরও (Dairy sheet) প্রবর্তন করা হবে। এতে আনীত একটি শিশুর আচার আচরণ, বিশেষ ঘটনা, উন্নতি অবনতির একটি মোটামুটি খসড়া করা যায়।

(৩) খেলাধূলার জিনিসপত্র—কাঠের ব্লক, রুড্, দোলনা, ছোট বল, ক্যারম, বাগা টেলি, ছোটদের জন্য নানা রকম খেলনা পুতুল, রঙ বেরঙে্র ছবি প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনে শিশু যে সব বস্তুর সংস্পর্শে আসে খেলনাগুলো তারই আদর্শে নির্মিত হবে। চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে স্যাণ্ড ট্রে (Sand tray) এবং জল স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) **অন্যান্য আসবাব পত্র ঃ**

চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক, ইজিচেয়ার, আলমারী, কাগজপত্র ফর্ম ইত্যাদি রাখার জন্য বিশেষ আলমারী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বসার উপযোগী চেয়ার ও টেবিলের ব্যবস্থা থাকবে। মনঃস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগের জন্য বড় চৌকানা টেবিল, অভীক্ষা গুলি রাখার জন্য দুটি বড় আলমারী, খেলার ঘরের জন্য বড় সতরঞ্চির ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দেশে শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও অসুবিধা ঃ

শিশুর মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য যে আর্থিক ও অন্যবিধ আনুকূল্য থাকা দরকার তার যৌথ প্রয়াস যেমন চারিদিকে করতে হবে, অর্থাৎ গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশে যাতে সুষম খাদ্য, খেলাধূলা আলো হাওয়াযুক্ত প্রশস্ত বাসস্থান লাভের সুযোগ প্রত্যেকে পায় তার জন্য সামগ্রিকভাবে প্রয়াস করতে হবে, অন্যদিকে শিশু প্রযত্নে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান যাতে পিতামাতার মধ্যে সঞ্চারিত হয় তার জন্য শিশু-নির্দেশনা মাধ্যমে প্রচার কেন্দ্রের প্রচেষ্টার কাজ করে যেতে হবে।

মানসিক শক্তি অমূল্য সম্পদ। এর অপচয় দেশের সমূহ ক্ষতি করে। দেশের সমৃদ্ধি ও সুস্থতা মানবিক শক্তির যথার্থ নিয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব। মানসিক শান্তি ও শৃঙ্খলা পারস্পরিক বুঝা পড়া, সহিষ্ণুতা, ও প্রত্যেকের যথার্থ কর্ম সংস্থান ও সার্থকতার মধ্য দিয়েই আসে। আমাদের দেশে মানবিক শক্তির অপচয় অত্যন্ত প্রকট। শিশুর মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের সম্যক

ব্যবস্থাও আমাদের দেশে এখনও অপর্যাপ্ত। সন্তান প্রযত্নের মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের দেশের পিতা মাতা ও শিক্ষকগণ যথাযথভাবে জ্ঞানান্বিত নয়। প্রত্যেকটি শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী তার সর্বাধিক উপযোগী বিষয়ে পঠন পাঠন ও কর্মসংস্থানের জন্য শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রও আমাদের দেশে বিরল। এবিষয়ে গণ-চেতনা ও আর্থিক সংস্থান দুইএরই আমাদের দেশে অভাব। ছাত্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষ এখন যেরূপ প্রকট হয়ে উঠছে তাতে প্রতিটি ছাত্রের অভাব অভিযোগ, সামান্যতম অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ পরিলক্ষিত হলে গোড়াতেই তার প্রতিকার ও অপসঙ্গতি পূর্ণ আচরণের তাৎপর্য ও তার কার্য কারণ সম্বন্ধ বিষয়ে যৎকিঞ্চিত জ্ঞানদান বিষয়ে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র যত বেশী স্থাপিত হয় ততই মঙ্গল। এককভাবে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন যদি আর্থিক দিক থেকে অসম্ভব হয়ে পড়ে, তা হলে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-নির্দেশনার (Educational Guidance) সাথে শিশু-নির্দেশনা (Guidance for maladjusted children) চলতে পারে। বিদ্যালয়ের চিকিৎসক, শ্রেণী-শিক্ষক, মনস্তাত্বিক ও Career Master ও সমাজ সেবীদের সাহায্য নিয়ে ও বিদ্যালয় এবং বাড়ীর মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষক, চিকিৎসক, মনোবিদ বা Career Master ও মনশ্চিকিৎসকের মধ্যে আনীত বিপথগামী শিশু সম্বন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা হতে পারে ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েও যদি শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব না হয়, তা হলে এক একটি এলাকায় কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে যাতায়াতের সুবিধা হয় এরকম কেন্দ্র-স্থানীয় কোন স্কুলের সঙ্গে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এ ছাড়া বেসরকারী উদ্যোগে জন-কল্যাণকর সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েও শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এরূপ কেন্দ্রে একজন বা দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারাও কাজ চালিত হতে পারে। বর্তমানে পল্লী অঞ্চলে নূতন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। এই সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েও শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এই সকল শিশু-নির্দেশনার ব্যয়ভার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ বহন করতে পারে। বিদ্যালয়ে শিশু-নির্দেশনার ব্যবস্থা করা হলে তার ব্যয়ভার অর্ধেক সরকারী সমাজ-কল্যাণ বিভাগ ও বাকী অর্ধেক শিক্ষা দপ্তর বহন করতে পারে।

ভারতীয় জীবনযাত্রার ও পারিবারিক কাঠামো ভারতীয় জীবনমান ও সংস্কৃতির সাথে পদ্ধতি রেখে মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষাগুলিকে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে হবে। বিপথগামিতার কারণ নির্ণয়ে কেবল বিদেশীয় তত্ত্বকে সার করলে চলবে না, দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ও সম্পর্ক-নিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ বিশ্লেষণে ব্রতী হতে হবে।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কার্যকারিতা

(Functions and utilities of child guidance clinic)

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—(ক) সমস্যামূলক বা অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের কারণ নির্ণয় এবং কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা ও শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ (Diagnosis)।

(খ) ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতিকে সারিয়ে তোলার জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন (Prognosis)।

শিশুর অপসঙ্গতি জন্মগত দৈহিক কারণে ঘটতে পারে, আবার অসুস্থ পারিবেশিক প্রভাবের জন্য শিশুর অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব ও জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। যেমন শিশুর মা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, এরূপ মানসিক অভিজ্ঞতা থেকে তার মধ্যে মা সম্পর্কে একটা গভীর গূঢ়ৈষার সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা তার বিচার বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে এবং স্বাভাবিক সঙ্গতি ব্যাহত হয়। মনের গভীরে কি জটিলতা কাজ করছে তার আবিষ্কার করা ও শিশুর অপসঙ্গতির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন কাজ। বিশেষজ্ঞ ভিন্ন এ সম্ভব নয়। মনোবিদ মনশ্চিকিৎসকের ঐকান্তিক প্রয়াস ভিন্ন এ কাজ করা যায় না। তা ছাড়া শিশুর প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও ভালবাসা, শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের পরিচ্ছন্ন আনন্দকর পরিবেশ শিশুকে মনশ্চিকিৎসকের কাছে তার গভীর গোপন কথা তার প্রকৃত অসুবিধার কথা যাতে খুলে বলতে উদ্দীপ্ত করে। এ বিষয়ে নিম্ন লিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হয়; নিম্নপ্রকারের মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়—

(ক) সাক্ষাৎকার (Interview)

(খ) প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক অভীক্ষা (Questionnaire)

(গ) জীবন-বিকাশ পর্বের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখন পদ্ধতি (Case History Method)

(ঘ) অভিক্ষেপণ মূলক অভীক্ষা (Projective Tests)

(১) রসাক্ অভীক্ষা (Rorschach Test)

(২) থেমাটিক অভীক্ষা (Thematic Apperception Test)

(৩) শব্দানুসঙ্গ অভীক্ষা (Word Association test)

প্রত্যক্ষ পরিচিতি : (Interview)

প্রত্যক্ষ পরিচিতির সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে চিকিৎসক ও মনস্তাত্ত্বিক আনীত শিশু সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। শিশুর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুভাবে মিশে তার সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে পারে। তার বাড়ীতে কি অসুবিধা, বাড়ীর বাবা মা সম্বন্ধে তার প্রতিন্যাস, বিদ্যালয়ে তার কি সুবিধা অসুবিধা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি তার ধারণা, তার শক্তি সামর্থ ও প্রবণতা সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক ধারণা করা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিশুর বিপথগামিতার কারণও নির্ণয় করা যেতে পারে। এরূপ সাক্ষাৎকার কখনও পূর্ব-পরিকল্পিত হতে পারে, অর্থাৎ কি কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা হবে তা পূর্ব থেকেই ঠিক করে নেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও খোলাখুলি নানা বিষয়ে প্রয়োজনমত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্রত্যক্ষ পরিচিতি একদিকে যেমন অনেক তথ্যাদি আহরণে সাহায্য করে, অন্যদিকে এর ত্রুটিও আছে, এ সকল তথ্যাদি যথার্থভাবে নৈর্ব্যক্তিক নাও হতে পারে। শিশু তার মনের গভীর কথা নাও বলতে পারে। ভুল ও মিথ্যা তথ্যের দ্বারা বিপথে চালিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

জীবন বিকাশের ইতিহাস (Case-history Method) :

ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গড়ে ওঠে না। মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থা থেকে বিকাশ-পর্ব আরম্ভ হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পারিবেশিক প্রভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা পারিবেশিক শক্তির স্বরূপের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে—সুস্থ পরিবেশ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। অসুস্থ পরিবেশ ব্যক্তিত্বকে অসুস্থ করে ফেলে।

শিশুর ক্রমপর্যায়ী ধারাবাহিক জীবন ইতিহাস-লিপি গ্রহণ শিশুর বিপথগামিতার কারণ নির্ণয়ে একান্তভাবে অপরিহার্য। অতীত ও বর্তমান পরিবেশের পুঙ্খানাপুঙ্খ বিবরণ শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের সমাজ-কর্মীগণ (Social

worker) বাড়ীতে পিতা মাতা, ও বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণী শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকেন।

কেস্-হিস্ট্রিফর্মের নমুনা ঃ

শিশুর সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্যাদি

নাম—

বয়স—

ঠিকানা—

ভাইবোনের সংখ্যা ও তাদের বয়স—

বিদ্যালয়ের পাঠক্রম—

যাঁদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তাঁদের নাম ও শিশুর সাথে তাদের সম্পর্ক ঃ

তথ্যদানকারীদের মতে আনীত শিশুর সমস্যামূলক আচরণের বিবরণ ও ও শিশুদের সম্বন্ধে অভিযোগ—

এ সকল সমস্যামুলক আচরণের আরম্ভ কি ভাবে ও কতদিন হ'ল সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা—

(ক) পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিক

(১) পিতা

পিতার নাম

বয়স—

শিক্ষাগত মান—

পেশা—

আয়—

পিতা ছেলের সাথে থাকে, না চাকুরীর জন্য প্রবাসে থাকে—

আনীত শিশুর জন্ম সময়ে পিতার বয়স—

পিতার স্বাস্থ্য—

ব্যক্তিত্ব—রাগী, ধীর স্থির/অস্থির-চিত্ত ও রাগী

অন্তর্মুখী/বহির্মুখী

বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দমুখর

হতাশা ও বিষাদাক্রান্ত

(২) মাতা

নাম— শিশুর জন্মসময়ে
বয়স— মাতার বয়স—
শিক্ষাগত মান— মাতার স্বাস্থ্য—
গার্হস্থ্য/চাকুরী— মাতার ব্যক্তিত্ব—আক্রমনধর্মী, সব সময় সন্তানের সাথে খিটি-মিটি ভাব
আয়— অন্তর্মুখী/বহির্মুখী
বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দমুখর
হতাশা ও বিষাদাক্রান্ত

(খ) ভাইবোন

ভাইবোনের সংখ্যা—

তাদের জন্ম-সন্—

ভাইবোনের সম্পর্ক (প্রীতিপূর্ণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, হিংসা ও দ্বেষ জর্জরিত, উদাসীন, অনুকরণসাপেক্ষ, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল)।

(গ) কি ধরণের পরিবার—যুক্ত বা একাকী।

(ঘ) পরিবারের মা বাবা ও ভাইবোন ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তি—তাদের সাথে শিশুর সম্পর্ক ও পরিবারে তাদের স্থান।

(ঙ) পরিবারে কারো মানসিক রোগ আছে কি না তা জানা।

(১) বর্তমান পরিবারের, অর্থাৎ পিতামাতা, ভাইবোন এদের কারো মধ্যে।

(২) পিতার দিক থেকে, যেমন ঠাকুরদাদা, কাকা জ্যাঠা পিসি প্রভৃতি।

(৩) মাতার দিক থেকে, যেমন দিদিমা, মাসিমা, মামা প্রভৃতি কারো মধ্যে মানসিক ব্যাধি ছিল কি না জানা।

(চ) পারিবারিক শৃঙ্খলা—

দুর্বল/অতন্ত্য কঠোর/অসামঞ্জস্যপূর্ণ (একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সন্তানের সাথে বিভিন্ন প্রকার আচরণ করে থাকে, বিভিন্ন প্রকার আচরণমান অনুসরণে প্ররোচিত করে।

সর্বদা শিশুদের সর্বপ্রকার কাজে বাধা ও সমালোচনা, জোর করে পরিবারে নিয়ম শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা।

(ছ) পরিবারে সাংস্কৃতিক আনন্দ আহরণের সুযোগ (বেতার, ছোটদের উপযোগী সাহিত্য, খেলাধূলার উপকরণ)।

(জ) গৃহের ভৌতিক পরিবেশ—খোলামেলা, বদ্ধ/সুস্থির/অস্থির গৃহ পরিবেশ। গৃহে আবেগ পরিবেশ।

(ঝ) পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক—মধুর/কলহপূর্ণ/সুস্থির/উত্তেজনাপূর্ণ।

শিশুর বিকাশ পর্ব ঃ

(১) গর্ভাবস্থায় মাতার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য।

(২) শিশুর প্রসব প্রকার (জন্মকালে কোন আঘাত, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম, না স্বাভাবিক প্রসব)।

(৩) শিশু জন্মাবার পর প্রথম দু'মাস মাতার স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল।

মাতা-সন্তানের বিভিন্ন দিকের সম্পর্ক ঃ

(ক) স্তন ছাড়ার বয়স।

(খ) মলমূত্র পরিত্যাগে মা'র শিক্ষাদান পদ্ধতি—বিছানায় প্রস্রাব করার অভ্যাস আছে কি না।

(গ) খাদ্যাভ্যাস (খাদ্যের সুষমতা, দুবার খাদ্যের মধ্যে সময় পার্থক্য।

(ঘ) নিদ্রাভ্যাস ঃ

নিদ্রার সময়—নিয়মিত/অনিয়মিত/প্রশান্ত নিদ্রা/নিদ্রাকালে ভয়াবহ স্বপ্ন, নিদ্রা সঙ্গী—বাবা/মা/ভাই/বোন/আর কেউ, নিদ্রা ব্যবস্থা। নিদ্রার আবেগগত অসুবিধা।

(ঙ) মার সাথে শিশুর বিচ্ছেদের কোন ইতিহাস যদি থাকে তার স্বরূপ। বিচ্ছেদের সঠিক সময়।

পিতা-সন্তানের সম্পর্ক ঃ

সন্তানের সাথে পিতার সম্পর্ক—বন্ধুত্বপূর্ণ। সন্তানকে অত্যন্ত আদর দেওয়া আক্রমণমূলক/উদাসীনতা।

খেলার সাথী ও বন্ধুবান্ধব ঃ

(ক) খেলায় আগ্রহ।

(খ) খেলার সাথীদের বয়স—বেশী বয়েসী/
কম বয়েসী/
সমবয়েসী/

(গ) খেলাধূলার বিষয়ে বাবা মা বা অন্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিয়ত বাধা পেয়েছে কি না।

শিক্ষাগত জীবন ঃ

প্রথম বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা/বা নার্সারী/কিণ্ডারগার্টেন

বিদ্যালয়ে ভর্তির তারিখ

কোন ক্লাসে ভর্তি হয়—

কোন ক্লাসে অকৃতকার্য হয়েছিল কি না—

শিক্ষকছাত্র সম্বন্ধ—

শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (নেতৃস্থানীয়/অন্য কোন ছেলের নির্দেশ মেনে চলা/একাকী থাকতে ভালবাসা/নিজ থেকে অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীর সাথে মেশার প্রবণতা।

বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল ঃ

অধীত বিষয়	বিগত বাৎসরিক পরীক্ষার নম্বর	এ বৎসরের অর্দ্ধ বাৎসরিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর	বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে কৃত-কার্যতা	কোন কোন পাঠ বিষয়ে অধিক আগ্রহ

বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক বিষয়ে উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মাত্রা।

নিজের রুচিমত পাঠবিষয় নির্ধারণ না অন্যের চাপে কোন বিষয় পাঠে বাধ্য হওয়া।

বিদ্যালয়ে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত।

বিদ্যালয়ে খেলাধূলা অন্যান্য সহপাঠক্রমিক বিষয়ের ব্যবস্থা কতটা আছে তার হিসাব—

দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ

উচ্চতা, ওজন।

সাধারণ স্বাস্থ্য—

চোখের অবস্থা/চোখের কোন অসুখ আছে কি না

দাঁতের অবস্থা/দাঁতের কোন অসুখ আছে কি না

কানের অবস্থা/শোনার কোন অসুবিধা আছে কি না

তোৎলামি, অপুষ্টি, অজীর্ণতা, ক্লান্তি, মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ আছে কি না—

ব্যক্তিত্ব	১ অত্যন্ত খারাপ	২ খারাপ	৩ সাধারণ	৪ ভাল	৫ অত্যন্ত ভাল
পরিবারে, বিদ্যালয়ে সঙ্গতির স্বরূপ —					
বুদ্ধি—					
প্রাক্ষোভিক পরিণতি—					
অধ্যবসায়—					
মনোযোগ—					
পরিচ্ছন্নতা—					
আত্ম-সমালোচনা—					
নেতৃত্বের-ক্ষমতা—					
ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ—					
সততা—					
আত্মবিশ্বাস—					
অনুগামিতা—					
সহেযাগিতা—					

নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ আনীত শিশুর মধ্যে পরিস্ফুট হয় বলে মনে হয়—

বিষন্নতা, আলস্যপরায়ণতা, ভয়াকুলতা, সন্দেহ পরায়ণতা, উত্তেজিত ভাব, অধিক কথন, মিথ্যাকথন, অপহরণপ্রবণতা, নিষ্ঠুরতা, জিনিসপত্র ভাঙাচোরা, একগুঁয়েমি, হঠাৎ রেগে যাওয়া, দিবাস্বপ্নচারিতা প্রভৃতি।

উপসংহার ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিদ্যালয়ের জন্য নির্দেশাবলী—

গৃহের জন্য নির্দেশাবলী—

উপরোক্ত বিষয়ে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে ও তার বিচার বিশ্লেষণ করে আনীত শিশুর মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ ও তার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ

নির্ণয় করা হয় ও এই কারণ দূরীকরণে মনশ্চিকিৎসক নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই পদ্ধতির মধ্যেও ভুল ভ্রান্তি একদেশদর্শিতা থাকতে পারে, সেজন্য অন্যান্য আরও নৈর্বক্তিক পদ্ধতি আনীত শিশুকে জানার বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়।

প্রশ্নোত্তরভিত্তিক অভীক্ষা (Questionnaire):

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক প্রশ্ন লিখিত ভাবে ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। প্রশ্নোত্তরগুলি 'হ্যাঁ' বা 'না'-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মানসিক সংগঠন কিছু পরিমাণে ধরা পড়ে। প্রত্যক্ষ পরিচিতিতে ব্যক্তি লজ্জা ও সঙ্কোচে অনেক কথা বলতে দ্বিধা বোধ করে, কিন্তু প্রশ্নোত্তরে সে সব কথা বলা সহজ হয়। ব্যক্তিকে তার চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিন্যাস সংক্রান্ত নানা দিকে প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নোত্তর নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাস্রোতকে অনুসন্ধান করে দিতে পারে। এই প্রশ্নোত্তর গুলি ভুল শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় না।

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য আহরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ও আদর্শায়িত অভীক্ষা বর্তমানে প্রচলিত। এর মধ্যে বার্ণরয়টার ইন্‌ভেণ্ট্রি (Bernreuter Inventory), মিনেসোটা মাল্টিফেসিক্ পার্সোনালিটি ইন্‌ভেণ্টরি (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বার্ণরয়টার ও এম্. এম্. পি. আই. অভীক্ষা দুটি প্রধাণতঃ মানসিক দিক থেকে অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হয়—মানসিক অসুস্থতার প্রকৃতি ও অসুস্থতা কতটা প্রকট তা এই অভীক্ষাগুলি থেকে বহুল পরিমাণে নির্ধারণ করা যায়।

প্রতিক্ষেপন অভীক্ষা (Projective tests):

প্রত্যক্ষ পরিচিতি ও প্রশ্নোত্তর অভীক্ষার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে প্রতিফলিত হলেও মনের গভীর প্রকৃতি ও নির্জ্জান মনের দ্বন্দ্ব ও তার গতি প্রকৃতি প্রতিভাত করার জন্য প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এতে অভীক্ষার উদ্দীপকটি কোন নিশ্চিত আকৃতি বা প্রকৃতির মধ্যে থাকে না। উদ্দীপকটি দেখে ব্যক্তি তার মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী বিচার বিশ্লেষণ করে, সাড়া দেয়। প্রদত্ত উদ্দীপক-চিত্র বিশ্লেষণের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যক্তির বাক্তিত্বের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়।

এরূপ অভীক্ষার প্রধান দু'টি অভীক্ষার একটি হ'ল রসাক্ টেষ্ট (Rorschach test), অপরটি থেমাটিক এ্যাপারসেপসন্ টেষ্ট (Thematic Apperception test)।

রসক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন হারমান্ রসাক্, এবং পরে ব্রনো ক্লফার (Bruno klopfer) ও সাম্যুয়েল বেক্ (Samuel Beck) এ পদ্ধতিকে আরও উন্নত করেন। এতে দশটি কার্ড পূর্ব নির্ধারিত ধারায় পর পর দেখানো হয়। প্রত্যেকটি কার্ডে একটা নির্দিষ্ট আকৃতি বিহীন কালির ছোপ থাকে। শেষের তিনটি কার্ডে রং এর ছোপ ও থাকে। ব্যক্তি এ কার্ডগুলো দেখে যে সব সাড়া দেয় ও সাড়া দিতে কতটা সময় লাগে তার বিচার হিসাব রাখা হয়। প্রত্যেকটি সাড়া সম্বন্ধে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, কেন সে এরূপ সাড়া দিল, এরূপ সাড়া দিতে তাকে কি কি অভিজ্ঞতা ও অনুসঙ্গ প্ররোচিত করেছে, কোন্ স্থানটি দেখে কি সাড়া দিল ইত্যাদি বিষয়ে তার কাছ থেকে জানা হয় ও এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এর পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়। রসাক্ অভীক্ষা মূলতঃ এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে, ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। একই উদ্দীপককে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে তার কারণ হ'ল বিভিন্ন ব্যক্তির, মানসিক সংগঠণ এক প্রকারের নয়, সাংগঠনিক ভিন্নতাই বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ (Perçeption) প্রকার নির্ধারণ করে। এই প্রত্যক্ষণ প্রকারের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ধরা পড়ে।

থেমাটিক এ্যাপারসেপসন্ অভীক্ষাও মূলতঃ এই আদর্শের ভিত্তিতেই সৃষ্ট। হেন্‌রি মারে (Henry Murray) এই অভীক্ষাটির উদ্ভাবন ও প্রচলন করেন। এতে কুড়িটি ছবি আছে—দশটি করে এক এক বারে দেওয়া হয়। ছবিগুলি পূর্ব নির্ধারিত ক্রমে পর পর ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এবং তাকে এই ছবি দেখে, ছবির উপর ভিত্তি করে একটি গল্প তৈরী করতে বলা হয়। ছবিগুলি প্রায় অনির্দিষ্ট প্রকৃতির। ক্রমে ছবিগুলি আরও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে আসে। ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি যে গল্পের কথা বলে, সেটি হুবহু লিখে নেওয়া হয়, এবং এই গল্পগুলির সংব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বোঝার প্রয়াস করা হয়।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষা আছে। এর মধ্যে **শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test)** ছবিপূরণ অভীক্ষা উল্লেখযোগ্য। শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ পর পর অভীক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা

হয়। শব্দটি শোনার পর যে শব্দ তার প্রথম মনে আসে সেটি লিখে নেওয়া হয়। একটি শব্দ-শোনার ও অভীক্ষার্থীর উত্তর দানের মধ্যে যে সময় বিরতি সেটি লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন শব্দে এই বিরতিকাল যদি অস্বাভাবিকভাবে বেশী হয়, তাহলে সেই শব্দের সঙ্গে ব্যক্তির কোন বিশেষ সংবন্ধন আছে বা নির্জ্ঞান মনের কোন জটিলতা আছে বলে অনুমান করা হয়। উদ্দীপক শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সাড়াস্বরূপ যে শব্দগুলি উচ্চারণ করে, তার বিচার বিশ্লেষণ করে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রকার ও ব্যক্তির নির্জ্ঞানে যে দ্বন্দ্ব জটিলতা আছে তার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়।

প্রত্যক্ষ পরিচিতি, কেসহিষ্ট্রি, প্রশ্নোত্তর অভীক্ষা ও আরও নৈর্ব্যক্তিকভাবে, আনীত শিশুর মানস সংগঠন জানার জন্য উপরোক্ত মনস্তাত্বিক অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন স্তরে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, মানসিক জটিলতার স্বরূপ কি, অপসঙ্গতিমূলক আচরণের প্রকৃত কারণ কি তা নির্ণয় করা হয়।

কারণ নির্ণয় করার পর উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রের কাজ। উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্বাবধানে শিশুটিকে রেখে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একাদিক্রমে চিকিৎসা করে যাওয়া, গৃহ, বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে শিশুর চিকিৎসা করা, মৌলিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় থাকলে তা দূরীকরণের প্রয়াস শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূক্ত। এরজন্য পিতামাতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আনীত শিশু সম্পর্কে আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে যথাযথ পরিবর্তন আনয়নে সাহায্য করার বিষয়েও শিশুনির্দেশনা কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার উপযুক্ত পাঠবিষয়ে পরিচালনা, প্রয়োজন হলে তার জন্য বিশেষ পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত বৃত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা, এর জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থার সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে কর্মে নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাও শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রের কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত।

অল্পব্যয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লাভের জন্য শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। এদিক থেকেও সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নে শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের তত্বাবধানে একটি আবাসিক শিক্ষায়তন থাকতে

পারে—যেখানে শিশুর একদিকে যথাযথ চিকিৎসা চলবে, অন্যদিকে নিয়মিত খেলাধূলা, যৌথ-কর্মসম্পাদন, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটা সুনিয়ন্ত্রিত যৌথ জীবন যাপনের অভ্যাস গঠিত হবে—সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনার ব্যবস্থাও থাকবে। যে সকল শিশুর বিপথগামিতার জন্য গৃহের অসুস্থ পরিবেশই দায়ী সে সব ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ-সংশোধনী আবাসিক শিক্ষায়তন (Correctional Home for Problem children) বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের এরূপ শিক্ষায়তন পরিচালনা করাও একটি কাজ।

তাছাড়া শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের সাথে একটি গবেষণা শাখাও থাকতে পারে। আনীত শিশুদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্যাদি, নানাপ্রকারের সমস্যামূলক আচরণ প্রভৃতির ভিত্তিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিচ্যুতি ও সমস্যামূলক আচরণের সাথে কার্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে নূতন সত্যের আবরণ উন্মোচিত হতে পারে। এরূপ গবেষণার ভিত্তিতে নূতন সত্যের উদ্ভাবন করাও শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের একটি পরোক্ষ কাজ।

অনুশীলনী

1. What do you mean by 'child guidance'? Describe the minimum requirements for organising a 'child guidance clinic'.

2. Write an essay on Child Guidance Clinic.

3. Describe the nature of the equipments and organisations of clinics for child guidance that you consider suitable for India.

4. What are the functions of a 'child guidance clinic'? Show your acquaiantance with the personnel of a 'child guidance clinic' pointing out the programme of work designated for each.

5. Enumerate the personnel of a 'child guidance clinic' and state the duties of each person.

6. How would you equip a child guidanee clinic? Discuss in this connection the duties and functions of a psychiatrist in such a clinic.

7. Describe fully the type of child guidance clinic you would like to establish for your children.

8. Justify the idea of the necessity of establishing child guidance clinics in India.

9. Elucidate the term 'Guidance' and show how far the meaning of this term can be realized in a child guidance clinic.

ঊনবিংশ অধ্যায়

মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা
(Treatment of maladjustment and mental diseases)

বিপথগামী শিশুই হোক বা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিই হোক এদের চিকিৎসা সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সাধারণ চিকিৎসক এদের চিকিৎসা করতে পারে না। এর জন্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন। এছাড়া দৈহিক রোগ চিকিৎসার যে পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়, মানসিক রোগ চিকিৎসার সে পথ অবলম্বিত হয় না, মানসিক চিকিৎসার বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হয়। দৈহিক রোগে যেরূপ ঔষধ পথ্যাদি ও কখনো কখনো শলাকা চিকিৎসা (Operation) করা হয়, মানসিক চিকিৎসায় ঔষধ পথ্যাদি ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি আছে, যেগুলি মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। ঔষধ পথ্যাদি দিয়ে যে চিকিৎসা তাকে বলা হয় মেডিকো থেরাপী (Medico therapy)। Therapy কথাটির অর্থ চিকিৎসা। মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসায় যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে বলা হয় মানসিক চিকিৎসা (Psycho-therapy)। মানসিক চিকিৎসা বহু প্রকারের হতে পারে।

মানসিক চিকিৎসা বলতে কি বুঝায় ? বৃহত্তর অর্থে দেখলে সাইকোথেরাপি বা মানসিক চিকিৎসা বলতে বুঝায় একজন সুশিক্ষিত ও মানসিক রোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা মনস্তাত্বিক উপায়ে (ঔষধ দ্বারা নয়) মানসিক রোগগ্রস্ত বা অপসঙ্গতি পূর্ণ ব্যক্তির রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করা ও পুনরায় মানসিক সঙ্গতি সাধনে ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা। অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক যন্ত্রণা তার অনুভূতি, চিন্তা, আচরণ, ঘনিষ্ট জনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক সবকিছুকে বিকৃত করে ফেলে। সকল প্রকার মনশ্চিকিৎসাই ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা শক্তি ও অনুভূতি ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করে যা দ্বারা সে তার ভয়, দুশ্চিন্তা, দ্বন্দ্বজর্জরতা থেকে মুক্ত হয়ে নূতন শক্তি ও উদ্যমে নূতন বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সার্থকভাবে তার জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এই চিকিৎসাপদ্ধতির মূল ভিত্তি হ'ল চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার্থীদের মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি পূর্ণ সম্পর্ক বা কখনো কখনো কোন বিশেষ যৌথ কার্যসম্পাদন।

থেরাপি একটি প্রক্রিয়াবিশেষ, যে প্রক্রিয়াতে চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থী ানভাবে অংশ গ্রহণ করে। মানসিক চিকিৎসায় চিকিৎসার্থী যদি যথাযথরূপে ক্রিয় ও উৎসাহী না হয় তাহ'লে মানসিক চিকিৎসার কোন ফলই পাওয়া যায় । অতএব, মানসিক চিকিৎসাকে একটি প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে যে ক্রিয়াতে মূলত চিকিৎসক রোগীকে পরিদর্শন করেন, তাকে বোঝার চেষ্টা রেন ও প্রয়োজনমত সাহায্য করার প্রয়াস করেন। ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে ওয়ার চেষ্টা কোন ক্রমেই করা হয় না।

চিকিৎসক যখনই চিকিৎসার্থীর সাথে বন্ধুভাবে যন্ত্রণা উদ্রেককারী রোগ স্থার কারণ নির্ণয়ে ও রোগীর কাছে সে কারণ উপস্থাপনে সাহায্য করে এবং াগীর মনে প্রফুল্লতা, কাঙ্ক্ষিত আত্ম-বিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে াহায্য করে তখনই মানসিক চিকিৎসার কাজ আরম্ভ হয়েছে বুঝতে হবে। অধুনা নসিক চিকিৎসাকে, সম্পর্ক ভিত্তিক চিকিৎসাও (Relationship Therapy) লা হয়ে থাকে। সকল প্রকার মানসিক চিকিৎসার মধ্যেই চিকিৎসক ও কিৎসার্থীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই সম্পর্ক বিভিন্ন প্রকারের হতে ারে। কোনটায় চিকিৎসক অনেকটা কর্তৃত্বের মনোভাব নিয়ে থাকেন। তে শিশুকে প্রায় নির্দেশ দেওয়া হয়, কখনো কখনো এতে চিকিৎসক শিশুকে ঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক পরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এসব ক্ষেত্রে শিশুর াচরণ সামান্ত বিকৃত। সে কি ভাবে চলবে, তার দিন লিপি নির্ধারণ করে ওয়া হয়।

আর এক প্রকারের সম্পর্ক আছে, যাতে চিকিৎসক রোগীর সঙ্গে যথার্থ এমন কটা বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন যাতে করে চিকিৎসক রোগীর অস্বস্তির রণ। কবে, কি ভাবে এ সকল অস্বস্তির উদ্ভব হ'ল, নির্জ্ঞান মনে যে গূঢ়েষা omplex) রয়েছে তার স্বরূপ রোগীর চেতন মনে উদ্‌ঘাটন, রোগীর কিৎসকের কাছে বাধাবন্ধহীনভাবে আত্ম কথনের মধ্য দিয়ে যে সকল ভিজ্ঞতার সাথে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, পুঞ্জীভূত থাকে তা বাষ্পীভূত (Abreaction) ে পারে। এরূপ আত্ম-কথনের মধ্য দিয়ে রোগীর মন অনেক হাল্কা হয়ে যায়, যেন প্রাণ খুলে বলে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এতদিন যেন রোগী তার মনের খুলে বলতে পারে এমন লোক খুঁজে পাচ্ছিল না।

শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসা শিশুর উদ্দীপনায় আরম্ভ হয় না, শিশুর পিতা-াই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে থাকেন। শিশু নিজে তার অপসঙ্গতি ও

অস্বস্তির স্বরূপ ও কারণ বুঝতে পারে না। পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিগণই শিশুর মানসিক অস্বস্তি ও অপসঙ্গতি ধরতে পারেন এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। মনশ্চিকিৎসকের সঙ্গে শিশুর বিকৃত আচরণ বিষয়ে পরামর্শ পিতামাতাই প্রথম আরম্ভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা কিছুটা স্বতন্ত্র—এরা অনেক ক্ষেত্রে (Psychoneurosis), বিশেষ করে মৃদু মানসিক বিকৃতিতে নিজেরাই তৎপর হয়ে মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে থাকে। এদের সাথে মনশ্চিকিৎসকের প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে ওঠে। ফলে মনের কথা খুলে বলতে মনের বাধা (Resistance) শীঘ্র দূর হয়। এই মনের কথা বলতে বলতে ব্যক্তি এলোমেলো অনেক কথা বলে যার কোন অর্থ আছে বলে মনে হয় না। এই আপাত এলোমেলো কথনের মর্মমূলে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা থাকে, দ্বন্দ্ব গূঢ়ৈষা কাজ করে। আপাত এলোমেলো কথনের সূত্র ধরে চিকিৎসক রোগীর নির্জ্ঞান মনের গতি প্রকৃতির পরিচয় পান ও নির্জ্ঞানে যে জট রয়েছে, যা অগোচরে ব্যক্তির চিন্তা ও আচরণকে বিকৃত করছে, তাকে ব্যক্তির চেতন মনে উদ্ঘাটিত করে দেন। এরূপ উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজের বিকৃতির কারণ খুঁজে পায়। নিজের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গীকে নূতন পুঞ্জীভূত আবেগ নিষ্কাষিত পরিচ্ছন্ন বাস্তবমুখী বিচার বুদ্ধি দিয়ে পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে। ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছন্দ বোধ ও কর্মক্ষমতা ফিরে পায়।

এরূপ চিকিৎসা পদ্ধতিতে (মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি) চিকিৎসার্থী ও মনঃসমীক্ষকের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন, চিকিৎসার্থীর যেরূপ আপন উদ্যম ও নিজের অস্বাভাবিকতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চেতনা থাকা প্রয়োজন, বদ্ধপাগল (Psychotics) ও শিশুদের ক্ষেত্রে এরূপটি দেখা যায় না। ফলে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি উদ্বায়ু রোগীদের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য।

শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি কতটা কার্যকরী এ সম্বন্ধে ভাববার আছে। এটা একটা সমস্যা। মনঃসমীক্ষা শিশুদের মানসিক অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে কতটা সাহায্য করতে পারে, এ বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। শিশুরা মনঃসমীক্ষণে অগ্রণী হতে পারে না। তাদের পিতামাতাদের এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হয়। এছাড়া, শিশুদের জন্য মনঃসমীক্ষণের ভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। মেলানি ক্লেইন (Melanie Klein) শিশুদের জন্য ক্রীড়া ভিত্তিক চিকিৎসা মুক্ত অনুসঙ্গ (Free Association) পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক

কার্যকরী বলে অভিহিত করেছেন। শিশু-মন-সমীক্ষণে ক্রীড়া ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ। একটি শিশু যখন চিকিৎসক উদ্ভাবিত যে বিশেষ ধরণের খেলনা নিয়ে খেলা করে তার একটা বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য আছে। শিশুমনের নির্জ্ঞান বাসনা ও দ্বন্দ্ব এ খেলনার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হতে পারে। এ্যানা ফ্রয়েড অবশ্য খেলনা প্রতীকী তাৎপর্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে শিশুর ক্ষেত্রেও মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মনঃসমীক্ষককে অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে শিশুর সাথে একটা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শিশু যেন চিকিৎসককে নিজের পিতার মত করে গ্রহণ করতে পারে—আবেগ মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। শিশুদের মনঃসমীক্ষণে শিশুর স্বপ্ন বিশ্লেষণে বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়া সমীচীন। এ সব সত্বেও শিশুর মনঃসমীক্ষণ বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার উর্ধ্বে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের যে সব প্রতীকী (Symbols) তাৎপর্য ব্যবহার করা হয়, শিশুদের স্বপ্ন বিশ্লেষণে অনেক সময় সে সব প্রতীকী বৈশিষ্টকে গ্রহণ করা যায় না।

এই সব কারণে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক রোগে, অপসঙ্গতির তীক্ষ্ণতা ও গুরুত্ব অনুসারে বয়স অনুসারে, মানসিক চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক চিকিৎসা নানা প্রকার হতে পারে। নিম্নে মানসিক চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা (**Play Therapy**) :

শিশুদের মানসিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা একটি অত্যন্ত বিশেষায়িত শিশু-চিকিৎসা পদ্ধতি। ফ্রয়েড (Freud) ও ইয়ুং (Jung) এর নির্জ্ঞান মন ও মানসিক অসুস্থতার কার্য-কারণ সম্বন্ধে সত্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই ম্যালানি ক্লেইন (Melanie Klein) এ্যানা ফ্রয়েড (Auna Freud), সুজান আইজাক্ (Susan Isacs), মারগারেল লোয়েন-ফেল্ড (Margarel Lowenfeld) ও অন্যান্য মনশ্চিকিৎসকগণ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা প্রয়োগ করেন। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত ইচ্ছা-দ্বন্দ্ব-জর্জর আবেগ মুক্তির একটা পথ পায়।

মানসিক রোগগ্রস্ত শিশুর খেলার প্রকৃতি সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশুর খেলার প্রকৃতি থেকে নানা দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়। খেলায় অংশ গ্রহণ, খেলার সময় আচার আচরণ, ও খেলার সময় প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন সুস্থ ও অসুস্থ

শিশুর মধ্যে ভিন্নতর হয়। খেলায় অংশ গ্রহণের নমুনা, কী প্রকারের খেল
অংশ গ্রহণ করছে, তাতে শিশুর আচরণ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শিশুর মানসি
বিকৃতির প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণতা অনুধাবন করা যায়।

খেলা দু দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়—শিশু কী ধরণের খেল
সামগ্রী পছন্দ করে, ভিন্ন ভিন্ন খেলার সরঞ্জাম থেকে কোন্ ধরণের খেল
সরঞ্জাম শিশু বেছে নেয় এবং সে কী ধরণের খেলা অধিক পছন্দ করে,
প্রকৃতি কিরূপ। খেলায় অংশ গ্রহণকালে শিশুর যে অভিব্যক্তি ও আ
আচরণ প্রকাশ পায়, তা বিশ্লেষণ করে শিশুর ব্যক্তিত্ব বীক্ষণ হতে পা
ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি যদি কিছু থাকে তা হ'লে তা উদ্ঘাটিত হতে পারে। অ
চিন্তন অত্যধিক প্রকাশোন্মুখ অথচ অবরুদ্ধ ক্রোধ, হীনমন্যতা বা অতিমা
অপরাধবোধ জনিত কোন ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি ও অপসঙ্গতি মূলক আচরণ
প্রকটিত হয়, তাহলে শিশুর ক্রীড়া-ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে তা ধরা প
মোটের উপর, শিশুর মানসিক বিকাশ সুস্থ কি অসুস্থ ধারায় হচ্ছে তা
সূত্রভিত্তিক বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্রীড়ায় শিশুর অংশগ্রহণের গতিপ্র
বিশ্লেষণ করে ধরা যায়।

এটা অবশ্য ঠিক যে, কতকগুলি খেলার সামগ্রী, যেমন জল, কাদা,
রং ও তুলি বিষয়ে মানসিক দিক থেকে সুস্থ ও অসুস্থ শিশু নির্বিশেষে সমান
আগ্রহী। কিন্তু বিশেষ বিশেষ খেলার উপকরণ বিষয়ে সুস্থ ও অসুস্থ শিশুর
গ্রহণ বর্জনে তারতম্য দেখা যায়। সুস্থ শিশুরা যে খেলার উপকরণ পছন্দ
অসুস্থরা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তা বর্জন করে। আবার অ
যা গ্রহণ করে, সুস্থ শিশুরা তা বর্জন করে; এরূপ গ্রহণ বর্জন
শিশুর মানসিকতার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। খেলার পটভূমিতে রেখে
মধ্যে মানসিক অপসঙ্গতি যে শুধু ধরা পড়ে তা নয়, কি প্রকারের অপ
তার মধ্যে দেখা দিয়েছে, কোন্ মানসিক অসুস্থতায় সে ভুগছে তাও
হ'তে পারে।

অসুস্থ শিশুর খেলায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিবিম্বিত হয় তা মোটামু
নিম্নরূপ :—

(ক) বাধো-বাধো ভাব অর্থাৎ শিশু স্ব
সাবলীলভাবে যেন খেলায় অংশ
পারে না।

(খ) খেলার জিনিস পত্র ভেঙ্গে ফেলার প্রবণতা।

(গ) খেলতে গিয়ে অত্যন্ত এলোমেলো ও অস্থির ভাব প্রকাশ পাওয়া।

(ঘ) প্রত্যাবৃত্তি—খেলতে গিয়ে কেবল নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।

(ঙ) খেলতে খেলতে একটি বিশেষ আচরণের পুনরাবৃত্তি করা।

(চ) অতিমাত্রায় খেলার ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করা ; খেলতে গিয়ে খুব ছট্‌ফট্ করা, হৈ চৈ করা।

(ক) দুশ্চিন্তাপরায়ণ শিশুদের মধ্যেই খেলার বিষয়ে একটা বাধো-বাধো ভাব বেশী করে দেখা যায়—স্বচ্ছন্দভাবে এরা খেলতে পারে না। একপা এগুলে তিনপা পিছিয়ে আসতে চায়। খেলার সাজসরঞ্জামে ভরা ঘরে শিশুকে পৌঁছে দিলেও সে জড়সড় হয়ে খেলার জিনিসগুলো ছুঁতে চায় না। কোনক্রমে যদি তা ধরিয়ে দেওয়া হয় তা হলেও তা দিয়ে খেলতে চায় না, খেলার জিনিসগুলোকে কোন কাজেই লাগাতে পারে না।

(খ) উদ্বায়ুগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এরা অত্যন্ত দ্বন্দ্বজর্জর থাকে, বিপরীতমুখী ইচ্ছার টানাপোড়েনে একেবারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে—খেলার জিনিসপত্র নিয়ে খেলার ধৈর্য আর তাদের থাকে না—তারা খেলার উপকরণকে ভাঙ্গতে আরম্ভ করে।

(গ) কোন কোন অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশু খেলতে গিয়ে এমন আচার আচরণ করে যেন সে তার বয়সের তুলনায় অনেক ছোট—ছোট স্বল্প বয়েসী হয়ে থাকার একটা চেষ্টা সে সব সময় করতে থাকে। হয় ত এরকম দেখা যাবে যে ছয় সাত বৎসরের একটি শিশু খেলার জিনিসগুলি বাক্সে একবার ভরছে, আবার বের করছে, কিংবা বালু মাটি নিয়ে কেবল তালগোল পাকাচ্ছে—এ রকম আচরণ সাধারণতঃ তিন চার বৎসরের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়।

(ঘ) প্রত্যাবর্তমূলক খেলায় শিশুর অপসঙ্গতি প্রকাশ পায় নানা ভাবে—খেলার উপকরণ নির্বাচন ও তাকে নিয়ে নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়েই যে এর প্রকাশ পায় তা নয়, খেলার বিশেষ প্রকারও শিশুর অপসঙ্গতি সূচিত করে। এ ধরণের

খেলায় শিশু কল্পনায় অন্যের ভূমিকা অবলম্বন করে, ঐ রকম আচরণ করতে থাকে। কখনও সে মা'র ভূমিকায়, কখনও বা শিক্ষকের ভূমিকায়, কখনও বা ছোট্ট শিশুটির ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে সেই রকম হাবভাব চলাফেরা করতে থাকে—তার দ্বন্দ্বজর্জর মুহূর্তে সে এমনি করে আবার তার আস্তিত্বকে ফিরিয়ে নিয়ে তার খেলার মধ্য দিয়ে তার দ্বন্দ্বটিকে পরিস্ফুট করে তোলে, দ্বন্দ্বের স্বরূপটি এতে প্রকটিত হয়ে পড়ে।

(ঙ) কখনও কখনও অসুস্থ শিশুদের খেলায় অংশগ্রহণে একটা অত্যন্ত জড়তা দেখা যায়—তাদের ক্রীড়াচরণ অত্যন্ত স্থবিরের মত হতে দেখা যায় এবং বহুবিধ খেলার সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও একই খেলার সামগ্রী নিয়ে একই ভাবে ক্রীড়া-কৌশলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এরা কোন খেলা আরম্ভ করে শেষ না করেই, আবার অন্য একটি খেলা আরম্ভ করতে চায়—সব সময়তেই এদের মধ্যে একটা অস্থিরচিত্ততা দেখা যায়। কোন খেলাই শেষ পর্যন্ত এরা যেতে পারে না—একটা চিন্তার দ্বারা তাড়িত হয়ে, মাঝপথে আবার অন্য একটি চিন্তা এসে তাড়া করতে থাকে। এদের খেলতে গিয়ে উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন তারা আর কোন রাশ টেনে রাখতে পারে না।

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত এ সকল খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য যেমন একদিকে কিছু কিছু প্রতিভাত হয়, অন্যদিকে শিশু যে দ্বন্দ্বের জন্য অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করছে, সে দ্বন্দ্বের স্বরূপও উদ্ঘাটিত হয়।

শৈশবকালীন ব্যক্তিত্ব-বৈকল্য ও অপসঙ্গতিমূলক আচরণ পরবর্তী বয়ঃপ্রাপ্তিকালের মানসিক রোগেরই পূর্বাবস্থা। শৈশবকালীন এ বৈকল্যের কারণ নির্জ্জান মনের দ্বন্দ্বের জন্য প্রায়শঃই হয়ে থাকে। মনশ্চিকিৎসামূলক ক্রীড়ার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল এ সকল দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা, শিশুকে তার দ্বন্দ্বের ও তজ্জনিত বিকৃত আচরণের কারণ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে অবহিত করে তোলা। এদিক থেকে মনশ্চিকিৎসামূলক ক্রীড়ার সাথে মুক্ত অনুসঙ্গ পদ্ধতিতে বা অন্যবিধ কথোপকথন পদ্ধতিতে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে মিল আছে।

শিশু-চিকিৎসায় ক্রীড়া পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় কেন? শিশু চিকিৎসায় খেলার তাৎপর্যই বা কি?

শিশু স্বপ্নচারী—স্বপ্নিল কত আশা আকাঙ্ক্ষার জালই না সে বুনে চলে

এ স্বপ্নকে সে আপন মনে বাস্তবে রূপ দিতে চায়—জীবন্ত রূপায়নে সে অধীর ভাবে কত প্রয়াসই না করে। শিশুর এটা একটা বৈশিষ্ট্য। আপন মনে শিশু নিজেকে নানা সাজে সাজায়, নানাভাবে ভাবায়; স্বকল্পিত ভূমিকায় এক এক সময় এক এক রূপে অবতরণ করে; এমনি করে শিশুর আবেগ মুক্তি ঘটে, আবেগের স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটে। কখনও বা কথা বলে, কখনও বা খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার কল্পনার জগতকে বাস্তবায়িত করে তুলতে চায়। শিশুর এই স্বাভাবিক ক্ষমতা, খেলায় অকৃত্রিম আগ্রহকে মনশ্চিকিৎসক তার চিকিৎসা-কাজে লাগান। তিনি জানেন যে, শিশু তার খেলায় খেলার সরঞ্জাম চয়ন ও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং স্বপ্নচারিতার মধ্য দিয়ে শিশুর যে মানসিকতার প্রকাশ ঘটে তাকে ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে এবং এ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি যথার্থরূপে আয়ত্ত করতে পারলে শিশুদের মানসিক বৈশিষ্ট্য-চিকিৎসা অনেক সুগম ও ফলপ্রসূ হয়। বিভিন্ন প্রকার খেলার সরঞ্জাম, খেলায় শিশুর স্বপ্ন রূপায়ন এবং নাটককেন্দ্রিক খেলায় মনস্তাত্বিক উপাদান আছে। শিশুর খেলায় অংশগ্রহণ ও তার মধ্য দিয়ে তার যে মানসিকতা প্রতিভাত হয়, তার যথাযথ বিশ্লেষণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই ক্রীড়াভিত্তিক শিশু-মনশ্চিকিৎসার উদ্ভব হয়েছে। শিশুর খেলার বিশ্লেষণের সাথে সাথে, তার স্বপ্ন-বিশ্লেষণও করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় শিশু তার স্বপ্নের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না, স্বপ্নের কথা তার সর্বদা মনেও থাকে না। কিন্তু স্বপ্নের বিষয় বস্তুকে সে তার কাঁচা হাতে এঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তূলির টানে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চায়, কিংবা অভিনয় করে স্বপ্নের রূপটা ব্যক্ত করতে চায়।

খেলার মাধ্যমে বিরেচন (Catharsis):

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত ক্রোধ, ঘৃণা, ও আক্রমণাত্মক বাসনা মুক্তিলাভ করে, পুঞ্জীত আবেগ প্রশমনের মধ্য দিয়ে শিশু তার আবেগ-ভারসাম্য অনেকটা ফিরে পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর খেলাকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করে তার মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয় করে, তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। প্রয়োজন হলে দ্বন্দ্বের মূল কারণ যদি অসুস্থ পরিবেশ হয়, তা হলে পরিবেশ শোধন বা পরিবেশান্তরও করা হয়ে থাকে।

খেলার প্রকার:

শিশুর বিকাশ-পর্যায় অনুযায়ী—খেলা চার প্রকারের হতে পারে (ক) অঙ্গ-

সঞ্চালন মূলক খেলা, (খ) কথন মূলক খেলা (গ) অনুকরণ মূলক খেলা (ঘ) স্বপ্নচারিতা মূলক খেলা। বিভিন্ন খেলা বিভিন্ন প্রকারের বলে অভিহিত করা হলেও বস্তুতঃ একের সাথে অপরে কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট। অঙ্গ সঞ্চালন মূলক খেলার সাথে শিশুর কথন ক্রিয়া চলতে থাকে। অনুকরণ মূলক খেলার সাথে স্বপ্নচারিতা জড়িয়ে থাকে। অতি শৈশবকালে অঙ্গসঞ্চালন মূলক খেলাই বেশী প্রাধান্য পায়। স্বপ্নচারী খেলা-সবচেয়ে পরে শিশুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সুস্থ শিশুর ভিন্ন পর্যায়ের খেলাগুলি ঠিক ভাবে সমাধা হয়। সে সকল প্রকার খেলা খেলে, সুস্থ আবেগ-জীবনের অধিকারী হয়। কিন্তু যে সব শিশু স্বাভাবিক ভাবে খেলার কোন সুযোগ পায় না, তাদের আবেগ-জীবন তথা ব্যক্তিত্ব অসুস্থ হয়ে পড়ে। একটি পর্যায়ের খেলা যদি সুষ্ঠুভাবে শিশু সম্পাদন করতে না পারে, তা হলে পরবর্ত্তী পর্যায়ের খেলা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। একটি স্বাভাবিক সংযোগ সূত্র যেন শিশুর খেলায় দেখা যায় না। এই সংযোগ-সূত্র শিশুর কোন পর্যায়ের খেলায় অনুপস্থিত পরিলক্ষিত হলেই বুঝতে হবে শিশুর খেলায় অব্যবহিত পূর্ব বিকাশ পর্বে কোন অসুবিধার উদ্রেক হয়েছিল। কোন পর্যায়ের শিশুর খেলায় শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিলেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণকে সূচিত করবে। উদ্বায়ুগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে প্রায়শঃই দেখা যায় যে তারা যে বয়সের যে খেলা তা না খেলে, যে কোন বয়সে যেকোন খেলা এলোমেলোভাবে খেলতে আরম্ভ করে—তাদের খেলার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গতি থাকে না। সব সময়ই যেন একটা কিছু নেই মনে হতে থাকে। মনশ্চিকিৎসক অসুস্থ শিশুর বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে তার খেলা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেন কোন্ পর্যায়ের বিকাশ পর্বে শিশুর জটিলতা রয়েছে। এই পর্যায়ের খেলাগুলি স্বচ্ছন্দভাবে শিশুকে খেলতে দিয়ে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টাও মনশ্চিকিৎসক করে থাকেন।

ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসায় মনশ্চিকিৎসক প্রথমেই শিশুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে সচেষ্ট হন। প্রত্যক্ষ পরিচিতিতে শিশুর পরিবেশ, তার বংশগতি, দৈহিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। শিশুর কোন প্রকার দৈহিক অসুস্থতা আছে কি না এবং তার জন্য সে তার স্বাভাবিক খেলাধূলায় ছেদ পড়েছে কি না, পিতামাতা অভিভাবক ও স্থানীয় ব্যক্তিদের ক্রমাগত বাধায় শিশুর স্বাভাবিক ক্রীড়া চঞ্চলতা ব্যাহত হয়েছে কি না, সে সব বিষয়েও অনুসন্ধান করতে হয়।

এর পর শিশুকে বিভিন্ন খেলার উপকরণ দিয়ে দেখতে হবে সে কী ধরণের খেলা পছন্দ করে, তার বয়স অনুযায়ী তার খেলা গ্রহণ করে কি না, তার খেলা স্বচ্ছন্দ ও সুশৃঙ্খল কি না, তার খেলায় স্বাভাবিক বয়ঃক্রমিক যোগসূত্র আছে কি না এ সব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে শিশুর মানসিক অসুস্থতার কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে।

এর পর শিশুকে তার উপযোগী খেলায় উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করে একদিকে তার পুঞ্জীত অবদমিত আবেগ মুক্তির পথ করে দিতে হবে, অন্যদিকে খেলায় তার আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করে মানসিক দ্বন্দ্বের কারণটি ধীরে ধীরে শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। এমনি করে শিশু একদিকে সুস্থ আবেগ জীবনে ফিরে যাবে, অন্যদিকে দ্বন্দ্বের কারণটি উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে, মনশ্চিকিৎসক পরিবেশ শোধন বা পরিবেশান্তর করে শিশুকে সুস্থ করে তুলতে পারেন। ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসায় যেমন মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে (Diagnosis) অন্যদিকে অবদমিত ক্রোধ বাসনা ও পুঞ্জীত আবেগ মুক্তির পথ করা যেতে পারে (Catharsis)। শিশুদের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রোগ-কারণ নির্ণয় প্রায়শঃই অসম্ভব, সেই জন্যই দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয়ে খেলার মাধ্যম অবলম্বন করা হয়। প্রতিযোজন অক্ষম শিশুকে খেলার সুযোগ দিয়ে মনশ্চিকিৎসক তার খেলার প্রকৃতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে শিশুর গহন মনের দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন ও সেই ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

সহৃদয় উপদেশদান (Persuasion) :

বিপথগামী শিশুদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সহানুভূতি ভালবাসা দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে সহৃদয় উপদেশ দান (Persuasion) বলে। মনশ্চিকিৎসার এটাও একটা উপায়। বিপথগামী শিশুর বিকৃত আচরণের সাথে যে কোন শোভন সামাজিক ও যুক্তিগত ভিত্তি নেই এই জিনিসটাই শিশুকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। পারিবারিক অশিক্ষা ও কুশিক্ষা থেকেই যে শিশুর মধ্যে বিকৃত আচরণের উদ্ভব হয়েছে, সে সব আচরণের কারণ যে শিশু নিজে নয়, সে যে ভুল পথে চলতে শিখেছে, এ বিষয়ে শিশুকে সহৃদয়তার সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। শিশুকে তার ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে পুরাতন বিকৃত অভ্যাস ত্যাগ করে নূতন সদভ্যাস তৈরী করতে প্রবুদ্ধ করা হয়। বিপথগামী শিশুর বর্তমান আচরণ তার জীবনে পরিণামে যে কত বিপদ ও

অসাফল্য নিয়ে আসবে, সেটা শিশুকে মনশ্চিকিৎসক বুঝিয়ে বলবেন। এইভাবে চিকিৎসার প্রথম কথা হ'ল চিকিৎসকের সহানুভূতি ও ভালবাসা, চিকিৎসকের উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী।

এ উপায়ে সামান্য বিপথগামী শিশুদের চিকিৎসা করা হয়। যাদের মানসিক বিকৃতি অত্যন্ত জটিল ও পুরাতন তাদের ক্ষেত্রে এ উপায়ে চিকিৎসা সম্ভব নয়। তবে মনশ্চিকিৎসকের প্রথম সোপান হিসাবে সহৃদয় উপদেশদান চলতে পারে।

অভিভাবন (Suggestion) ঃ

মনশ্চিকিৎসায় অভিভাবন একটি বহুল প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রক্রিয়া মানসিক চিকিৎসার সকল পদ্ধতিতেই অল্পবিস্তর বর্তমান। চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন (Rapport) এ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি। চিকিৎসার্থী এ সব ক্ষেত্রে (Mild disorders) স্বভাবতঃই রোগ নিরাময়ে উন্মুখ থাকে—চিকিৎসকের কাছে গেলে সে ভাল হবে এরকম একটা বিশ্বাস তার মধ্যে কাজ করে। চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীলতার একটি ভাব নিয়েই সে আসে। চিকিৎসক তার ব্যক্তিত্বের গুণপনায় চিকিৎসার্থীকে আপনার করে নেওয়ার চেষ্টা করে—চিকিৎসার্থীর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসক তার মনের কাছে কিছু আবেদন রাখেন, কিছু ধারণা তার মনের কাছে তুলে ধরেন, তার রোগের কারণটি তাকে বুঝিয়ে বলা হয়। বিকৃত চিন্তা ও আচরণ রীতি পরিবর্তিত করে নূতন চিন্তা ও আচরণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চলে।

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতেও অভিভাবনের প্রয়োগ-কৌশল কিছু পরিমাণে বর্তমান। অভিভাবন পদ্ধতিতেও চিকিৎসার্থীকে শরীর মন এলিয়ে দিয়ে একটা নিদ্রাচ্ছন্ন ভাবে মনকে নিয়ে যেতে বলা হয়। কখনও কখনও কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে মনকে একত্র করতে বলা হয়।

মনশ্চিকিৎসামূলক অভিভাবনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল (ক) অসুস্থ ব্যক্তিকে নূতন স্বাস্থ্যকর চিন্তায় উদ্বোধিত করা এবং তার মধ্যে যে দুর্বল হীন ধারণা তা দূর করে তার মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা; নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে সুস্থ-বোধ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

(খ) যে ভয় ও দুশ্চিন্তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তা থেকে চিকিৎসার্থীকে মুক্তি-দানের চেষ্টা করা হয়।

মৃদু মানসিক অসুস্থতা, পারিবেশিক চাপে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য-হীনতা, অধিক মদ্যপান জনিত ব্যক্তিত্বের অসুস্থতা, সাধারণ উদ্বায়ুরোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভিভাবন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সমবায় মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতি (Group Therapy) ঃ

অনেক রোগীকে এক সঙ্গে দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে একজন রোগীকেই এককভাবে চিকিৎসা করতে হয়। কিন্তু মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এককভাবে যেমন চিকিৎসা করা যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক মানসিক রোগীকে, অনেক বিপথগামী শিশুকে একসঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসা করা যায়। ইহা আধুনিক মনশ্চিকিৎসার একটি নবতম চিকিৎসা পদ্ধতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই সমবায় মনশ্চিকিৎসা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়।

সবক্ষেত্রে এই সমবায় মানসিক চিকিৎসা সম্ভব নয়—এর উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক মনশ্চিকিৎসক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। জ্যাকসন (Jackson) ও টডে্র (Todd) মতে, যে সকল মানসিক রোগ জটিল ও নির্জ্ঞান মনের গভীরে যে সকল রোগের কারণ নিহিত, সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির একক চিকিৎসা অপরিহার্য। যে সকল মানসিক রোগের কারণ মূলতঃ অব্যবহিত অসুস্থ পরিবেশ, সে সব ক্ষেত্রেই সমবায় মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতি ফলপ্রসু হতে পারে।

যে সকল শিশু মূলতঃ সামাজিক প্রতিযোজনে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন, তাদের ক্ষেত্রে একক মনশ্চিকিৎসা অপেক্ষা সমবায় মনশ্চিকিৎসা অধিক কার্যকরী হতে পারে।

সমবায় চিকিৎসাতে একসঙ্গে বহুজনের চিকিৎসা চলে। সমবায় মনশ্চিকিৎসার মূল ভিত্তি হ'ল এই যে, ব্যক্তি জীবন সদাই গোষ্ঠীজীবন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। যে ব্যক্তি যে গোষ্ঠীতে থাকে সে ব্যক্তির চিন্তায় কর্মে ও সার্বিক ব্যক্তিত্বে সে গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি ছাপ পড়ে। তাছাড়া, ব্যক্তি যে গোষ্ঠীতে আছে, সে গোষ্ঠী থেকে যদি সে প্রত্যাখ্যাত বোধ করে, তা হলে সে যেমন মানসিক দিক থেকে আহত ও হতাশ হয়, ঠিক তার বিপরীত ভাবে কোন ব্যক্তি যদি গোষ্ঠীর মধ্যে সাগ্রহে গৃহীত হয়, উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায় তা হলে মানসিক দিক থেকে সে নিজেকে প্রতুল মনে করে। তার আত্ম-বিশ্বাস, অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এ গোষ্ঠী জীবন বলতে আমরা, পরিবার, বিদ্যালয়, বৃহত্তরভাবে সমাজ জীবনের কথা বুঝি। প্রত্যেক ব্যক্তিই

সমাজ-বদ্ধ। সমাজের কাছে সে সাদরে গৃহীত, এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কত না প্রয়াস। পরিবারের ও সমাজের আশা-আকাজ্ঞা, নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্ত রেখে চলে পরিবারে ও সমাজে নিজের অস্তিত্বের যথার্থ্য সপ্রমাণে সকলেই সচেষ্ট। মানুষের এই মৌল আকাজ্ঞার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহাতীত হয়েই এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে সমবায় মনশ্চিকিৎসার উদ্ভাবন ঘটেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী হবে, ভাব বিনিময় পরস্পর পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা ও সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে অন্তরঙ্গ হবে, একে অপরের প্রতি সশ্রদ্ধ ও সহনশীল হবে এমনি একটা পরিবেশ সমবায় মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে রচনা করার আন্তরিক প্রয়াস করা হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল, এ রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলে মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-শ্রদ্ধা আত্ম-বিশ্বাস ফিরে আসতে পারে, হীনমন্যতা বোধ দীর্ণ হতে পারে, নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা আত্মসমীক্ষণ প্রসূত স্বচ্ছ আত্ম-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সুস্থ গোষ্ঠী জীবনযাপনের ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পেতে পারে।

সমবায় মনশ্চিকিৎসার প্রকার ঃ

গ্রুপ থেরাপী চিকিৎসার্থীর প্রকার ভেদে ও চিকিৎসার প্রকার ভেদে নানা প্রকারের হতে পারে। যৌথ ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত সুপরিকল্পিত সংহত হতে পারে (Directive Group Therapy)। আবার কর্ম-সোপানে স্থিতিস্থাপকতা থাকতে পারে, চিকিৎসা পদ্ধতিতে কেবল জিজ্ঞাসাবাদ, কথোপকথন, ও পরস্পরে মোটামুটি স্বাধীনভাবে মেলামেশার প্রচলন থাকতে পারে (Free interaction or Inerviewed group therapy)। মানসিক চিকিৎসাগার, শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র (বিদ্যালয়ের সাথে সংলগ্ন) প্রভৃতি স্থানে সমবায়িক মনশ্চিকিৎসা চলতে পারে। চিকিৎসার্থীরা একেবারে নূতন ও পরস্পরের অপরিচিত হতে পারে, আবার কোন চিকিৎসার্থীকে তার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে রেখে চিকিৎসাগারের একই ওয়ার্ডের মানসিক রোগীদের নিয়ে একসঙ্গে সমবায়িক মনশ্চিকিৎসা করা হতে পারে।

পারিবারিক পরিবেশে চিকিৎসা (Family Therapy) পরিবারের সকলকে নিয়ে পরিবারস্থিত কোন অসুস্থ ব্যক্তির যে মানসিক চিকিৎসা তা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও পারিবারিক সহজ পরিবেশে হয়ে থাকে। পারিবারিক সম্পর্কের অসুস্থতা জনিত যে মানসিক বৈকল্য দেখা যায়, তার নিরাময় পারিবারিক

যৌথ চিকিৎসার মধ্য দিয়ে হতে পারে। অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রথমদিকে তার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে মুখোমুখি করলে, হয়ত দেখা যাবে তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে, যার সম্বন্ধে তার অনীহা তাকে সে বরদাস্ত করতে পারছে না, কিংবা এমনও দেখা যেতে পারে যে সে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে কোন কথাই বলছে না। মোটের উপর পারিবারিক যৌথ চিকিৎসায় পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে জটের উদ্ভব হয়েছে তাকে, পরিবারের সকলকে পরস্পরের সম্পর্ক নূতন ভাবে গড়তে ও বুঝতে সাহায্য করে। দূর করতে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান কি ভাবে হওয়া সমীচীন, সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক রচনায় পরিবারের কোথায় কোথায় প্রতিবন্ধ রয়েছে তার উদ্ঘাটন করে তা কি ভাবে দূর করা যায় তার বাস্তব শিক্ষাদানও পারিবারিক যৌথ চিকিৎসার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু এ উদ্দেশ্য রূপায়ন খুব সহজসাধ্য নয়। অনেক পরিবার আছে যেখানে পরস্পর কথোপকথণ পর্যন্ত বন্ধ। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পরিবারে একের সাথে অপরের মানসিক কোন সান্নিধ্য নেই। এক পরিবারের একজন অপরজন থেকে যেন বিচ্ছিন্ন—বিচ্ছিন্নতা যেন পরিবারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে (Alienation)। আবার এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে, পরিবারের সকলের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু নিয়ত এরা যা হোক তা হোক নিয়ে মারামারি করে। একে অপরকে সর্বদা সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে—দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এমনি সব পরিবারে যৌথ চিকিৎসা খুব সহজ নয়। চিকিৎসক প্রথমতঃ পরিবারের ব্যক্তিদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে একত্রিত করার চেষ্টা করেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদের অসারতা বুঝিয়ে বলেন, ঝগড়ার মূল কারণ কোথায় কেন্দ্রীভূত, তা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

চিকিৎসকের প্রধান ভূমিকা হ'ল, পিতার ভূমিকা। পারিবারিক পর্যায়ে মনশ্চিকিৎসার চিকিৎসক পিতার ভূমিকা নিয়ে থাকেন। চিকিৎসকের সক্রিয়তা ও প্রাণবন্ত উৎসাহ পরিবারের সকলকে একত্রিত করবে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণটি কোথায় কোন ঘটনায়, বা অবস্থায় নিহিত রয়েছে সেটা চিকিৎসক খুঁজে বের করবেন এবং এ দ্বন্দ্বের সমাধান কি ভাবে করা যায় তার কার্যকরী পথ নির্দেশ করবেন। পরিবারের সকলকে নিয়ে বসে তিনি তাদের চোখের সামনে এমন একটি আদর্শ পারিবারিক সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরবেন,

তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করবেন, কেন তারা সেই সুন্দর সম্পর্কে উত্তীর্ণ হতে পারছে না। চিকিৎসক ঘন ঘন পরিবারের সকলকে নিয়ে বসবেন ও পরিবারকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার অবতারণা করবেন। পরস্পর আলোচনার যে সব আপাত বাধা তা দূর করার দায়িত্ব যৌথ চিকিৎসায় চিকিৎসকের হাতেই প্রধানতঃ ন্যস্ত থাকে। পরিবারে যে অসুস্থ বলে চিহ্নিত, শুধু তাকে নয়, পরিবারের সকলকেই সমান ভাবে যৌথ মনশ্চিকিৎসায় অংশ নিতে হয়। শিশুর সমস্যা-মূলক আচরণের চিকিৎসায়, কেবল শিশুর প্রতি দৃষ্টি দিলেই চলবে না, শিশুর পিতা মাতা ভাই বোন সকলকে নিয়ে যৌথভাবে চিকিৎসার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পিতামাতার দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করতে পারে; কাজেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও তার সমস্যামূলক আচরণ বিদূরণে পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করায় অধিক মনোযোগ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ও দ্বন্দ্ব ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল ও স্থাণু করে ফেলে, এই সম্পর্ক সন্তানের মনের উপরও গভীরভাবে রেখাপাত করে ও তার ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিঘ্নিত করে। কাজেই একের সম্পর্ক অপরকে প্রভাবিত করে। সম্পর্ক একক কিছু নয়। সম্পর্ক বহুজনের আবেগ-সান্নিধ্যজনিত একটি অবিমিশ্র ফলশ্রুতি। এই অবিমিশ্র সম্পর্কটি উন্নত করার জন্য চিকিৎসক পরিবারের সকলকে সমানভাবে উদ্দীপ্ত করতে প্রয়াস চালিয়ে যান।

যৌথ মানসিক চিকিৎসায় পরিবার ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে একটি দলে পাঁচ থেকে দশজনের বেশী চিকিৎসার্থী থাকা সমীচীন নয়। তবে অধিক মদ্যপানের জন্য যে মানসিক অস্বাস্থ্য তার যৌথ চিকিৎসায়, দলে পঁচিশ ত্রিশজন ব্যক্তিও থাকতে পারে।

মানসিক রোগ যত জটিল, ব্যক্তির আচরণ যত বিকৃত, তত সুপরিকল্পিত যৌথ চিকিৎসা প্রয়োজন (Directive group therapy)।

সামান্য মানসিক বৈকল্যে স্থিতিস্থাপক ও কথোপকথন যৌথ চিকিৎসার অবলম্বন করা যেতে পারে (Free Interaction or Interview group therapy)। এক্ষেত্রে চিকিৎসার্থীকে অনেক বেশী সক্রিয় হতে হয়। তার দলভূক্ত অন্যান্যদের সাথে মেলামেশা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা ও পারস্পরিক মানসিক সমস্যা বুঝতে অনেক বেশী তৎপর হতে হয়।

স্থিতিস্থাপক যৌথ মনচিকিৎসা (Free Interaction Method) :

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের ফলশ্রুতি হ'ল এই স্থিতিস্থাপক যৌথ মনচিকিৎসা। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি অনেক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

এই পদ্ধতিতে কয়েকজন চিকিৎসার্থীকে নিয়ে একটি ছোট দল গঠন করা হয়। এরা চিন্তায়, কথাবার্তায়, ভাব প্রকাশে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এরা বাধাবন্ধহীনভাবে একে অপরকে নিজের আশা আকাজ্ক্ষা, ইচ্ছা-অভিরুচি, স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে। এর মধ্য দিয়ে তাদের পুঞ্জীত আবেগ মুক্তি ঘটে, দ্বন্দ্ব-জর্জরতার অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। দ্বন্দ্বের ফলে অহং সত্বার দুর্বলতা দেখা যায়। সে দন্দ্ব-জর্জরতা কমে যাওয়ায় ব্যক্তি তার অহং সত্বার শক্তি অনেক পরিমাণে ফিরে পায়। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে, অবরুদ্ধ আবেগ বাষ্প বিকিরিত (Catharsis) হওয়ায় বাস্তব বোধ ও দৃষ্টি অনেকটা ফিরে আসে।

গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের জন্য যে সভার উদ্যোগ আয়োজন করা হয় তা চিকিৎসার্থীরাই করে থাকে। সভার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও তাদের উপর বর্তিত থাকে। মনশ্চিকিৎসক সে সভায় পরোক্ষভাবে এই ভাব বিনিময়ে সহায়তা করেন।

মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠী (Therapeutic Community) ঃ

মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠী বলতে বুঝায় কোন মানসিক চিকিৎসালয় বা শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র বা কোন মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সংস্থায় মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের ও সংস্থার চিকিৎসক ও কর্মীদের মধ্যে একটি সক্রিয় ও সহৃদয়পূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। সমবায় চিকিৎসায় কেবল রোগীদের পরস্পরের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠভাবে ভাবের আদান প্রদান হলেই চলবে না, একে আরও কার্যকরী করার জন্য রোগী ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথেও যাতে একটা সহৃদয় সংযোগ ঘটে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

এর জন্য রোগীদের ছোট ছোট দলের মধ্যে একদিকে তাদের সমস্যা নিয়ে ভাবের আদান-প্রদান, অন্যদিকে রোগীদের ছোট ছোট দল (পঞ্চাশ ষাটজন নিয়ে) ও হাসপাতাল বা সংস্থার কর্মকর্তাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সভা হতে পারে। এই সকল সভায় রোগীদের দৈনন্দিন সমস্যা ও হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে। এই সভায় রোগীরা কিরূপ ভাবে কথা বলে, কোন সমস্যার অবতারণা করে ও কিরূপ আচার আচরণ করে সে সব লক্ষ্য

করারও চিকিৎসকদের একটি সুযোগ ঘটে। ঐরূপ অবস্থার অবতারণা না করলে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোগীদের বুঝা যায় না—তাদের উন্নতি অবনতি সম্যকভাবে ধরা যায় না। এর মধ্য দিয়ে রোগীদের রোগ নির্ণয়ও যেমন অনেকটা স্পষ্ট হয়, অন্যদিকে নূতন সামাজিক শিক্ষায় রোগীরা পারস্পরিক সহযোগিতায় শিখতে পারে। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে রোগীদের উৎসাহিত করা হয়। বাইরের সাধারণ সমাজ কাঠামোতে রোগীরা যে সব কথা বলতে পারে না, সামাজিক বাধার জন্য তারা যে সব ভাব ব্যক্ত করতে পারে না, মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠিতে তারা সে সব ভাব ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে—সে সব ভাব খোলাখুলিভাবে বলার জন্য তাদের উদ্দীপ্ত করা হয়। এর মধ্য দিয়ে তাদের অবরুদ্ধ প্রক্ষোভের বিরেচন ঘটে। রোগীদের মানসিক যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়—বহুজনের মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ, মানসিক জটিলতা ও সমস্যা প্রায় একই প্রকারের হয়ে থাকে—এটা রোগীরা পরস্পর আলোচনা করে যখন আবিষ্কার করে, তখন তাদের সমস্যা সমাধানে ও নিজের সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টির উন্মোচন হয়—তারা নিজেদের মানসিক বৈকল্যের কারণকে নিজেরাই অনেকটা বাস্তব দৃষ্টি কোণ থেকে দেখার ও বুঝার চেষ্টা করে। তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক ফিরে আসে ও পারস্পরিক সমাজ-আচরণও অনেকটা সিদ্ধ হয়।

রোগীদের নিয়ে হাসপাতাল চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের তত্বাবধানে সভা হয়ে যাওয়ার পরই, এককভাবে হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, মনোবিদ, সমাজকর্মী (Scoial worker) সকলকে নিয়ে, রোগীদের আলাপ আলোচনা ও তাদের আচার আচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, একটি আলোচনা চক্র বসে। এতে চিকিৎসক মনস্তাত্বিক, সমাজ কর্মী প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব বিচারে গোষ্ঠী-সভায় প্রত্যেকটি রোগী যে ভাবে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে তার কথা ব্যক্ত করেন। এর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি রোগীর সমস্যা ও তার প্রতি চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্মীদের আচরণ ধারা কিরূপ হবে এ সম্বন্ধে নীতি নির্ধারিত হয়।

কর্মকেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা (Occupational Therapy) :

মানসিক রোগীর মানসিক পুনর্বাসন প্রথম প্রয়োজন—মানসিক রোগ সংলক্ষণ, যেমন দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব-জর্জরতা প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস। এর জন্য একক এবং যৌথ, একক বা যৌথ মনশ্চিকিৎসা করতে হবে। একজন মনশ্চিকিৎসক সমাজ-কর্মী, মনোবিদ ও অন্যান্য

সহকর্মীদের সহায়তায় রোগীর চিকিৎসার কাজ আরম্ভ করবেন। এতে কোন কোন জটিল রোগীর ক্ষেত্রে অনেক সময় নিতে পারে। এ সব রোগী ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠবে, কিন্তু ভালর দিকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রোগীর যাতে সমাজ-জীবন যাপন সব দিক থেকে উপযুক্ত হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তার কর্মসংস্থানের সকল প্রকার চেষ্টা করতে হয়। এর জন্য তার কোন জীবীকায় অধিক আকর্ষণ ও আগ্রহ, কোন দিকে তার কতটুকু শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তার যাচ্যই করে তাঁকে ধীরে ধীরে কর্ম-সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। এর জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়, যাঁর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে রোগীকে তার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কর্মে নিয়ন্ত্রিত করে। একদিকে তার রোগ নিরাময়ে সাহায্য করা, অপরদিকে সমাজ-জীবনে কর্ম সংস্থানে সহায়তা করা।

তাছাড়া, কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসায় সাময়িকভাবে হলেও রোগীর কতকগুলি উপকার হয়, যেমন রোগীর মধ্যে যে ক্লান্তি বাসা বাঁধে, সৃজনধর্মী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার অনেক উপশম ঘটে, কর্মে অনীহা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়, কর্মে নূতন উৎসাহের সঞ্চার ঘটে, কর্মপ্রয়াস ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে নূতন করে আত্ম-বিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। নূতন নূতন কল্যাণকর পথে কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে রোগীর মধ্যে নব-জীবনের দিগন্ত তুলে ধরা হয়। ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্ ও সিজোফ্রেনিয়াতে কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা কিছুটা সুফল নিয়ে আসতে পারে।

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে যখন রোগ নিরাময় অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে ওঠে, তখন কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা রোগ-যন্ত্রণা ও সংলক্ষণের কিছুটা উপশম ঘটাতে পারে।

কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসায় এমন সব কাজের অবতারণা করা হয় যাতে খুব বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনার অবকাশ থাকে না। অনেকক্ষণ ধরে একটা কাজ করতে হয় না ও গভীর মনোসংযোগেরও প্রয়োজন হয় না, অথচ সে কাজের মধ্যে কিছুটা নূতনত্ব আছে ও সৃজনশীলতার অবকাশ আছে। এর মধ্যে আছে বাঁশের বাক্স তৈয়ারী করা, সূচীকর্ম, তাঁতের কাজ, জাল বোনা, চামড়ার কাজ, ছোট ছোট খেলনা তৈরী, কাঠের কাজ, বই বাঁধানো, বাগান পরিচর্যা করা, চিত্র-কলা ইত্যাদি। রোগীর মানসিকতা বুঝে তার মানসিক রোগের জটিলতা বুঝে কর্ম নির্বাচন করতে হবে।

সাইকোড্রামা (Psychodrama) :

নিয়ন্ত্রিত সমবায় মনশ্চিকিৎসায় বর্তমানে সাইকোড্রামা চিকিৎসা পদ্ধতি একটি নূতন মুল্যবান সংযোজন।

এই পদ্ধতিতে রোগী স্বরচিত নাটকের মধ্য দিয়ে আপন সমস্যাজাল উদ্ঘাটিত করে নায়ক-চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার নিজের সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা, আহত বাসনা ও মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। এতে তার অবরুদ্ধ-আবেগ -মুক্তি ঘটে, অবদমিত বাসনাকে কল্পনায় চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। এমনি নাটকে রোগীদের একাংশ অভিনয় করে। একাংশ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎসক এতে কখনো দর্শক, কখনো অভিনেতা, কখনো পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনশ্চিকিৎসক নাটক পরিচালনার ভার নিয়ে থাকেন।

নাট্যানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মনশ্চিকিৎসক দর্শক ও অভিনেতাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং এতে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সমন্ধে আলোচনা করেন এবং এই সকল চরিত্রের দ্বন্দ্ব, গূঢ়ৈষা কোথায় কি ভাবে কাজ করছে, এবং কি ভাবে এই সকল গূঢ়ৈষা (Complex) নাটক চরিত্রের ব্যক্তির আচার আচরণকে প্রভাবিত করছে, এ সকল বিষয়ে মনশ্চিকিৎসক দর্শক ও অভিনেতাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাইকোড্রামায় দুটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—(১) রোগীর সম্মুখে অপর একজন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—এতে রোগী তার নিজের আচার আচরণ গুলির বিকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে তার চিন্তা ও আচরণ যে কতটা বাস্তব বর্জিত সেটা সে অনেকটা বুঝতে পারে।

(২) কখনও রোগী নিজে তার পরিবারের কারো ভূমিকায় অভিনয় করে এবং অপর কোন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এতে পারিবারিক সম্পর্কের কোথায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই জটিলতা মানসিক বৈকল্য কি ভাবে নিয়ে এসেছে তা প্রতিবিম্বিত করা যেতে পারে। মানসিক বৈকল্যের এই সব কার্য-কারণ সম্বন্ধ রোগী যখন তার চোখের সামনে দেখে ও তাকে যখন মনশ্চিকিৎসক এ সকল বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন রোগী যেন নূতন করে তাকে দেখতে শেখে, তার মধ্যে যেন অন্তর্দৃষ্টির অভ্যুদয় ঘটে।

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি—মানসিক রোগের চিকিৎসায়, বিশেষ করে উদ্বায়ু-

রোগীদের চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি (Psycho-analysis) বিশেষভাবে কার্যকরী বলে প্রতীত হয়েছে।

(এ সম্বন্ধে 'মনঃসমীক্ষণ' অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে)

শক্ থেরাপী (Shock Therapy) ঃ

কতকগুলি মানসিক রোগ আছে যে গুলির মনশ্চিকিৎসায়, (Psycho-therapy) চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে যে ঘনিষ্ট ও সহৃদয় সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার তা কোন ভাবেই স্থাপন করা যায় না, বিশেষ করে যে সব রোগী অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত, দুর্বার ও মারমুখী। উন্মাদ-রোগীদের (Psychosis) প্রায়শঃই মনশ্চিকিৎসার আওতায় আনা যায় না। এ সব ক্ষেত্রে রোগীদের উৎক্ষিপ্ততা ও মারমুখী-ভাব প্রশমিত করে মনশ্চিকিৎসার উপযোগী করে তোলার জন্য কখনও ঔষধ পত্র কখনও বা শক্ (Shock therapy) দেওয়া হয়ে থাকে। শক্ দু প্রকারের হতে পারে—একটি বৈদ্যুতিক (Electric shock), অপরটি ইন্সুলিন (Insulin shock)।

Electric shock দিয়ে মানসিক রোগ চিকিৎসা কিছুদিন হ'ল প্রচলিত হয়েছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম এর প্রচলন হয়। এতে ইলেকট্রোড দুটি রোগীকে শুইয়ে মাথায় লাগিয়ে দেওয়া হয়, এবং মস্তিষ্কের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সন্নিবেশিত করা হয়। রোগীর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁপুনির ভাব দেখা দেয়। ক'বার শক্ দেওয়া হবে সেটা রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে।

Insulin shock সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে বেশী দেওয়া হয়ে থাকে। ইনসুলিন্ শকে ইনসুলিন অন্তঃমাংসপেশীতে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়। এরূপ ইনসুলিন অনুপ্রবেশ প্রায় দু সপ্তাহ চলতে থাকে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দু'তিন মাস পর্যন্তও ইনসুলিন অনুপ্রবেশ এরূপভাবে চলতে পারে। শরীরে ইন্সুলিন প্রবিষ্ট হওয়ার পরই রোগী দুর্বল ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

শক্ থেরাপী ও ইন্সুলিন্ থেরাপী যদিও এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে, তথাপি এর স্থায়ী ফল সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

অনুশীলনী

1. Discuss the method of psycho-analysis as a method of psycho-therapy. How far psycho-analysis is applicable to mal-adjusted children ?

2. What is psycho-therapy ? How does it differ from Medico-therapy ? Discuss the main forms of psycho-therapy.

3. Indicate the nature of play Examine whether play can be utilized as a therapy for releasing the tensions of maladjusted children.

4. What are the chief characteristics of group-therapy ? Where and how can you apply this therapeutic procedure ? How many forms of group therapy are in use ?

5. Write notes on :

(1) Occupational therapy
(2) Psycho-drama
(3) Suggestion
(4) Persuation
(5) Free-Association Method
(6) Dream-analysis
(7) Therapeutic community
(8) Family therapy.

বিংশ অধ্যায়

প্রতিরোধক সংস্থা ও উপায়—গৃহপরিবেশ ও পিতামাতা ঃ বিদ্যালয় পরিবেশ ও শিক্ষক

রোগ হয়ে গেলে তার চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার চেয়ে রোগ যাতে আদৌ না হয় তার সর্ববিধ ব্যবস্থা করাই শ্রেয়ঃ। অপসঙ্গতি শিশুর মধ্যে দেখা দিলে তার চিকিৎসার পদ্ধতির কথা অলোচিত হয়েছে ; কিন্তু এই অপসঙ্গতি যাতে না দেখা দেয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে অক্ষুন্ন ও সুস্থধারায় হয় সে সম্পর্কে সর্ববিধ প্রযত্ন নেওয়া সমাচীন।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে একদিকে বংশগতিতে প্রাপ্ত তার দেহ-মানস বৈশিষ্ট যেমন কাজ করে, অন্যদিকে পারিবেশিক প্রভাব-শক্তিও কাজ করে। দুটি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কতকগুলি মৌলিক পারিবেশিক অবস্থার প্রয়োজন। একটি অঙ্কুরের বিকাশ বৃদ্ধির জন্য যেমন উপযুক্ত জল, বায়ু, আলো প্রয়োজন, বৃক্ষ-বিকাশ-ক্ষয়ী পোকামাকড়ের প্রকোপ অবরোধ প্রয়োজন, ঠিক তেমনি একটি মানব-শিশুর যথাযথ বিকাশ-বৃদ্ধির জন্য তার কতকগুলি মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ প্রয়োজন—প্রয়োজন শিশুর উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আলো হাওয়া যুক্ত প্রশস্ত নিরাপদ আশ্রয়, পিতামাতার স্নেহ প্রযত্ন, উৎসাহ-সহানুভূতি, শিশুর উজ্জল প্রাণ শক্তির নিয়ন্ত্রণক্ষম আনন্দদায়ী খেলাধূলার ব্যবস্থা, গৃহে পিতা-মাতা, ভাই বোন সকলের মধ্যে প্রীতি-পূর্ণ সম্পর্ক, স্বতঃপ্রণোদিত নিয়ম-নিষ্ঠা। এ ছাড়া চাই শিশুর বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী তাকে তার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠ-বিষয় নির্বাচন ও সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন। মোটের উপর প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি গৃহে ও বিদ্যালয়ে সম্যক লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তাও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে রয়েছে। সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করাই অপসঙ্গতি প্রতিরোধের প্রকৃষ্টতম উপায়।

এই পরিবেশ রচনার দায়িত্ব মূলতঃ গৃহে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের। পিতামাতার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন তার গৃহপরিবেশের উপর পড়ে। সুস্থ পিতা-মাতাই, অর্থাৎ যে সকল পিতামাতা দেহে ও মনে সুস্থ, যাঁদের কর্মক্ষমতা

অটুট, যাঁরা সকলের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে সক্ষম, দায়িত্ববান, রুচিসম্পন্ন জীবন ও জগত সম্পর্কে কল্যাণকর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্থ মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং সন্তান প্রতিপালন-শিল্প-নিষ্ঠ, কেবল তাঁরাই যথার্থ সুস্থ গৃহ-পরিবেশ রচনা করতে পারেন। অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতামাতা কোন না কোন ভাবে গৃহ-পরিবেশের সুস্থতাকে বিঘ্নিত করে। এই অসুস্থ পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে অসুস্থ জীবন-বিন্যাসে বিপর্যস্ত হয়ে শিশুরা অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এছাড়া শিশুর শিক্ষারম্ভ ও সমাজীকরণ তার পিতামাতার কাছ থেকেই হয়ে থাকে। পিতামাতা যদি অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয় তাহলে তাঁদের হাতে সন্তান যে শিক্ষা পায় তা কু-শিক্ষারই নামান্তর, সমাজীকরণও (Socialization) ঠিক ভাবে এদের হাতে হতে পারে না। নানা প্রকারের বদভ্যাস, অসুস্থ-চিন্তা, ও মানসিক জট্ এদের মধ্যে দেখা যায়। সুস্থ ব্যক্তির গঠনের জন্য গৃহে সার্বিক ভাবে সুস্থ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। পিতা-মাতার সম্পর্ক, পিতা মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক সব দিক থেকে সুস্থ সম্পর্ক থাকবে—অর্থাৎ সম্পর্কটি পারস্পরিক প্রীতি, বিশ্বাস, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, যথাযথ মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক ভাবে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার। সুস্থ সম্পর্ক সুস্থ ব্যক্তিত্বেরই ফলশ্রুতি।

এই সকল দিক থেকে গৃহ পরিবেশের প্রভাব তথা গৃহ-পরিবেশ নির্মাতা পিতামাতার প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ণ ভাবে কাজ করে। সুস্থ পিতামাতা ও সুস্থ-গৃহ পরিবেশ রচনাই শিশুর অপসঙ্গতি তথা বয়ঃপ্রাপ্তি কালে মানসিক রোগ প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট ও একমাত্র পথ।

এ প্রসঙ্গে বহু মনোবিদও তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রথমতঃ ফ্রয়েড শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। পিতামাতার সাথে শিশুর বক্তিত্ব গঠন যে কী গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট ফ্রয়েড তা ব্যাখ্যা করেন। শিশুর প্রথম সম্পর্ক তার মার সাথে। তার জৈবিক ও মানসিক খাদ্য মা'ই প্রথম যোগায়। মাতৃস্তন্য পানে শিশুর জৈবিক ক্ষুধা যেমন নিবৃত্ত হয়, মা'র স্নেহভরা মুখ, তাঁর আদর, শিশুর মনকে ভরায়, শিশুর মনের ক্ষুধা মেটায়। তার মধ্যে নিরাপত্তা বোধের সঞ্চার হয়। মা'র উদাসীনতা, অবহেলা, সর্বদা ক্রোধ, শিশুকে পীড়িত করে, ক্ষুব্ধ করে, অবসন্ন করে। ফ্রয়েড মা'র শিশু পরিচর্যা পদ্ধতি, মা'র ব্যক্তিত্বের গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লিবিডো বিকাশের সুস্থ ধারা বহুলাংশে নির্ভর করে মা'র ব্যক্তিত্বের

উপর, তাঁর পরিচর্যা পদ্ধতির উপর। তাছাড়া লিবিডো বিকাশের ঈডিপাস স্তরে, ফ্রয়েড দেখিয়েছেন শিশুর মধ্যে কী ভাবে প্রধানতঃ অধিশাস্তা (Super-ego), গড়ে ওঠে। অধিশাস্তা যদিও ঈডিপাস স্তরের পূর্ব অধ্যায় থেকেই গঠিত হতে আরম্ভ করে, তবু ঈডিপাস স্তরে পিতামাতার বক্তিত্বের ছাপ, শিশুর অধিশাস্তা গঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ করে। পিতামাতার নীতিবোধ, তাঁদের ঔচিত্যবোধ, পাপবোধ, নানাবিধ সংস্কার শিশুর ব্যক্তিত্বে গ্রথিত হয়ে যায়। শিশু পিতামাতার সাথে ঈডিপাস স্তরে সবিশেষ একাত্মীকরণ করে থাকে। অধিশাস্তার গড়নের উপর পরবর্তীকালে শিশুর ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে। অতিমাত্রিক অধিশাস্তা (যার মধ্যে প্রকট পাপবোধ কাজ করে), ব্যক্তিকে যেমন অত্যধিক দ্বন্দ্ব জর্জর করে তোলে, উদ্বায়ু গ্রস্ত করে ফেলতে পারে, আবার ক্ষীণ অধিশাস্তা ব্যক্তিকে অদসের আপাত সুখের স্পৃহা চরিতার্থ করায় কোন বাধা দেয় না বলে ব্যক্তির মধ্যে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার দেখা যায়। এদিক থেকেও ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা অসুস্থতায় পিতা মাতার প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না।*

এই কারণে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব সন্তানের সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। মানসিক অসুস্থতার প্রতিরোধ করতে হলে, গোড়া থেকেই পিতামাতার জীবনাচরণকে সুস্থ ও সংযত করে তুলতে হবে, গৃহকে আনন্দ ও সদাদর্শের একটি আকর করে গড়ে তুলতে হবে।

ফ্রয়েড ছাড়া এ্যাড্‌লার (Adler) ও শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা বিশেষ ভাবে বলেছেন। শিশুর মধ্যে অত্যধিক হীনমন্যতা বোধ, যা থেকে শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের উদ্ভব হয়, তার কারণও পিতা-মাতার ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী। পিতামাতার অবহেলা, নিয়ত আক্রমণ ও সমালোচনা পদে পদে উপহাস, নিজের সঙ্গে তুলনা করে শিশুদের ছোট করা, উৎসাহের পরিবর্তে সদা ভয় দেখানো, ভাই বোনদের মধ্যে একের সাথে অপরের তুলনা করে একজনকে ছোট করা, অতি আদর দেওয়া বা প্রত্যাখ্যানের ভাব প্রভৃতি অবস্থা শিশুর মধ্যে অতিমাত্রিক হীনমন্যতার উদ্রেক ঘটায়।

*In the parent-child interaction, the child takes over the features of the parents by identification and makes them a part of his own self. Although the child's adult behaviour may be determined, to some extent, by the socio-economic factors yet, the first few years of parent-dependent life is certainly decisive in the formation of personality"—Freud, S. : Introductory Lectures on Psychoanalysis, 1911.

এই অতিমাত্রিক হীনমন্যতাই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে ও নানা প্রকারের অপসঙ্গতি মুলক আচরণের সৃষ্টি করে। কাজেই এ্যাড্‌লারও দেখিয়েছেন যে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী, সন্তান সম্পর্কে আচরণ-রীতি, সন্তানের ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ণয়ে কতটা কাজ করে। শিশুর মানসিক অস্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি রোধে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব প্রথম ও প্রধান সোপান।

ফ্লুগেল (Flugel) বলেছেন শিশুর প্রতি পিতামাতার ভালবাসা শিশুর পরিবেশের একটি নিশ্চিততম নিয়ামক ; শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একটি অপরিহার্য অভিপ্রেত অঙ্গ। জেরার্ডের (Gerard) মতে সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে সব প্রতিন্যাস (attitudes) তার মধ্যে শৈশবকালে সমস্যার উদ্ভব করে, যদি পিতামাতা যে কোন ভাবে তার পরিবর্তন না করে তা হলে তা শিশুর স্বাভাবিক ও যথাযথ বিকাশে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে। হর্নের (Horney) মতে পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-জর্জর অবস্থার উদ্ভব হয়, তার কারণ কেবল যৌনেচ্ছা সংক্রান্ত আক্রমণতা নয়, (ফ্রয়েডের ঈডিপাস স্তরে যার কথা বলছেন), এর কারণ হ'ল সন্তানের মধ্যে দুশ্চিন্তার উদ্রেক। এই দুশ্চিন্তা আসে পিতামাতার নির্মম আচরণ থেকে, প্রত্যাখ্যান বা উদাসীনতা থেকে। শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার ভাব দেখা দেয়—শিশু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়। ছিন্ন গৃহকোণ (Broken Homes) অর্থাৎ যে গৃহে পিতামাতার মধ্যে নিত্য ধূমায়িত কলহ, দ্বন্দ্ব, এমন কি বিচ্ছেদ, যে গৃহ-কোণে শান্তির পরিবর্তে সর্বদা অস্থিরতা, অশান্তি বা যে গৃহ পরিবেশে শিশু লালিত পালিত হয়েছে, হঠাৎ সে গৃহ থেকে উৎপাটিত বৃক্ষের মত ছিন্ন হয়ে ভেসে বেড়ানো—এরকমের অবস্থা শিশুর মধ্যে নিয়ে আসে গভীর নিরাপত্তাহীনতা আর দুশ্চিন্তা। শিশু-মন সজীবতা হারিয়ে ফেলে, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিত্ব জীর্ণদীণ হয়ে যায়।

এ সকল আলোচনা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন তথা অপসঙ্গতি ও মানসিক রোগ প্রতিরোধে গৃহ পরিবেশের সুস্থতা কত গভীর ভাবে প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া পিতামাতার মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মূল সূত্র গুলির সাথেও পরিচিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কি কি অবস্থা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করে, কি কি অবস্থা বা সংলক্ষণের প্রথম প্রকাশেই শিশুর অপসঙ্গতি ও মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার সূচক এ সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে পরিচিত

থাকা সমীচীন। সামান্যতম মানসিক অসুস্থতার আভাসেই যেন পিতামাতা তার প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে, শিশু-চিকিৎসা কেন্দ্রের সাহায্য বা মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে পিতামাতা গোড়া থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে পারেন—

গৃহ পরিবেশে যাতে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃপ্রনোদিত নিয়ম-নিষ্ঠা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা অপসঙ্গতি ও মানসিক বৈকল্য প্রতিরোধে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে নিম্নরূপে উল্লেখ করতে পারি—

(ক) শিশুর মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের জন্য পিতামাতার যথাযথ আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা করা।

(খ) শিশুর প্রতি স্নেহ মমতা, যথাযথ মনোযোগ, শিশুর অস্তিত্বের পরিবারে যথাযধ মূল্য ও গুরুত্ব দান।

(গ) অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত আদর না করা।

(ঘ) পদে পদে শিশুকে উপহাস না করা, অথবা সমালোচনা না করা; তার স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্ঠ অনিষ্ঠ নিরপেক্ষ কর্ম প্রয়াসে বাধা না দেওয়া,

(ঙ) পিতামাতার সুস্থ মূল্যবোধ থাকা।

(চ) অহেতুক শিশুকে শাস্তি না দেওয়া বা ভয় না দেখানো; শিশু যেন কখনও পিতামাতার আচরণ থেকে অনুভব না করে যে তাকে প্রত্যাখ্যান বা অবহেলা করা হয়।

(ছ) খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখা।

(জ) গৃহে স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম-নিষ্ঠা।

(ঝ) সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার মধ্যে মতৈক্য।

(ঞ) পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যেন প্রীতি, সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থপরতার ভাব থাকে।

(ট) সকল সন্তান সম্পর্কে পিতামাতার সমান মনোযোগ ও পক্ষপাত শূন্য মনোভাব।

(ঠ) শিশুকে পঠন পাঠনে, শিশুর বয়স, শক্তি সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা।

(ড) পিতামাতার পূত চরিত্র, কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকা।

বিদ্যালয় পরিবেশ : শিক্ষক :

গৃহের প্রভাবের পরই বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ করে। শৈশবকালের নমণীয় দৈহিক ও মানসিক পটভূমিতে পরিবেশ প্রভাব শক্তি অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে ও গভীরভাবে শিশুর জীবনে কাজ করে। শিশুর ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তিভূমি এমন সময়েই স্থাপিত হয়ে যায়। গৃহের পরিবেশ থেকে প্রথমেই স্বাভাবিকভাবে শিশু বিদ্যালয়ের পরিবেশের মুখোমুখী হয়। গৃহ ও বিদ্যালয়, বৃহত্তর ভাবে সমাজ, শিশুকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে পরিবার ও পরিবারস্থিত পিতামাতা শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চার পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যা কিছু শেখে তার সবটাই পরিবার-পরিসর থেকে। কিন্তু তার পর থেকে গৃহপরিবেশের সাথে সাথে বিদ্যালয় বেশ কিছু দিন ধরে, অর্থাৎ প্রায় দশ এগারো বৎসর পর্যন্ত জীবনকে নানাভাবে গড়ে তোলার কাজে প্রয়াসী হয়। এই সময়টাও দেহের ও মনের দিক থেকে শিশুর অত্যন্ত নমনীয় ও প্রভাবিত হওয়ার কাল।

বিদ্যালয়ের কাজ এখন আর পুঁথিগত বিদ্যাদান নয়। শিশুর সার্বিক বিকাশই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। সম্পূর্ণ ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজেই বিদ্যালয়ের এখন নিযুক্ত থাকার কথা। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ের যুগপৎ পরিচর্যা বিদ্যালয়ের কাজ। আর সেইজন্য বিদ্যালয়ে পাঠদানের সাথে সাথে খেলাধূলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অবতারণা অধুনা বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে।

শিশুর অনেকগুলি মৌলিক মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি বিদ্যালয় পরিবেশে ঘটানো সম্ভব এবং সেটা বিদ্যালয়েই একমাত্র সম্ভব, গৃহে নয়। সমবয়সীদের সাথে এক সাথে চলা, তাদের সাথে কখনো প্রতিযোগিতা, কখনো সহযোগিতা বা সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে চলার যে সুস্থ তাড়না প্রত্যেক শিশুর মধ্যে আছে তার সুস্থ ও নিয়ন্ত্রিত পরিতৃপ্তি বিদ্যালয়েই ঘটানো সম্ভব। এদিক থেকে বিদ্যালয়ের

ভূমিকা বড় একটা কম নয়। বৃহত্তর ভাবে সমাজ-জীবন যাপনের শিক্ষা, অর্থাৎ সমাজীকরণের (Socialization) মূল সূত্রগুলির সাথে শিশুর বিদ্যালয়েই প্রধানতঃ পরিচিতি ঘটে। গৃহ পরিবেশের অসুস্থ আবহাওয়া থেকে যদি শিশু বিদ্যালয়ে আসে তাহলে সে বিদ্যালয়কে যে ভাবে গ্রহণ করে আর যে শিশু সুস্থ-গৃহ পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে, সে বিদ্যালয়কে ভিন্নতর ভাবে গ্রহণ করে। এ সব শিশুর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব আরও গভীর কেন না এ সকল শিশু যদি বিদ্যালয়েও নিবিড় ও ঘনিষ্ট মনোযোগ ও প্রযত্ন না পায় তা হলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

সাধারণভাবে এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পিতামাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়—প্রত্যেকটি শিশুর প্রতি এককভাবে মনোযোগ দিতে হয়—শিশুর গৃহ-পরিবেশের ও শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতি যত্ন নিতে হয়। শিক্ষক-মনোবিদ-পিতামাতার মধ্যে একটি সক্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন করে, বিদ্যালয় প্রত্যেকটি শিশুর সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করবে। গৃহ-পরিবেশে যদি কোন স্বাস্থ্য-হানিকর অবস্থা থাকে, তা হলে তা দূর করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। বিদ্যালয়েও অসুস্থ-গৃহ পরিবেশগত শিশুর প্রতি অত্যন্ত সহৃদয় দৃষ্টি দেওয়া হবে। তার মধ্যে অপসঙ্গতির সামান্ত লক্ষণ দেখা দিলে পৃথকভাবে বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের (Child Guidance Clinic) সহায়তায় তার জন্য সর্ব প্রকার প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের এরূপ-ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়াও সাধারণভাবে কতকগুলি মানসিকস্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়, যে বিদ্যালয় পরিবেশে শিশু তার মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির স্বাস্থ্যকর সকল সম্ভাবনা খুঁজে পাবে। সুস্থ বিদ্যালয় পরিবেশে লালিত ও শিক্ষিত হলে শিশু সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠবে। মানসিক অসুস্থতা ও অপসঙ্গতি প্রতিরোধের এটাই সার্থক ভিত্তি।

বিদ্যালয়ের পরিবেশের দুটি দিক আছে—একটি তার ভৌতিক দিক (Physical environment) অপরটি মনস্তাত্ত্বিক দিক (Psychological)। ভৌতিক পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে রচনা করা প্রয়োজন। প্রশস্ত পরিসর, বিদ্যালয়ের চারদিকে পরিচ্ছন্নতা, ছাত্রদের বসা, শিক্ষকের পাঠদান স্থান সব কিছুই সুপরিকল্পিত ও সুরুচিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত আলো হাওয়ার তে কোন প্রকার অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন।

মনস্তাত্বিক পরিবেশের মৌল উপাদান বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক। বিদ্যালয়ে প্রধাণতঃ তিন প্রকারের সম্পর্ক বিদ্যমান. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক সম্পর্ক। এ সকল সম্পর্ক যদি সহৃদয়তা, ও পারস্পরিক মর্যাদা ও বোঝাপড়ার (mutual understanding) উপর স্থাপিত না হয় তা হলে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশটি নষ্ট হয়ে যায়। এই পরিবেশে শিশুর যথার্থ শিক্ষাও হয় না, ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশও বিঘ্নিত হয়। কাজেই বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে বিপর্যস্ত না হয় সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টিদান প্রয়োজন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের যে প্রভাব ও শক্তি শিশুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করে, তা হ'ল শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র। গৃহে পিতামাতার ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জীবনভঙ্গী যে ভাবে গঠিত হয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জীবন-ভঙ্গী সেই ভাবে গঠিত হয়ে থাকে। শিক্ষকের ভালবাসা, সহানুভূতি, ছাত্রের সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি, শিক্ষকের উৎসাহ উদ্দীপনা, শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, আন্তরিকতা, সততাই, ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষক সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ করে তোলে এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও অনুভূতিই ছাত্র ছাত্রীকে সামগ্রিক ভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎসাহিত করে তোলে—বিদ্যালয় সম্পর্কে সার্থক (Positive) প্রতিন্যাসের (Attitude) সৃষ্টি করে। ছাত্রছাত্রীর নৈতিক চেতনা, সমাজ-চেতনা মূল্যবোধ, শিক্ষকের ব্যক্তিত্বেরই বহুলাংশ প্রতিফলন। অধি-শাস্তা (Super-ego) গঠনে পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যেমন বহুল পরিমানে প্রভাব বিস্তার করে, শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিত্বেও প্রায় ততটাই কাজ করে। তা ছাড়া শিক্ষক শিক্ষিকারাই বিদ্যালয় পরিবেশটি রচনা করে থাকেন। তাদের ধ্যান ধারণা ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের পরিবেশটি কী ভাবে পরি-কল্পিত হবে। অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে বিষিয়ে ফেলে। সুপরিকল্পনার অভাবে বিদ্যালয়ের কাজ কর্মের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অসুস্থ বিদ্যালয় পরিবেশ স্বভাবতঃই ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিঘ্নিত করে। সুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-গঠনের প্রধান নিয়ন্তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের দায় দায়িত্ব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সুস্থ ব্যক্তি গঠনে তথা অপসঙ্গতি প্রতিরোধে সমধিক ও প্রায় একক।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রধান কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে নীচে বলা হ'ল :—

(১) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে মনোযোগ—

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ-দান পদ্ধতি নির্ণয়—পাঠক্রম নির্ধারণ—বিশেষ বিষয়ে যেমন বিজ্ঞান, মানবিক শাখা, শিল্প, কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে নিয়ন্ত্রণ।

(২) খেলাধূলা, ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমের প্রবর্তন—প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যাতে এতে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে যোগ দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(৩) মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস অর্থাৎ বুদ্ধির মাপ অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করা।

(৪) মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে পাঠদান—পাঠদানের সময় প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে শিক্ষকের সমান মনোযোগ দান।

(৫) বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দান, প্রবৃত্তি উদ্গমনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা। যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন।

(৬) শিক্ষা-নির্দেশনা (Educational Guidance) ও বৃত্তি নির্দেশনার (Vocational Guidance) সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা।

(৭) স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম-নিষ্ঠায় ছাত্র ছাত্রীদের অভ্যস্ত করে তোলা।

(৮) শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত যেন এমন হয় যাতে শিক্ষক সকল ছাত্রের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন।

(৯) অপসঙ্গতির সামান্য আভাষ পেলে শিশুকে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে তার অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করে তা দূর করার শিক্ষক-অভিভাবকের যৌথ প্রয়াস করা।

অনুশীলনী

1. What are the preventive agencies and measures against problem behaviour and delinquency of the children ?

2. Explain the importance of emotional adjustment in the life of the child.

3. Discuss how the teacher-pupil relation contribute to the mental health of both the teacher and the pupil.

4. Discuss the responsibilities of parents and guardians in respect of healthy mental development of the child.

5. Briefly discuss the methods by which the teacher can help the development of whole some personality of the child.

6. Discuss the role of the family on the menetal health of the child.

7. What measures should the parents and teachers adopt to prevent maladjustment in the children ?